মরশুমের একদিন

সমরেশ বসু

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম সংস্করণ ঃ
ডিসেম্বর, ১৯৫২

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

ব্লক নির্মাতা ঃ
শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুখলাল চট্টোপাধ্যায়
'লোক-সেবক প্রেস'
৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা—১৪

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দাম ঃ আড়াই টাকা

ননী ভৌমিক

বন্ধুবরেষু—

পকেটমার

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

আহ্নিক শেষ করিয়া গৌরমোহন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। রহিলেন সে অবস্থায় বেশ খানিকক্ষণ। তখনও তাঁহার কম্পিত ঠোঁটে ও অস্ফুট গলায় কোন প্রার্থনার ধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। প্রণাম সারিয়া যত্নপূর্বক দৈনন্দিন চন্দন-চর্চিত গীতা এবং চণ্ডী সালুর কাপড়ে জড়াইয়া তুলিয়া রাখিলেন ঠাকুরের আসনের এক প্রান্তে।

বসিয়াছিলেন সেই কোন্ ভোরে। অন্ধকার থাকিতে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিবার পথে পাঁচমন্দিরের শিব প্রণাম করিয়া আসিয়াছেন। তার পর আহ্নিক। এখন বেলা প্রায় ন'টা।

ইতিমধ্যে মেজবউ বারকয়েক উঁকি দিয়া গিয়াছে এবং প্রতিবারেই ফিরিয়া গিয়াছে কিঞ্চিৎ ঠোঁট ফুলাইয়া মৃদুশব্দে আঁচলের ঝাপটা দিয়া। কিংবা অকারণে ঘরে ঢুকিয়া এটা-সেটা নাড়িয়া আড়চোখে দেখিয়া গিয়াছে শ্বশুরমশায়ের কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় কি না। কেন না, বিশেষ কার্যোপলক্ষে তাড়াতাড়ির জন্য তাঁহাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেও দেখা গিয়াছে। কিন্তু আজ বৃথা।

গৌরমোহনের চোখ তখনও অর্ধনিমীলিত, ভাবে এবং ভক্তিতে শান্ত ও গম্ভীর সে চোখের দৃষ্টি। কপাল চন্দনচর্চিত। পরণে একখানি বহু রিপু-করা পাতলা গরদ। ধোয়া হইলেও পুরানো গরদের রং দেখিয়া মনে হয় যেন কত ময়লা। মাথার কাঁচা-পাকা চুল ছোট করিয়া কাটা, শিখাটি বেশ লম্বা এবং তাহাতে একখানি পুরো গোলঞ্চ ফুল বাঁধা রহিয়াছে।...তাঁহার দেবভক্তির তুলনা নাই। সারা ভাটপাড়ায় তাঁহার ভক্তিমান ও সৎ বলিয়া খুবই সুনাম। তিনিও বলেন, 'এ নিয়েই তো বেঁচে আছি, আর কেই বা আছে, কেই বা আছেন বল?'

সত্য, তাঁহার আর কি আছে! একসময়ে চটকলে কেরাণীর কাজ করিয়াছেন, দুই ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছেন। কিন্তু ভাগ্য কিছুটা অপ্রসন্ন ছিল। বড় ছেলেটি বিধবা বউ এবং একটি ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছে। মেজটি

বছরখানেক পূর্বে বিবাহ করিয়া চাকরি উপলক্ষে বিদেশবাসী হইয়াছে বর্তমানে। বলিতে গেলে তাহার আয়েই এ সংসারের ভরণপোষণ চলিতেছে। ছোট ছেলেটি এখনো ছোটই। এবছরে স্কুলপাঠ শেষ করিয়া সে কলেজে ঢুকিবে। আর তাঁহার স্ত্রী আছেন সুনয়নী। ওই যে ঘরের একপাশে তক্তপোষে শুইয়া রহিয়াছেন, বাত-পঙ্গু, অনড় এবং বাক্‌শক্তিহীনা। কয়েক বছর ধরিয়া বোধ করি দিনেকের জন্যও শয্যা ত্যাগ করা তাঁহার সম্ভব নয় নাই। শুধু তাঁহার বড় বড় চোখ দুটিতে এখনও প্রাণ আছে, মনটাও আসিয়া ঠেকিয়াছে সেখানেই। চোখের ইসারাতেই তিনি ডাকেন, কথা বলেন। হাত দুটি নাড়িতে পারেন খুব আস্তে আস্তে।

এ বাড়ী এবং মানুষগুলির দিকে চাহিলেই বোঝা যায়, সুনয়নীর মৃত্যুর জন্য সবাই প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু তিনি সবাইকে নিরাশ করিতেছেন দিনের পর দিন। সারাদিনের মধ্যে তাঁহার প্রতি নজর কারুর বড় একটা পড়ে না, খাওয়াইবার সময়টুকু ছাড়া। বলিতে গেলে, এখন তিনি না মরিয়াও মরিয়া রহিয়াছেন।

আহ্নিকের শেষ ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াই মেজবউ মালতী ছুটিয়া আসিল। বালিকামাত্র। বয়স বছর ষোল সতর হইবে বা। চেহারার বিশেষত্ব কিছু না থাকিলেও সব মিলিয়া প্রায় সুন্দরী হইয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছে। আব্‌দারে এবং কর্তৃত্বের ভারসাম্যে বয়সানুযায়ী তার চরিত্রটি বড় মিষ্টি। আদুরী বউ ও কর্মঠ গিন্নি, এ উভয়ধারার সংমিশ্রণে সে মানানসই।

সে আসিয়াই ভ্রূ তুলিয়া অভিমানের সুরে বলিল, 'আপনার কিন্তু, বাবা, আহ্নিক বেড়ে গেছে!'

গৌরমোহন একটি নিশ্বাস ফেলিয়া নীরবে সস্নেহে হাসিলেন। এত বড় কথা একমাত্র মালতীই বলিতে পারে। আর কেহ বলিতে পারে নাই বা পারিবেও না। বিশেষ তাঁহার পূজা-আহ্নিক সম্পর্কে সকলেরই একটা শ্রদ্ধা রহিয়াছে।

আসন ছাড়িয়া উঠিবার মুহূর্তে রেকাবির চিনি প্রসাদের এক চিমটি লইয়া জিভে ও মাথায় ঠেকাইলেন গৌরমোহন। তার পর ছোট জলচৌকিখানিতে আসিয়া বসিলেন।

মালতী তখনও দাঁড়াইয়া আঁচল পাকাইতেছিল। খসা ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে আবার বলিল, 'আজকে কিন্তু বাবা আর না বলতে পারবেন না, আগেই বলে রাখছি।'

গৌরমোহনের মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হইলেও তিনি তা চকিতে গোপন করেন। বলেন, 'হাঁ গো বেটি, তাই হবে। এখন তুমি—'

আর বলিতে হয় না। খুসী চড়াই পাখীর মত ফুৎকারে উড়িয়া গেল মালতী রান্নাঘরের দিকে। আবার তেমনই চকিতে ফিরিয়া আসিল একটি ছোট বাটি ও চামচ লইয়া।

গৌরমোহনের স্নেহহাসি মুগ্ধ হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'এ আবার কি?'

মালতী লজ্জায় আনন্দে বাটির দিকে চাহিয়া বলিল, 'ছোলা আর লংকা ভাজা নুন দিয়ে বেটে দিয়েছি। চায়ের সংগে খুব ভাল লাগবে, খেয়ে দেখুন।'

'পাগলী কোথাকার!' খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল গৌরমোহনের মুখ। আজকাল এক কাপ চা ছাড়া সকালে আর কিছু পাওয়া যায় না। এটা মালতীর বিশেষ আয়োজন।

ফিরিবার পথে মালতী আপন মনে হাসিয়া আবার দাঁড়াইল। চোখ বড় করিয়া বলিল, 'জানেন বাবা, অনুদের বাড়ীর বউয়ের চুড়িগুলো আমি আজ দেখে এসেছি, কি সুন্দর ফ্যাসানের চুড়ি! আজকাল ওই ফ্যাসানটাই সকলে ভালবাসে।'

বলিয়া রুষ্ট মুখে নিজের হাত দুখানি সামনে বাড়াইয়া বলিল, 'আর এ বি বিচ্ছিরি প্যাটার্ণ, একেবারে সেকেলে। আমার বাবার যেমন বুদ্ধি, সোনা একটু দিল তো তার কোন ছিরিছাঁদ নেই। আপনি আজই এগুলো আকুল স্যাকরার কাছে নিয়ে যান।'

ছোলার মশলার ছাতু আটকায় গৌরমোহনের গলায়। হাসির একটু হুঃ হু শব্দ করিতে গিয়া শুকনো ছাতু গলা দিয়া নাসারন্ধ্রে পৌঁছয় প্রায়। না, তাঁহার মন বুঝিয়া এমন অবারিতভাবে আর কেহ এবাড়ীতে আজও কথা বলিতে পারে না, পারে কেবল মেজবউ মালতী।

কিন্তু মালতী গেল না। ফিরিয়া একেবারে শ্বশুরের পায়ের সামনে বসিয়া বড় বড় চোখে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল, 'আমার বাবা তো এই দু আড়াই ভরি সোনা-ও দিতে চায়নি, জানেন বাবা? বলেছিল, আমার ধর্মিষ্টি বেয়াই, হাতে পায়ে ধরে আমি এমনিই মেয়ে দিয়ে আসব।'

বলিয়া এক মহাগিন্নির মত ঘোমটা টানিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, 'আমি বেঁকে বসলুম। বললুম, পাঠাচ্ছ তো এক গরীবের ঘরে, তবুও খালি হাতে

ড়দিকে পাঁচ ভরি দিতে পারলে, আর আমার বেলাতেই যত অভাব। শেষটায়
চা—'

শুনিতে শুনিতে এবার বিরক্ত হইয়া ওঠেন গৌরমোহন। কিন্তু হাসিটি
একেবারে দূর হয় না। বলেন, 'হাঁ গো পাগলী, খুব বুঝেছি, এবার একটু চা
ও।'

'ওমা, ভুলেই গেছি।' বলিয়াই পাঁড় মার করিয়া ছুটিল মালতী।

আশ্চর্য! আপন বাপও এমন পর হইয়া যায় মেয়েদের কাছে। আর সে
পও কি না একেবারে শ্বশুরের কাছে। গৌরমোহনের ক্ষুব্ধ মুখ হইতে হাসিটুকু
পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মালতী আসিয়া চায়ের কাপটা রাখিতেই বাড়ীর বাহির হইতে মোটা গলার
ক ভাসিয়া আসিল, 'ঠাকুরমশাই, বাড়ী আছেন নাকি?'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়া চুম্বনোন্মুখ ঠোঁট গৌরমোহনের আড়ষ্ট হইয়া গেল।
অসহায় ও করুণ দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন মালতীর দিকে।—'বউ মা!'

মাত্র এক বছর বিবাহ এবং বালিকা হইলেও মালতী এ চাহনির অর্থ বিলক্ষণ
ন। সে একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া উঠানে আসিয়া জোর গলায় বলিল, 'দ্যাখ
ঠাকুরপো, বাবাকে কে ডাকে। বলে দাও, বাড়ী নেই।'

কল্পিত ঠাকুরপোকে কথাটি বলিয়াই সে সদর-দরজার কাছে ছুটিয়া গিয়া
টা দিয়া দেখে লোকটা কি বলে। দেখিল, লোকটা সংশয়ান্বিতভাবে দরজার দিকে
হয়া কি যেন বিড়বিড় করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছে। সে হাসিতে হাসিতে
সয়া সে কথা শ্বশুরকে বলিল।

সে হাসিতে যোগ দেওয়া বা হাসিটুকু চাহিয়া দেখাও যে গৌরমোহনের পক্ষে
কঠিন, মালতী তাহা জানে না। তাই সে পাওনাদার বলরামের প্রবঞ্চিত মুখ
ণ করিয়া হাসিয়া আকুল হইল।

গৌরমোহনের কপালে রেখাগুলি জংসনস্টেশনের লাইনের মত বাঁকিয়া-চুরিয়া
ল। ক্ষোভে, বেদনায় আফশোসে ও অপমানে কাল হইয়া উঠিল গৌরবর্ণ
।...অথচ, একদিন তাঁর সততার ঢাক বাজাইয়াছে লোকে। তাঁর চটকলের সহ-
রা শুধুমাত্র ঘুষের পয়সায় অর্থ সঞ্চয় করিয়া সকলেই অল্পবিস্তর ঐশ্বর্য
য়াছে। কিন্তু তিনি পারেন নাই। সে সততার ঢাক আজ শুধু ঢস্‌কাইয়া যায়

নাই, যেন উপন্যাসের খেউড় গানের তাল হইয়া উঠিয়াছে। কি লাভ হইয়াছে সেদিনের সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া? আজও তাঁহাকে কয়েকটি দোকানের হিসাব লিখিয়া এ ঝুঁকির মড়া সংসারে ঠেকো জোড়া দিতে হয়। সুদূরে কানপুরে মেজ ছেলেটি প্রকৃতপক্ষে নির্বাসিত থাকিয়া মাসিক কিছু টাকা পাঠায়। অথচ এত বড় সংসার ফলে দেনার শেষ নাই এবং দেনা করিয়া তার শোধ দিতে পারেন না। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া লুকাইয়া বেড়াইতে হয়।...ছোট ছেলেটি লেখাপড়া শিখিতেছে বটে, কিন্তু পাঠ্যের চেয়ে অপাঠ্য পুস্তক বেশী পাঠ করিয়া বিগড়াইয়া যাইতেছে। অবশ্য ধর্মবিরুদ্ধ কথা আজকাল সব ছেলেপুলেরাই বলিয়া থাকে, কিন্তু ছেলেটি তার রাষ্ট্রবিরুদ্ধ সর্বনাশের পথ ধরিয়াছে। সর্বনাশ বৈ কি। এ হতভাগ্য দেশের দরিদ্র সন্তানেরা রাষ্ট্রবিরোধী হইলে তাহার জন্য লাঞ্ছনা ও মৃত্যু প্রতিমুহূর্তে ওৎ পাতিয়া থাকে। কিন্তু এত মেধা লইয়া ছেলের মরা চলিতে পারে না। তাহা হইলে এ সংসারের ভার কে লইবে? তাহাকে সব সহিয়া শুধুমাত্র উপার্জনক্ষম হইতে হইবে।

জীবনের এ নানান দুর্যোগে বিচলিত হইয়া গৌরমোহন অভিমানক্ষুব্ধ মনে তাকান ঘরের ইষ্টদেবতার দিকে, ঠাকুর! অনেকদূর তো এনে ফেলেছ, আর কতদূর?

তার পর এক নিশ্বাসের শব্দে চমকাইয়া তিনি সুনয়নীর দিকে তাকান। হ্যাঁ মনে থাকে না যে, এ ঘরে আর একটি মানুষ আছে, সে সবই শুনিতেছে। এবং বিচিত্র অপলক একজোড়া চোখ লইয়া সবই দেখিতেছে। দেখিলেন, স্ত্রীর চোখজোড়া তাঁর দিকেই নিবদ্ধ। তাড়াতাড়ি একবার ভাবিয়া লইলেন, আজ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা কি না। কারণ, ওইসব দিনগুলিতে সুনয়নীর এ ভোগান্তের উপরেও যন্ত্রণা বাড়ে। বলিলেন, 'কিছু বলছ?'

সুনয়নীর মাথা একটু নড়িল বা। চোখের তারা দুইটি একবার ঘুরিয়া গেল এপাশে ওপাশে। অর্থাৎ কিছু বলিবেন না।

কিন্তু সুনয়নীর মনের এবং হৃদয়ের সমস্ত ভাব ও কথা তাঁহার স্থির চোখে জমা হইয়া এমন বিচিত্র দৃষ্টি হইয়াছে যে, সে চোখের দিকে একটু বেশী সময় তাকাইয়া থাকা এক দুরূহ ব্যাপার। চোখের উপর সমস্ত চেতনা আসিয়া পড়ায় তাহা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এবং সাপের মত অপলক বলিয়া সবাক না হইয়াও সে অবাক চোখে কত না ভাব। বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে মনটার মধ্যে কেমন করে, ভয়ও হয়।

মালতী ছিল না, কোথায় গিয়াছিল। আবার ঢুকিল ঝড়ের মত শাড়ীর আঁচল উড়াইয়া। আসিয়াও থমকিয়া দাঁড়াইল দরজার কাছে। ছুটিয়া আসিতে হাঁপাইয়া পড়িয়াছে সে। তার নাকের পাটা কাঁপিতেছে, দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে ষোড়শী বুক এবং কিসের গোপন লজ্জায় যেন আড়চোখে শ্বশুরের দিকে তাকাইতেছে। টেপা ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসি চমকাইতেছে। হাতে একখানি কিসের বই উঁকি মারিতেছে তার আঁচল ঢাকা হইতে।

নতুন কোন আব্দারের আশঙ্কায় গৌরমোহন হাসিলেন। বলিলেন, 'হাতে আবার ওটা কি বউ মা।'

এ কথার জন্যই বোধ হয় মালতী অপেক্ষা করিতেছিল। তাড়াতাড়ি বইটার একটা পাতা খুলিয়া সে গৌরমোহনের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। অলঙ্কারের নমুনা চিত্রের একটি বই। তাহার ভিতর হইতে তাহার পছন্দসই নমুনাটি বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, 'এই যে বাবা, এই নমুনাটা, এরকম তৈরী করতে হবে। অনুদের বই এটা, চেয়ে নিয়ে এলাম। আপনি এ বইটাও নিয়ে যান, নইলে স্যাকরা কি করতে কি করে বসবে।'

গৌরমোহনের হাসিমুখ বিরক্তি ও কারুণ্যে বিচিত্র হইয়া উঠিল। একটা অদ্ভুত শব্দ বাহির হইল তাঁর নাকের ভিতর দিয়া। তিনি বারকয়েক হুঁ হুঁ করিয়া সব বুঝিয়া মানিয়া লইলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা মালতীর মনঃপূত হইল না। সে এক মুহূর্ত আঙুল কামড়াইয়া কি ভাবিল, পরমুহূর্তেই উজ্জ্বল চোখে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল একটি পেন্সিল লইয়া এবং তাহার নমুনার পাশে একটি ঢ্যারা কাটিয়া বলিল, 'দেখুন বাবা, এই দাগ রইল, আবার ভুল করে বসবেন না যেন। দেখেছেন দাগটা?'

যেন যুদ্ধের পূর্বে সেনাপতিকে রাজা রাজ্যের ম্যাপ দেখাইতেছেন। বিরক্ত হইলেও গৌরমোহন যেন বিরক্ত হন নাই বরং আর বুঝাইতে হইবে না গোছের করিয়া বলিলেন, 'দেখেছি গো দেখেছি। তুমি আমাকে এবার একটু তামাক খাওয়াও তো।'

'ওমা, ভুলেই গেছি।' বলিয়া সে তাড়াতাড়ি তার প্রাত্যাহিক কলকে সজ্জা করিয়া আগুনের জন্য রান্নাঘরে গেল।

সেখানে বিধবা বড় বৌ তার দামাল ছেলেটিকে লইয়া রান্নার কাজে বড় ঝামেলার মধ্যে পড়িয়াছিল। সে অনেকক্ষণ হইতেই মালতীর ব্যাপারটা লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু বলিতেছিল না কিছুই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া বিদ্রূপের হাসিতে তাহার ঠোঁটের কোণ বাঁকিয়া উঠিতেছিল।

মালতীকে দেখিয়া ছেলেটি আসিয়া তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল এবং তাহার মায়ের ডাকের অনুসরণ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'মাল্‌তি, অই মাল্‌তি, আমাল্‌ খিদে পেছে। মা দেয় না।'

মালতী ব্যস্ত গিন্নির মত শিশুকে তাড়াতাড়ি আল্‌তো চুম্বনে ভুলাইয়া বলিল, 'লক্ষ্মী বাবা, আমি কাজটা সেরে নিই, তার পর সব দেখছি।'

জায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ওকে কিছু খেতে দাও না, বড়দি।'

বড়দি তখন শিলনোড়া লইয়া পড়িয়াছে। মুখ না ফিরাইয়া বলিল, 'কি আছে যে দেব। এ হতভাগা সংসারে কি সকালে দু' পয়সার মুড়িও আসবে যে দেব। একেবারে ভাত হলেই খাবে।'

তবুও উৎসাহের আতিশয্যে মালতীর মনে হইল না যে, ছোলার ছাতু তার অভুক্ত ভাসুরপোকে দেওয়া হয় নাই। সে আবার 'কাজটা সেরে নিই' বলিয়া চলিয়া গেল।

রান্নাঘরে বড় বউ একলা ঠোঁট উলটাইয়া হাতের একটা বিচিত্র ভংগী করিয়া যেন শিলনোড়াকেই বলিল, 'হায় রে কাজ! হতভাগী, কি নিয়ে তোর মাতামাতি, দু'দিন বাদে তো সবই ঘুচবে!'

নিজেকে দেখাইয়া বলিল, 'এ গায়ে কি কম সোনা ছিল। তা সবই গেছে এ সংসারের পেটে। যা হাঁড়ল গর্ত হাঁ বাবা এ সংসারের।...'

মালতী তখন শ্বশুরকে তামাক দিয়া বাক্‌স হইতে তার জমানো যে টাকা ছিল, তাহা বাহির করিল। একখানি ফরসা রুমালে হাতের ছ' গাছা চুড়ি ও সেই টাকা বাঁধিয়া শ্বশুরকে দিয়া বলিল, 'সোনা দেড় ভরি আছে বাবা, সামনে থেকে ওজন করিয়ে নেবেন। ব্রোঞ্জ আর কিনতে হবে না, ওর উপরেই কাজ হবে। বানি খরচার টাকাও ওর মধ্যেই রইল।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া আবার বলিল, 'যদি দেখেন বানি খরচা কুলোচ্ছে না, তাহলে আনাটাক সোনা বেচে দেবেন, কেমন?'

হ্যাঁ, সবই বুঝিয়াছেন গৌরমোহন, কিন্তু তিনি একটা দুর্ভাবনায় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। এ সংসারে অভাব চিরকালের। তাই সুনয়নী হইতে সুরু করিয়া বড় বউ, সকলেরই গা হইতে বিন্দু সোনাও চিমটি কাটিয়া লইয়া এ সংসার বাঁচাইতে ব্যয় হইয়াছে। সকলেরই মনে দুঃখ হইয়াছে সোনা দিতে। শরীর হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিতে কোন্ মেয়েই বা খুসী হয়! কিন্তু অলঙ্কার সোহাগী তাঁর এ বউটির কাছ হইতে কেমন করিয়া তিনি তাহা লইবেন? গহনার শোকে যে মরিয়া যাইবে তাঁহার বউমা! এমন যাহার সোনা-অন্ত প্রাণ, তাহার প্রাণটুকুও সোনা দিয়া মোড়া হইলে বোধ হয় ভাল হইত। হায় কপাল, সোনা কি শুধুমাত্র অলঙ্কারের জন্যই? তাহা দিয়া জগৎ চলিতেছে! কিন্তু বউমা তাহার কিছুই বুঝিবে না। জামা পরিয়া, চুড়ি ও পয়সার পুঁটলি পকেটে লইয়া, নমুনার খাতাটি বগলে গৌরমোহন বাহির হইলেন।

অনেক দিন বলিয়া বলিয়া আজ মালতীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে যাইতেছে, সেই খুসীতে সে আপন মনে হাসিতেছিল। বোধ করি ভাবিতেছিল, সেই চুড়ি পরিয়া কেমনভাবে সে অনুদের বাড়ীতে গিয়া দেখাইবে এবং এই হাতে কেমন মানাইবে বা সবাই না জানি কত প্রশংসাই করিবে। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ হাতের দিকে নজর পড়িতে অভ্যাসের ভুলে চুড়ি না দেখিয়া বুকটা তাহার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই হাসিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া দরজার কাছে প্রায় গৌরমোহনের গায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া বলিল, 'বাবা, খুব সাবধান কিন্তু, যা পকেটমারের দৌরাত্ম্য আজকাল।'

গৌরমোহন নিরুত্তরে বাহির হইতেছিলেন ঘাড় নাড়িয়া।

কিন্তু মালতী আবার খুব বিবেচনা করিয়া বলিল, 'নীচের পকেটের চেয়ে ওটা আপনি বুক পকেটে রাখুন বাবা। ও সব্বোনেশেরা কখন কি করে বসে তার ঠিক কি?'

গৌরমোহন রাগে ও বিরক্তিতে এবার বেশ সশব্দেই হাসিয়া উঠিলেন এবং মুখ ফিরাইয়া বুক-পকেটেই রুমালখানি রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ঘরের মধ্যে সুনয়নীর চোখের তারা দুইটি ঘরের বিগ্রহের দিকে নিবদ্ধ। ঠোঁট সামান্য নড়িতেছিল তাঁহার। তিনি বলিতেছিলেন, দুর্গা দুর্গা!

মালতী ফিরিয়া আসিয়া জায়ের ছেলেটিকে আদর করিতে লাগিল এবং বার

বার নিজেরা খালি হাত দুইটির দিকে চাহিয়া যেন প্রিয় আগমনের উল্লাসে চোখ হাসিয়া উঠিতে লাগিল।

গৌরমোহন পাঁচমন্দির পার হইয়া যে রাস্তাটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বড় রাস্তায় গিয়াছে সে পথ ধরিলেন। তাঁহাকে প্রথমে যাইতে হইবে হাজরার দোকানে, তার পর সাধুখাঁর তেল-ঘিয়ের খুচরা বিক্রির ঘরে। ওবেলা আবার সেই কাঁকিনাড়ায় যাইতে হইবে কয়েকটি দোকানে হিসাব লিখিতে। কোন্ ফাঁকে যে একটু সময় করিয়া আকুল স্যাকরার ঘরে যাইবেন, তাহাই ভাবিতেছেন।

বড় রাস্তার মোড়ে আসিতেই হঠাৎ চায়ের দোকান হইতে প্রায় গোপন হত্যাকারী সর্বনেশে শনিঠাকুরের মত পাওনাদার বলরাম সা গৌরমোহনের মুখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল এবং প্রণাম ভুলিয়া দাঁত খিঁচাইয়া জোর গলায় বলিয়া উঠিল, 'তবে যে বড় বাড়ীর মেয়েমানুষকে দিয়ে বলিয়ে দিলেন, বাড়ী নেই আপনি, অ্যাঁ? বামুন হয়ে এমন মিছে কথা?'

যেন প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে গৌরমোহনের সর্বাঙ্গ পুড়িয়া গেল। রক্ত নাই তাঁহার মুখে। তিনি বলিতে চাহিলেন, বলরাম, একটু আস্তে। কিন্তু তাঁহার ঠোঁট নড়িল, শব্দ বাহির হইল না।

বলরাম গলা চড়াইয়া বলিল, 'কি রকম কথা, মশাই। এত সুনাম আপনার, আর তলে তলে এত ছ্যাঁচড়ামো। ছি ছি ছি, তখন বলে কত কথা। ছেলের এগজামিনের ফি দিতে হবে, পরিবারের চিকিচ্ছের জন্য কবরেজকে টাকা দিতে হবে। আর এখন দেখা করা তো দূরের কথা, মেয়েমানুষকে দিয়ে মিছে কথা বলে দেয়। আমি ঠিক বুঝেছি—'

এবং বলরামের আস্ফালনে দুই-একজন লোক জমিতেছিল। গৌরমোহনের দর্‌দর্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে, কপালের চন্দন পড়িতেছে গলিয়া গলিয়া আর পৃথিবী দুলিয়া উঠিলেও দ্বিধা হইতেছে না। তিনি হঠাৎ মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পরশু, পরশু তোমার টাকা নিশ্চয় পাবে, বলরাম। হাজরার দোকানে তুমি এস, আমি থাকব।'

বলরাম চীৎকার করিয়া সমবেত কয়েকজনকে গৌরমোহনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইয়া দিল।

একটু অগ্রসর হইয়া গৌরমোহন দেখিলেন, ঘটনা দেখিয়া অদূরেই তাঁহার

ছোট ছেলেটি চোখাচোখি হইবার আশঙ্কায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গৌরমোহনের চোখে হঠাৎ পথ ও মানুষ সব ঝাপসা হইয়া গেল, একটা নোনা জলের স্বাদ তাঁহার মুখ ভরিয়া তুলিল, গাল বহিয়া আসিয়া। মনে হইল, তাঁহার কানের কাছে যেন কাহারা কোলাহল করিতেছে, এগজামিন, চিকিচ্ছে, দুধ, কয়লা...

বাড়ী ফিরিয়া গৌরমোহন ভাবিতেছিলেন, ছেলে সব কথাই বলিয়া দিয়াছে। কিন্তু হাওয়া দেখিয়া বুঝিলেন, বলে নাই।

মালতী আসিয়া জানিয়া তৃপ্ত হইল যে, চুড়ি ও টাকা স্যাকরার ঘরে পৌঁছিয়াছে, বানি খরচা আর লাগিবে না এবং চারদিনের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। বলিল, 'দেখুন বাবা, আমার হাতটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে। মেয়েমানুষের গায়ে সোনা না থাকলে কি বিচ্ছিরি দেখায়।'

তার পর চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'সোনা পরলে নাকি শরীর ভাল থাকে বাবা, অ্যাঁ?'

গৌরমোহন হাসিতে চেষ্টা করিয়া অন্যমনস্কভাবে সায় দিলেন।

তৃতীয় দিনে মালতী বায়না ধরিয়া বসিল, 'নতুন চুড়ি পরে আমি দুদিন বাপের বাড়ী ঘুরে আসব, বাবা! যেতে দেবেন তো?'

গৌরমোহন যেন চুড়ির কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত মালতীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিলেন, 'ও! আচ্ছা গো আচ্ছা, যেও।'

পর দিন সন্ধ্যার পরে গৌরমোহন মাতালের মত টলিতে টলিতে বাড়ী ঢুকিলেন এবং হাতের ছড়িটি উঠানে ফেলিয়া দিয়া একটা শ্বাসরোধী শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন মাথায় হাত দিয়া। তাঁহার সর্বাঙ্গে ঘাম পড়িতেছে, ভিজিয়া গিয়াছে জামা।

মালতী এবং বড় বউ রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। বড় বউ বলিল, 'কি হয়েছে বাবা, অমন করছেন কেন?' ভয় পাইয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ঠাকুর-পো! শীগগির এস, কি সর্বনাশ, কি হবে। বাবা, উঠুন, ঘরে চলুন।'

মালতী দুই হাতে গৌরমোহনকে টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল এবং বার বার

বলিতে লাগিল, 'কেন এমন হল, কি হল?'

ছোট ছেলেটি বাড়ীতে না থাকাতে বড় বউ ও মালতীর চেষ্টাতেই গৌরমোহন ঘরে আসিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

মালতী অকস্মাৎ দারুণ চিন্তায় চমকাইয়া শিহরিয়া উঠিয়া গৌরমোহনের প্রায় কোলের কাছে আসিয়া বলিল, 'বাবা, আমার চুড়ি এনেছেন তো?'

গৌরমোহন যেন কান্না চাপিয়া এক হাতে মুখ ঢাকিয়া আর এক হাতে তাঁহার একটি প্রায়-অর্ধেক কাটা নীচের পকেট দেখাইয়া দিলেন এবং ধপাস্ করিয়া মাটিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িলেন।

'অ্যাঁ, পকেট কেটে নিয়েছে?' বলিয়া ডুকরাইয়া উঠিয়া মালতীও আছড়াইয়া পড়িল মেঝের উপর এবং বালিকা বালিকার মতই কাঁদিতে লাগিল, 'আমার চুড়ি নেই, আমার চুড়ি নেই। বাবা দিতে চায়নি, মুখ ফুটে চেয়ে এনেছি গো!...'

বড় বউ শ্বশুর ও ছোট জা উভয়কে লইয়া পড়িল ও নানান সান্ত্বনার কথায় চেষ্টা করিতে লাগিল প্রবোধ দিতে। তাহার ছেলেটি বার বার মায়ের খুতনি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'মা, মাল্‌তি কাঁদে কেন?'

কান্নার মধ্যেই মালতী জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা, নতুন প্যাটার্ণ গড়া হয়ে গেছল?'

গৌরমোহন গোঁজা মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, 'হ্যাঁ।'

মালতীর কান্না আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল, 'দেখতেও পেলুম না, দেখতেও পেলুম না।...'

এমনি অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আলুথালু বেশে উঠিয়া মালতী দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আপনমনেই ভাঙা গলায় বলিল, 'বলরাম সা-র দেনাটাও যদি শোধ হত।'

বলিতে বলিতে তার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল থর্‌থর্ করিয়া এবং কান্নার অশান্ত বেগ লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

'কি বললে' বলিয়া হঠাৎ চমকাইয়া গৌরমোহন অপলক চোখে দরজার দিকে চাহিলেন। কিন্তু মালতী তখন চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রে আর কারুরই খাওয়া হইল না। বড় বউয়ের অনুনয়েও গৌরমোহন কিছু খাইলেন না। সুনয়নী খাইলেন না ওষুধ। তখন বড় বউ শ্বশুরকে শুইতে অনুরোধ করিয়া মালতীকে লইয়া তাহাদের শোয়ার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ছোট ছেলেটি তখনও বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই।

গৌরমোহনের চোখ হঠাৎ সুনয়নীর দিকে পড়িতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁর প্রতি অপলক স্থিরনিবদ্ধ সেই চোখে কি দারুণ ভৎর্সনা ও তীব্র অভিযোগপূর্ণ বেদনা। মনে হইল, তাঁহার বুকের চামড়া ছিঁড়িয়া কেহ সমস্ত হৃদয়টাকে খুলিয়া ধরিয়াছে এবং সেই খোলা হৃদয় ঢাকিতে তিনি যেন কোন্ অগ্নিগর্ভে তলাইয়া যাইতেছেন।

এক মুহূর্ত থমকাইয়া তিনি হঠাৎ সুনয়নীর রুগ্ন-গন্ধ বিছানাটার ধারে গিয়া, দুই হাতে তাঁর বাতপঙ্গু হাত দুইখানি নিজের হাতে লইয়া সিক্ত গলায় ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিলেন, 'নয়ন, নিজের পকেট কেটে আমি দেনা শোধ করেছি; বউমার কান্নায় এ বুকের কিছু নেই, কিন্তু তুমি যদি অমন করে চাও...'

বাক্‌শক্তিহীনা সুনয়নী কোন রকমে হাত দিয়া গৌরমোহনের মুখখানি তাঁহার মরিয়াও-না-মরা বুকে টানিয়া লইলেন এবং রোগবশতঃ মাথার উপর হাত দুটি কাঁপিতে লাগিল। জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল তাঁর স্থির অপলক সাপের মত চোখজোড়া হইতে। কিছু বলিতে চাহিলেন, পারিলেন না। কেবল ঠোঁট দুইটি নাড়িতে লাগিল।

শষ মেলায়

প্রথম দেখা পলাশপুরে।

মেলার পূবে—যেখানে গোধূলির লাল আলো যাবার আগে থর্ থর্ করে পাছিল সেইখানে সেই মনিহারি দোকানটার পাশে। গোলা খড়ি-মাটির পোঁছ ওয়া মাটির হাঁড়ি আর বাসনগুলোতে একাগ্রচিত্তে রঙগীন তুলির চিত্রাঙ্কন করে াছিল মোহন। জৌলুস বাড়াবার খাতিরে সামনে মাদুর পেতে ছড়িয়ে রেখেছিল কিছু রঙগীন কাঁচের চুড়ি।

নতুন ধানের আর তেলেভাজার কড়া ঝাঁজের গন্ধে, গোধূলি আলোর কোচুরি খেলা রঙগীন চুড়ির গায়ে—সমস্ত কিছু মিলিয়ে সমস্ত মেলাটাই একটা ৗর আকর্ষণে টানছিল গাঁয়ের ঘরের আটপৌরে মানুষগুলোকে। সমস্ত আবহাওয়াটা ন কি এক গভীর রসাবেগে চঞ্চল।

হেঁসেলের আর মাঠের কাজ না হোক, ব্যস্ততার কমতি নেই। কমতি নেই ামেচির, কারণে অকারণে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার অসংখ্য শঙ্কা, ব্যাকুলতা। ভ ক্ষতির হিসাবের গোলমাল ছাপিয়ে ওঠেনি প্রীতি আর প্রেমের কল-কাকলীকে। দের ছোঁ-মারা উধাও খাবারের জন্য প্রচন্ড কান্না।

গোধূলির স্বল্প ছায়ায় ভিড়ের বাড় ঝিমিয়ে এসেছে। আগামীকালের কাজ ছে মোহন—ছড়ানো চুড়ি আর আঁকাজোকা মাটির বাসনের মাঝখানে। মাঝে ঝে খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলছে, জিনিস দিচ্ছে, পয়সা নিচ্ছে আর কোলের উপর ড় নিয়ে ঝুঁকে পড়ছে তুলি নিয়ে।

কত সে অসংখ্য পট—মাটির বাসনের গায়ে। বাদ যায়নি অনাদি কামারের রশালা, ঘরের পিঠে বাবুদের জমিতে মানু সেখ আর অবিলাসের (অবিনাশ) রন দেওয়া মাটিকাটার ছবি। খাঁদু-পিসির ঢেঁকি-ঘরের পটও উঠেছে পাঁচ-পো ড়টার সরায়। কিন্তু কী সর্বনাশ! খাঁদু-পিসির ছেলের বউয়ের ঘোমটা খসা র্খানিও যে উঁকি মারছে—সরাখানির পটে! মনে মনে হেসে ওঠে মোহন। নলে পরে খাঁদু পিসি ঘাড় মটকে ছাড়বে।

বিলান দেশের ভাতের হাঁড়িটার গায়ে মা লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচার চোখ দুটো আঁকতেই খিল খিল হাসির শব্দে চমকে উঠল মোহন।

—'প্যাঁচার মুখ হলেন, কি মানুষের?'

একদল মেয়ের ঝাঁক থেকে ডাগর কটা মেয়েটা বিদ্রূপ ভরে ঠোঁট বাঁকিয়ে তেরছা করে চাইলে মোহনের দিকে। কথা শুনে সবাই হেসে উঠে ঢলে পড়ল এ ওর গায়ে।

কপাল থেকে চুলের গোছাটা সরিয়ে কটমট করে ফিরে তাকাল মোহন। তার কালো অংগ চক্ চক্ করে উঠল গোধূলির আলোয়। পাঁশুটে তুলির আঁচড় পড়ে গেল মা-লক্ষ্মীর কোল ভরা ধানের শিষে।

পরমুহূর্তেই মোহন হেসে উঠে বলল, 'প্যাঁচা ক্যানে, মানুষই বটেক। মিলিয়ে দেখে লাও ক্যানে তোমার মুখের সংগে!'

সুভদ্রার কটা মুখ মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল। সেই ক্ষণেই একটা কঠিন জবাব মুখে না এসে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল শুধু। ধারালো কাস্তের মত চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল।

সঙ্গিনীরা সব চকিতে সন্ত্রস্ত ভীত মুখে একবার মোহন আর একবার সুভদ্রার দিকে তাকায়। একটা ভীষণ অঘটনের জন্য যেন সবাই প্রস্তুত।

অমনি হাসিখুসি মোহনও যেন চকিতে গোঁয়ার গোবিন্দ হয়ে উঠেছে। এমনিই একটা তিক্ত হাসি ঠোঁটে নিয়ে সে কট্ কট্ করে তাকিয়ে রইল সুভদ্রার দিকে।

কিন্তু না। সুভদ্রার পান খাওয়া রক্ত রেখায়িত ঠোঁট ধনুকের ছিলার মত বেঁকে উঠেছে বাঁকা-কঠিন হাসিতে। বলল, 'আমি হলেন মহারাজা—বলে হবু ডোবার ব্যাংটা, বিণ্টা জলে মুখ দেখে কয়—হবু যেন চ্যাংটা। গিরস্তি বউকে ছামুতে জিজ্ঞেস করে লাও ক্যানে উটে কার মুখ! বলে, দাঁতের মধ্যে এঁটোলি—কত রংগ দেখালি। চল লো-চল্, ব্যাং নাগ (রাগ) করলে সাপের প্যাটে যায়—মানুষের পা চাপা পড়ে।' খিল খিল করে হাসতে হাসতে মেয়ের দল এগিয়ে গেল।

মোহনের হাত পা কানে কে যেন গেল আগুন ছড়িয়ে দিয়ে। ইচ্ছে করল ছুটে গিয়ে ওই কটা দেহ ধুলোয় ফেলে বে-টপকা ষাঁড়ের মত এলোপাথাড়ি ঠেংগায়। কিন্তু নিজের গাঁ-ঘর নয়। বিদেশ। তা' ছাড়া পরের মেয়ে 'বহুড়ি'। শুধু চেঁচিয়ে উঠল, 'গিরস্তি বউ কি বাজারি বউ ঠাওর করতে লারলাম। সময় বুঝে—বুঝিয়ে দিয়ে যেও ক্যানে?'

মেয়েদের দল থম্‌কে দাঁড়াল। আবার ফিরে গেল তাড়াতাড়ি।

এখানে সেখানে লম্ফ আর হ্যারিকেন জ্বলে উঠছে। ঘনিয়ে আসছে আঁধার। মেলার উত্তরে ঢোলকে ঘা পড়ছে—ডুম ডুমা ডুম্‌। গাওনা বাজনা হবে, ডাক আসছে আসরের।

মোহন সব গুটোতে আরম্ভ করে। কথাটা বলে বড় খুসী হয়নি সে। শান্তি পায়নি। এখন মনে হচ্ছে, অমন কথা না বললেই বুঝি ভাল হত। তবু কটা মেয়ের দেমাকের কথা ভেবে মনে মনে হাসতে হাসতে চুড়িগুলো তুলে তুলে একটা সাজিতে ভরতে লাগল সে। আজকের মত বেচা কেনা এখানেই শেষ। এখন শুধু খোলা থাকবে খাবারের দোকানগুলো। লোকজন গান বাজনা শুনবে—খাবার কিনবে, খাওয়াবে—খাবে। আর খোলা রইল কাপড় মনিহারির দোকান। নতুন করে খুলতে থাকল উত্তরের দরমা ছাওয়া খুপরি ঘরগুলো। বেশ্যাদের ঘর। গাওনা শুনে সকলে আসবে ফুর্তি করতে। গঙ্গা-সা'র দোকানে জ্বলে উঠেছে মাঝারি ডে-লাইট-খানি। সারা মেলার সমস্ত আকর্ষণ তখন ওই ডে-লাইটের আলোর ঝিলমিলি নানান রকম বোতলগুলোর গায়ে। মোহন সব গুছিয়ে তুলে উঠবে, এমন সময় একদল লোক এসে হাজির। সঙ্গে তাদের সেই মেয়েদের দলটা। সকলের আগে কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে দাঁড়ালো সুভদ্রা। দু'টুকরা অঙ্গারের মত দুটো চোখ দিয়ে একবার মোহনকে দেখে বাঁকা ঠোঁটে হেসে বলল, 'বুঝতে লারলে বাজারি বউ কি গিরস্তি, তাই বুঝুতে আসলাম। ই মানুষটা বুলে আমাদের বেবুশ্যে।'—বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মোহনকে। যেমনি বলা অমনি জোয়ান মানুষগুলো হিংস্র জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহনের উপর। চলল কিল চড় লাথি নিষ্ঠুর ভাবে। তছনছ্‌ করে দিল চুড়ি হাঁড়ির বোঝা।

একজন চুলের মুঠিতে একটা হেঁচকা টান মেরে বলে উঠল, 'শালা তু গিরস্তি বহুড়ি ঝিকে বলিস্‌ বেশ্যা?'

মনিহারি দোকানের মালিক হেঁকে উঠল, 'আরে এই, মারছিস্‌ কেন?'

এবার সবাই ছেড়ে দেয়। বলে, 'গালি দিয়েছে শালো মেয়ামানুষদের। মনে রাখিস্‌ ইটা পলাশপুরের মেলা। মেয়েমানুষের ইজ্জত আছে।'

মোহনের কষ বেয়ে চাপ চাপ রক্ত গড়িয়ে এল। নীচের ঠোঁটের মাঝখানটা কেটে ফাঁক হয়ে গেছে খানিকটা। বাঁ চোখের উপরটা ফুলে নীলাভ গুলীমত হয়ে

উঠেছে।

এক অদ্ভুত হাসি নিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে মোহন ফিরে তাকাল সুভদ্রার দিকে। সুভদ্রাও তার দিকেই তাকিয়েছিল।

ভাঙ্গা-চোরা জিনিষগুলোর দিকে দেখে ভ্রূ টান করে রক্তাক্ত ঠোঁটে হাসি নিয়ে ফিরে তাকাল সুভদ্রার দিকে আবার।

ততক্ষণে সুভদ্রার অঙ্গারের মত চোখ দুটো কে যেন এক গাদা জল ঢেলে নিভিয়ে দিয়েছে। বুকের মধ্যে এক ভীষণ ঝড়ের আবেগে তার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল থর্ থর্ করে! চকিতে পিছন ফিরে ঝড়ের বেগে সে চলে গেল।

আর সবাই খানিকক্ষণ হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। আসর জমানোর ঢাক পেটানো তখনো চলেছে। আসর থেকে হরিবোল ধ্বনি উঠেছে। বহু লোকের একটা চাপা কোলাহল আসছে ভেসে।

মোহন মনিহারি দোকানের বিচ্ছুরিত আলোয় হাতিয়ে দেখল। কোন বস্তুটাই আর আস্তো নেই। ভাঙ্গা-চোরা জিনিষের ভিতর থেকে পয়সার থলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

অদূরেই দৈনিক ছ' পয়সা ভাড়া করা চালা-ঘরটায় এসে লম্ফ জ্বালিয়ে রেখে গামছা নিয়ে বেরুল সে। ঘরের পেছনেই একটা পুকুর। সেখানে ডুব দিয়ে স্নান করে নিল।

আসরের ঢাক থেমেছে। গান ভেসে আসছে দু'এক কলি। আসরের 'বাহবা' ধ্বনি-ও শোনা যাচ্ছে দু' চারটে।

মোহন কাপড় ছেড়ে ফতুয়াটা গায়ে দিয়ে ঘর বন্ধ করে বেরুল।

চৈত্র রাত্রি। একটু একটু গরম পড়েছে বটে মিঠে মিঠে হাওয়াও আছে। পৃথিবীর নিরেট অন্ধকারকে রহস্যময় করে তুলেছে ছোট্ট এক ফালি চাঁদ। কোন কিছুই স্পষ্ট নয়—তবু সব কিছুই যেন মূর্তি ধ'রে সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মোহন খানিকটা এগুতেই তার দু'হাত দূরে একটা মূর্তি দেখে সে থম্‌কে দাঁড়াল। ঘোমটা ঢাকা মূর্তি। মোহন জিজ্ঞেস করল, 'কে হে?'

—'তুমি কে বটে?'

মেয়েমানুষের গলা শুনে একটু বিস্মিত হলেও চকিতে একটা সন্দেহ খেলে গেল তার মনে। বলল, 'আমি মোহন, দরিদ্র চিত্রকর। তুমি কে বটে?'

—'পলাশপুরের লাগাত নালগড়ের গণেশ কামারের মেয়্যা সুভদ্রা আমি।' সুভদ্রা ঘোমটা খুলে ফেলল। একবার মোহনের দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

সুভদ্রাকে চিনতেই মোহনের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'ইজ্জত বাঁচাবার লেগে কি আবার লোকজন ডেকে নিয়ে আসছ নাকি?'

কথাটা শেষ করবার আগেই বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল মোহন। স্পষ্ট দেখল সুভদ্রার চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল চক্ চক্ করছে।

আঁচলের গিট খুলে কয়েকটা টাকা বাড়িয়ে ধরল সুভদ্রা।—'অপরাধ হয়েছে, মাপ করে দেও। টাকা ক'টা লিয়ে মাল কিনে লিয়ে আস।'

—'সি হবেকনি!' মোহন আবার হেসে উঠল। —'দরিদ্দ হলেও তোমাদের প্যাঁচার মন খাটো লয় গো গণেশ কামারের মেয়্যা। ওটাকা তুমি ফিরিয়ে লাও।'

—'না!' সুভদ্রা দু'পা এগিয়ে এল।—'টাকা না লিলে বুঝব তুমার রাগ যায় নাই। ক্ষ্যামা কর—টাকা লাও। গোসাঁইয়ের আখড়ায় বাপ ভায়ের ছামুতে আসর থেকে পালিয়ে আসছি. দেরী হলে খোঁজ পড়ে যাবেক।'

মোহন তবু জোড়-হাতে অনুনয় করে. 'পা চাপা না পড়লেও—ও টাকা লিলে কিন্তু—ব্যাংএর মিত্যুর সামিল হবেক।'

আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে বলল সুভদ্রা; 'জন্ম বেধবা, বাপ ভায়ের গলগ্রহ; আমার কপাল খারাপ. তাই আমার মুখও খারাপ। মানুষকে বেথা দেওয়া স্বভাব। মাপ কর—টাকা লাও।'

—'তোমারে কু-কথা আমিও বুলছি। ও শোধবোধ হয়ে গেছে।'

—'না!' গলা ভেঙে এল সুভদ্রার! 'পর-পুরুষের ছামুতে এ্যামন করে কথা বুলি নাই কখনো. বুকের মধ্যে কাঁপন লাগছে। দেরী ক'রো না, লাও। পয়সা দিয়ে আমার অপরাধ শোধ হবে না. তবু লিতে হবেক। আপত্য কর না——লাও।' বলে চট্ করে টাকা ক'টা মোহনের ফতুয়ার পকেটে গুঁজে দিয়ে পিছন ফিরে এগিয়ে গেল সে।

ক্ষণিক বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে মোহন অনুচ্চ গলায় ডাকল, 'ওহে ও নালগড়ের মেয়্যা, একটা কথা শুন!'

দূরে দাঁড়াল সুভদ্রা। মোহন দু' এক পা এগুতে বলল. 'চৈত সংক্রান্তির

দিন কোপগড়ের মেলায় যেও। তোমার প্যাঁচার নিমন্তন্ন রইল। যাবা তো?'

দূর থেকে হালকা সুর ভেসে এল দু'বার—'আচ্ছা, আচ্ছা!'—আখড়ার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এদিকে মেলাতে গান জমে উঠেছে।

সেদিকে আর মোহনের যেতে ইচ্ছে করল না। ফতুয়ার পকেটে টাকা ক'টায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল সে।

মোহন সুভদ্রার আবার দেখা হল কোপগড়ের মেলায়।

চৈত্রের ঝোড়ো হাওয়ায় এলোথেলো চুলে একমুখ ধুলো নিয়ে এসে দাঁড়াল সুভদ্রা মোহনের সাজানো দোকানের ধারে। বড় লজ্জা করছে সুভদ্রার। মনে হচ্ছে যেন বড় বেশী বেহায়াপনা করে ফেলেছে সে কোপগড়ে এসে. তাই ভাল করে তাকাতে পারে না মোহনের দিকে।

'আরে বস বস!'—মোহন তাড়াতাড়ি হাঁড়ি চুড়ি সরিয়ে একটু জায়গা করে দেয়। 'ওরে বাবা প্যাঁচার কি ভাগ্যি! কার সাথে আসলে?'

সুভদ্রা বসে না। বলে, 'বাপের সাথে! আসতে কি চায়? বলে—বুড়ো হয়েছি, অত দূরের মেলায় যেতে পারবেক নি। অনেক কয়ে লিয়ে আসছি। হাতুড়ি বাঁটালোর দোকান খুলবে বলে! হুই পচ্চিম তরফে বাপ দুকান লিয়ে বসেছে।' বলতে বলতে ধুলোমাখা কটা মুখ তার লাল হয়ে ওঠে।

মোহন তাড়াতাড়ি খাবারের দোকান থেকে দুটো মিষ্টি আর এক ঘটি জল এনে দেয়। 'বস ক্যানে. খানিক জল খাও!'

সুভদ্রার আরও লজ্জা বাড়ে। বলে, 'না না, ইসব ক্যানে আনলে?'

'তা বললে কি চলে? তুমি ব্যাংএর অতিথি মিষ্টি মুখ করতে হবেক নি?'

সুভদ্রা গম্ভীর হয়ে বলে, 'তবে তুমার রাগ যায় নাই বল? ব্যাং প্যাঁচা বুলতেছ বারবার?'

মোহন তাড়াতাড়ি বলে জোড় হাতে. 'আহা, রাগ ক'রো না নলিগড়ের মেয়্যা। বড় ভাল লাগে বুলতে—তাই। রাগ' তো বলব না।'

চোখাচোখি হতেই আবার দু'জনে হেসে ফেলে। সুভদ্রা বলে. 'হাত মুখ ধোবার লাগে, না হলে সোয়াস্তি নাই।'

'বেশ। চল ক্যানে নদীতে যাই। দাক্ষিনে পলকের রাস্তা। যাবা?'

—'চল। বাপ দেখলে কিন্তুক্—'

—মোহন ততক্ষণে হাঁক পাঁড়তে শুরু করেছে; 'আরে ও গহর কুথা গেলছিস?'

বারো তেরো বছরের একটি ছেলে আসতে সে বলে, 'এট্টু বস, নদী থিকে আসছি বুঝলি?'

ছেলেটা সম্মতি জানিয়ে গদীতে বসে।

পথে চলতে চলতে সুভদ্রা বলে, 'ঘর কি তুমার এই কোপগড়েই?'

—'না! ভিটে খানিক আছে তুমার গিয়ে বোলপুরে। কিন্তুক আমি বারো-মাসই ঘুরে ঘুরে বেড়াই মেলায় বাজারে। প্যাটের লেগে বারামাস কাটে। তা—'

দুশ্চিন্তাটাও সংগে সংগেই মনে উদয় হয়। বলে, 'মানুষ জনার যা অবস্থা হবার লাগছে, মেলাগুলান সব পড়ে যাবেক। চাষ আবাদ নাই, পরে সহরকে যেতে হবে কুলির কাম ধরতে!' বলে মোহন হেসে ওঠে।

ক্ষয় পাওয়া ক্ষীণ নদী। সুভদ্রা হাত মুখ ধোয়। কানের পিঠে মাথায় একটু জল দিয়ে ঠান্ডা হয়ে নেয়।

মোহন খানিকটা দূরে বসে হঠাৎ এক অজানা আবেগে হেঁড়ে গলায় গান গাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুমি কে পাগলিনী হে, বহুদিনের চেনা বলে মনে হতেছে!...'

হাত মুখ ধুতে ধুতে সুভদ্রার কটা মুখ আবার লাল হয়ে ওঠে। লজ্জার আবেগে শাদা শাদা দাঁত দিয়ে সে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে।

হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেলে চলতে চলতে হঠাৎ সুভদ্রা বলে, 'তুমি বেয়া কর নাই?'

মোহন হা হা করে হেসে ওঠে। বলে, 'পাইসা কুথা যে, বেয়া করব? বাপেরা কি দেখে মেয়্যা দিবে বল? জমি নাই, মেলায় ঘুরবার লগে মেয়্যা ক্যানে দিবে লোকে?'

একটু চুপ করে থেকে বলে, 'সাথে সাথে ঘুরবেক, অ্যামন মেয়্যা এট্টা পেলে পরে বেয়া করতে সাধ যায়।' বলে চোখ বাঁকিয়ে চায় সুভদ্রার দিকে।

হঠাৎ কিসের এক আঘাতে সুভদ্রার বুকের মধ্যে আলোড়ন ওঠে। পদবিক্ষেপ-গুলো অসমান আঁকা বাঁকা হ'য়ে পড়ে। কিন্তু কিছু বলে না।

মোহন আবার বলে, 'দু'চার পইসা জমাতে হবেক, বেয়া এট্টা করবার লেগে।

বয়স হল তো?' ব'লে সুভদ্রার দিকে চেয়ে বলে, 'আহা, ঢ্যালা মাঠে চল ক্যানে, আলে উঠে আস।'

নিজেকে সামলে সুভদ্রা তাড়াতাড়ি আলে উঠে আসে। কিন্তু মোহনের হাসি ভরা মুখের দিকে আর চাইতে পারে না। মেলায় এসে মোহন মিষ্টি দুটো সুভদ্রার হাতে দেয়। 'এটু জল খেয়ে লাও, প্রাণটা ঠান্ডা হবেক।' বলে ঘটিটা বাড়িয়ে দেয়।

সুভদ্রা অন্যদিকে ফিরে মিষ্টি খেয়ে জল খায়।

মোহন বলে, 'গহরা, এট্টা পান লিয়ে আয় ক্যানে। বুলিস মিঠে পান দিতে!'

'না না' বাধা দেয় সুভদ্রা।—'পান খাবেকনি আমি।'

বলে উঠে দাঁড়াতেই বছর তিনেকের একটি উলঙ্গ হৃষ্ট পুষ্ট ছেলে এসে মা' মা' বলে তাকে জড়িয়ে ধরে।

'অমা গো!' সুভদ্রা তাকে বুকে তুলে নেয়। বলে, 'দেখ, মা হারিয়ে ফেলে, খুঁজে বেড়াচ্ছে। আহা, এটু খানিক খুঁজে দেখ না ক্যানে, ছ্যালেব মা'টা গেল কুথা?

মোহন হাঁ করে খানিকক্ষণ সুভদ্রাকে দেখে হঠাৎ বলে, 'তুমার ছ্যালে পিলে নাই—না?'

অকস্মাৎ এমন একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না সুভদ্রা। জবাব দিতে গিয়ে গলাটা বুজে এলো তার। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল।

'আহা-হা, কাঁদ ক্যানে?' ম্লান হয়ে যায় মোহন। বলে, 'ভুল করে দুঃখ দিয়েছি, কেঁদ না।'

এমন সময় একটি মেয়েমানুষ পাগলের মত ছুটে এসে সুভদ্রার বুক থেকে ছেলেটাকে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। বুকের ধন বুকে পেয়ে এক ঘা কসিয়ে দেয় ছেলেটার পিঠে। সুভদ্রাকে বলে, 'হারামজাদা ছ্যালে আমার প্রাণ উড়িয়ে নে'ছিল। বুকটার মধ্যে কেমন করতে লেগেছে হারিয়ে থেকে। ভাল মানুষের কাছকে আসছিল, নাহলে কুন্ ঘাটে যেতাম বল।'

ফিরে যেতে যেতে বলে, 'চ' তোর বাপ কোথা গেল আবার দেখি।'

মেলার জনারণ্যে মিশে গেল তারা। কিন্তু মোহন আর সুভদ্রা কি এক অব্যক্ত বেদনায় যেন মূক হয়ে রইল।

খানিকক্ষণ পরে মোহন বলে, 'দুকখু করো না সুভদ্দা। তুমার কোলে ছ্যালে বড় ভাল লাগল তাই বুলছি। ভগবান বড় নিদ্দয়, না হলে—'

কথা শেষ না করে সে সুভদ্রার নতমুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলে, 'এট্টা বেয়া ক্যানে করনা তুমি?'

—'দূ-র!' সুভদ্রার মুখ আবার রাঙা হয়ে ওঠে।

—'দূর ক্যানে, ল্যায্য কথা বুলছি। বেধবা তো কি, পানে (প্রাণে) এট্টা সাধ আহ্লাদ তো আছে?'

—'আচ্ছা, আচ্ছা।' প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুভদ্রা। 'আমি চলল্যাম। দেরী হলে বাপ হামলে উঠবেক্।'

শেষকালে আবার একটু ঠাট্টা না করে পারে না মোহন। বলে, 'শুন, এট্টা শোলক্ বলি।—তাকের উপর শিশিটা লড়ে চড়ে পড়ে না। যে না বলতে পারে সে জন্ম কানা। মানে কি হল—জবাব দিয়ে যাও ক্যানে?'

জবাব দেওয়ার আগেই সুভদ্রার চোখ দুটো হেসে ওঠে, বলে, 'চৈকের মনি (চোখ) হল।'

মোহন হেসে বলে, 'তুমার নয়ন দুখানি ঠিক তাই। পাগল কালো ভোমরার পারা, লড়ে চড়ে, ভয় লাগে—পড়ে বুঝি যাবে।'

'আ মাগো!' সুভদ্রা খিল খিল করে হেসে ওঠে। 'তুমার চৈক ভাল নয় বাপু। কবিয়াল নাকি তুমি?'

হো হো করে হেসে উঠল মোহন। তাড়াতাড়ি সুন্দর চিত্র করা সরা ঢাকা হাঁড়ি তুলে নিয়ে বলে, 'তুমার নেগে কিছু দব্য রাখছি, লিয়ে যাও। আপত্য করতে পারবেক না। লাও।'

'কি আছে?'

'সি তুমি দেখে লিও। আর এট্টা কথা'—

ব্যাকুল আবেগে যেন কেঁপে উঠল মোহনের গলা—'কোপগড়ের মেলা আজই শ্যাষ। মাঝে বোশেখ্ আর জষ্টি; যদি দিনকাল ভাল থাকে, মনে যদি থাকে প্যাঁচাকে, আষাঢ় মাসে রথের মেলায় জয়পুর হাটে আইস। আসবা তো?'

এমন করে কেন মোহন বলে! বুকটার মধ্যে আথালি পাথালি করে সুভদ্রার। ঘাড় কাৎ করে বলে, 'আসব!'

'তুমার বাপকে লিয়ে এইস, তার ছামুতে অনেক কথা আছে।'

সুভদ্রা এগুতে আরম্ভ করে। মোহন পাশে পাশে চলে। আর চির খাওয়া

মোটা ঠোঁট দুটো কাঁপে। কি যন বলতে চায়! শেষটায় না থাকতে পেরে বলেই ফেলে, 'একখান ছোট মোট ভিটে আর মা দুর্গের কোলে গণেশ ঠাকুরের পারা একটা ছ্যালের বড় সাধ আমার, সি কথাটাই তুমার বাপকে বুলব সুভদ্দা।'

ঠিক এই সময় একটা গোঁ গোঁ শব্দে চমকে উঠল তারা।...কোপগড়ের তেপান্তর ভেঙেগ দুরন্ত কাল-বৈশাখীর ঝড় হু হু ছুটে এল। ধুলোয় চোখ ভরে দিয়ে অন্ধকার হয়ে উঠল মেলা। মোহন চেঁচিয়ে উঠল, 'মনে রেখো, রথের মেলা, জয়পুর-হাটকে।'

সুভদ্রার উত্তর হাওয়ায় উড়িয়ে নিল। হাওয়ার টানে কথা শোনাল একটা আর্তনাদের মত।

তারপর গেল কাল-বৈশাখী, গেল কাট-ফাটা জ্যৈষ্ঠ ধরিত্রীর বুক চিরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আগুন ভরে দিয়ে। তারপরেই এল আষাঢ় দাদুরি ডাহুকির প্রাণে সাড়া জাগিয়ে। প্লাবনের প্রথম সংকেত দেখা দিল আকাশের গাঢ় কালিমায়।

সুভদ্রা এল জয়পুর হাটের মেলায়। মোহন গেয়েছিল—তুমি কে, পাগলিনী হে! সেই পাগলিনীর মতই এল সুভদ্রা আষাঢ়ের ঝড় জল মাথায় করে। মোহনের সে স্বপ্ন আজ তারও বুকে দানা বেঁধে উঠেছে, ছোট মোট একখান্ ভিটে। আর গণেশ ঠাকুরের পারা একটি ছ্যালে! দু'মাসের প্রতিটি ক্ষণে নিরালায় ঝামেলায় শুধু সেই কথা। কথা নয়, কথা আজ গান হয়েছে হৃদয়ের, ধ্যান হয়েছে জীবনের।

মোহন হেসে অভ্যর্থনা জানালো, 'আস আস। আজকে আমার মেলা জমলো। কি ভাগ্যি ভুলে যাও নাই?

কিন্তু সুভদ্রা চমকে উঠল মোহনকে দেখে। 'একি শরীল হয়েছে তুমার?'

'ভাবছ ক্যানে?' মোহন হেসে বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবেক। 'অনিন্দার' ব্যামো হয়েছিল—সেরে যেছে। কথায় বলে, কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবেকনি। পাইসা জমাতে লাগছি।'

সুভদ্রা হাসতে পারে না। মোহন আবার বলে, 'ভিটে সমসার (সংসার) করতে পাইসা চাই না— একটুকুন মাটি করতে হবেক, নইলে ঘুরতে হবেক মেলায় বাজারে।'

সুভদ্রা বলে, 'তা তুমার শরীল এমন হয়ে যেছে ক্যানে? নিজেকে দুঃখু

দাও তুমি।'

'পাগল!' মোহন হো হো করে হাসে, 'দিনকালটা দ্যাখেছ? বিলান দ্যাশে শুনি দুর্ভিক্ষ আসছে, শরীলের জলুস থাকবে ক্যামন করে? এটু দুব্বল হ'য়েছি, সামনে আকাল আসলে একেবারে মিশে যাব ধুলোয়।'

সুভদ্রা মনে মনে ডুকরে উঠল, 'হেই মাগো, মানুষটার মুখে কথা আটকায় না।'

'তুমার বাপকে লিয়ে আস নাই?' মোহন জিজ্ঞেস করে।

—'বাপের আর উঠবার ক্ষ্যামতা নাই। ভয় হয়েছিল বুঝি আসতে পারবনি শ্যাষে'—

এতক্ষণে লজ্জায় ঢেকে এল সুভদ্রার গলা, 'পলাশপুরের কামারেরা আসছিল। মা'য়ের নাম লিয়ে তাদের পাছু পাছু চলে আসছি।'

—'একা একা?' বিস্মিত হাস্যে ভরে উঠল মোহনের মুখ, 'একেবারে পাগলীর পারা নাকি?'

সুভদ্রা লজ্জায় মুখ ফেরায়।

—'তবে ই-বারটাই শ্যাষ।' ধুলো ঝাড়বার মত দু হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বলে মোহন, 'ঘুরতে আর মন লাগে না। পলাশপুরের মেলায় তুমার বাপকে বলে সব লিয়ে থুয়ে কোপগড় ঘুরে এ্যাক্কেবারে বোলপুর।'

আরও সুদীর্ঘ আট মাস! সুভদ্রার ব্যাগ্র চোখ দুটো মোহনের রুগ্ন শরীরটাকে যেন একবার লেহন করে নিল। কিছু বলতে চাইল। কিন্তু পারল না।

'সত্যই, ভিটে মাটি করতে হবেক, 'পাইসা' চাই না?'

—'আট মাস!' মোহনই বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে।

—'সুভদ্দা!' সেবারের মত আবার গলা কেঁপে উঠল মোহনের, 'ঠাকুর করে আকাল না আসে। আটটা মাস কাটিয়ে দিব। কবিয়ালের গায়েন শুনছ সি, সুখের পরে দুখ—এনারা হলেন দু'ভাই! এক ভাই ছাড়বেক, এক ভাই আসবেক।'

বলতে বলতে হাসতে হাসতে মোহনের দু চোখে টলমল করে উঠল দু ফোঁটা জল।

'মাঝে আটটা মাস তারপর 'চিত্তকর' মোহনের ভিটেমাটি, 'সমসার' গণেশ-ঠাকুরের পারা একখানা ছ্যালে।' তাড়াতাড়ি জল মুছে বলে, 'তখন কিন্তু ভুলে যেও না তুমার প্যাঁচাকে!'

তারপর হু হু করে কেটে গেল আটটা মাস। শীতের রুক্ষ অবরোধ ভেঙেগ দক্ষিণা হাওয়া ছুটে এল প্রান্তর ভেঙেগ নলিগড়ে। পাতা ঝরল, পথ ছাইল। কিন্তু সে পথে বিপনি বয়ে মেলার দোকানীরা আসছে কোথায়! ঝরা-পাতা মর্মরিয়ে সুদীর্ঘ পথ বয়ে চলেছে শুধু মিছিল! কঙ্কালের মিছিল!

চৈত্রের দুপুরে নিস্তব্ধ পলাশপুর ডুকরে ডুকরে কাঁদছে পথে বাজারে ঘরে ঘরে। খরো জ্যৈষ্ঠ না আসতেই পাশুটে প্রান্তরের ফাটলময় দানবের মত হাঁ করে আছে, থর্ থর্ করে কাঁপছে।

মেলা বসল না।

নির্জন মেলায় উত্তপ্ত মাটিতে ভেঙেগ পড়ল সুভদ্রা, 'আমার ভিটে. 'সমসার' —'গণেশ ঠাকুরের প্যারা ছ্যালে খেয়ে লিছিস্ তু মা ধরিত্তি!—'

তবু শেষ আশা নিয়ে সে ছুটল কোপগড়ের দিকে। চৈত-সংক্রান্তির মেলা। যদি সুভদ্রার প্যাঁচার দেখা সেখানে পাওয়া যায়!

আছে, আছে!

দূর থেকে দেখা যায় কোপগড়ের মেলায় কারা যেন বসে আছে। অনেক মানুষ। মাথা নেড়ে নেড়ে এ ওর সঙেগ কথা বলছে। কালো কালো অনেক মানুষ! কিন্তু ঘর দেখা যায় না একটাও। শুধু মানুষ আর ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

ছুটে কাছাকাছি এসেই থম্কে দাঁড়াল সুভদ্রা। ছলাৎ করে দেহের রক্ত মাথায় উঠে এল।

মানুষ নয়। ওরা শকুন!

পাখার ঝাপটা দিয়ে শকুনের দল বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল। মৃত কঙ্কালের ছাওয়া এ তেপান্তরের শ্মশানে জ্যান্ত মানুষ শকুনেরা অনেকদিন দেখেনি।

শকুনের মেলা থেকে মাথা তুলল একটা বিকটাকার কুকুর। উগ্র দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস ভরপুর!

সুভদ্রা হামলে পড়ল মাটিতে—'তু খেয়ে নিছিস্ মা-ধরিত্তি, আমার ভিটে, সোমসার, গণেশ ঠাকুরের পারা ছ্যালে, আমার প্যাঁচাকে তু খেয়ে নিছিস্!...'

নিবিষ্ট চিত্তে খানিকক্ষণ সুভদ্রাকে দেখে রক্তাক্ত লাল ঝুটি নেড়ে একটা গৃধিনী আর বিকটাকার কুকুরটা আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

জলসা

সকলেই তাকিয়ে দেখছে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে।

কোম্পানীর লাইনের সামনের ময়দানে একদিন আগে থেকেই তোড়জোড় চলেছে জলসার।

বিরাট মঞ্চের ওপর গান্ধীজীর প্রতিমূর্তিওয়ালা নতুন 'সিন্' খাটানো হয়েছে। সুবৃহৎ সুবর্ণ মণ্ডিত পটে গোলাকার ধাঁধানো আলোর মধ্যে দু'দিকে দু'খানি মুখ। একখানি পণ্ডিত জওহরলাল, অপরটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। একধারে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মূর্তি। কোষোন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সামরিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। তা ছাড়া খাটানো হয়েছে বহু রকমের ছবি। গান্ধীজী থেকে সুরু করে অরুণা আসফ আলী পর্যন্ত।

বাবু সাহাব কর্পূর সিং দেখা শোনা করছেন। লিবার অপ্সর বোনার্জী সাহাব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছেন কোথায় কি সাজাতে হবে।

আগামী কালকের জলসার প্রস্তুতি হচ্ছে।

লাইনের লোকেরা সব নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—আর দেখছে।

কাজ থেকে ফিরে এসে মৌজ্ করছে সব বসে, আর আগামীকালের জলসা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে। কি হবে না হবে তারা না জানলেও জলসা সম্বন্ধে একটা ধারণা তাদের আছে। আর সেই ধারণাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এক একজন এক একরকম করে বলছে।

মিস্তিরি হারু ঘোষ বুদ্ধিমানের মত সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে দিচ্ছে। কি হবে না হবে সে নাকি সব আগে থেকেই জেনে ফেলেছে।

বনোয়ারী পথ-চলা গুটিকয়েক বিলাসপুরী মেয়েকে দেখে গোঁফ পাকাচ্ছিল। মনে মনে খানিকটা রস-সিক্ত কল্পনার আবেগে চাপা গলায় একটা দেহাতি গান গুনগুনিয়ে উঠল সে। মেয়ে ক'টা চলে যেতেই একটা প্রশ্ন হঠাৎ তার মনে এল। জিজ্ঞেস করল, এ মিস্তিরিজী, কাল একঠো নাচওয়ালী ভি আসবে?

জবাব দিল রামাবতার, শালা বুড়বক হ্যায়। এ ধরম কা জলসা। গান্ধীবাবা

কী তস্‌বীর দেখা নেই? কি বোলো মিস্তির ভাই—বাঈজী হিঁয়া ক্যায়সে আসবে?

—তুই ব্যাটার বুদ্ধিই ওরকম। হারু হেসে বলে বনোয়ারীকে—তোকে বাঈজীর নাচ দেখাবার জন্য লেবারবাবু আর বাবুসাহেব খাটছে।

একটা রসালো খিস্তি করে হেসে উঠল হারু।

মুসলমান লাইনটার চাখানাতেও কথা উঠেছে এই জলসার ব্যাপারেই।

শরীফ মাথার ঝাঁকড়া চুলের গোছা থেকে পাটের ফেঁসো ঝাড়তে ঝাড়তে বললে—সব্‌হি আদমি যায়ে গা তো, হিন্দু মুসলমান দুনো? কাঁ হো সোলেমন্‌?

সোলেমানও তাকিয়েছিল মণ্ডটার দিকেই। অন্যমনস্কের মত জবাব দিল সে, ক্যায়া মালুম! হোগা সায়েদ্‌। জলসা তো হ্যায়।

গোলাম মহম্মদের বিবি ঘরের সামনে চটের পর্দাটা সরিয়ে বারে বারে দেখছে মণ্ডটার দিকে—এত্‌না বড়া গান্ধীবাবার তস্‌বীর কখনো দেখেনি সে। কিন্তু লাল লাল ড্যাবা ড্যাবা মাতোয়ালের মত চোখওয়ালা লোকটা খালি তার দিকে দেখছে চা-খানা থেকে। আচ্ছা বেয়াদপ কমিনা আদমি তো!

হাফিজ খানিকটা গুম্‌ খেয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে। লেড়কাটার বিমারি আজ তিনমাস থেকে। ডাগদর হেকিম ঘাঁটাঘাঁটি করল নিয়ে অনেকদিন। সারবার নামটি নেই। কাজ থেকে ফিরে রোজানা ওই একই দৃশ্য ঘরের মধ্যে। তবিয়ত চায়না আর এসব দুখ তখলিফ্‌ সইতে। ফের ডাগ্‌দরের কাছে যেতে হবে।—ভাবতে ভাবতে ওঠা আর হয়ে উঠছে না। দাওয়াইয়ের পয়সা নেই। বিরক্ত হয়ে জলসামণ্ডের দিকে ফিরে তাকায় সে। খানিকটা গম্ভীর হয়েই ভাবতে হয় তাকে আজাদ হিন্দুস্থানের কথা। লিবারবাবু জলসা-খাতির কাজ দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছে। কোম্পানীর লউরী করে জলসার মালপত্র আসছে। খুব ভারী জলসা হবে সন্দেহ নেই।

বিবির দিকে তাকাল সে। বিবি রুটি বানাচ্ছে। তা, রাত্রের অন্ধকারে ঘরের দরজাটা খুলে বসে বিবি জলসা দেখতে পারে। লেড়কাটা খুঁৎ খুঁৎ করবে হয় তো। তবিয়ৎ ভাল থাকলে হাফিজ না হয় একবার গদীতে তুলে নিয়ে ঘুরেই আসবে।

খুব ভারী জলসা হবে। লেড়কালোক না দেখলে মানবে কেন? ঘরের সামনে জলসা! তবিয়তটা ভাল থাকলে লেড়কাটা ফুর্তি করে দেখতে পাবে জলসা।

দু'একটা টাকার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল সে। দাওয়াই একটু না আনলে নয়।

ফুল মহম্মদ থেকে থেকে খানিকটা সন্দেহে জলসার দিকে তাকিয়ে বুড়ো বাপ রহমতকে জিজ্ঞেস করে, ই লোগ্‌কা মতলব্‌ ক্যায়া?

তোবা তোবা!—বুড়ো রহমৎ বিরক্ত হয় লেড়কাটার এ সন্দেহে। এখন হিন্দুস্থানে লীগ পার্টি নেই, নেই দাঙ্গা। এখন এত সংশয়ের কি আছে?

ফুল মহম্মদ তা জানে। তবে কর্পূর সিং লোকটাকে সে কোনদিনই ভাল চোখে দেখে না, দাঙ্গার টাইমে গোয়ালা-লোকদের ক্ষেপিয়ে ওই লোকটা দাঙ্গা বাঁধিয়ে ফেলেছিল আর কি।

তবে জলসা সম্বন্ধে সে বড় সজাগ। গাওনা বাজনা চিরকালই সে ভালবাসে। বিশেষ করে কাওয়ালী। সে নিজেই একজন গায়ক। একটা ছোটখাটো কাওয়ালীর দলও আছে তার।

কিন্তু তাকে কি ওখানে ডাকবে? কেত্‌না বড়া বড়া আদমি, গানেওয়ালা বাবু সাহাবরা আসবে সব! যা-নে দেও, হৈ চৈ করা যাবে খানিকটা।

মুসলমান লাইনটার পরেই বিলাসপুরী লাইন। ছুটির পর রান্না-বান্নার আয়োজন চলেছে সেখানে। বিশেষ করে চলেছে জেনানা লোকদের প্রসাধন। ভগৎ ওর মেহেরারুকে গদীতে বসিয়ে চুল বেঁধে দিচ্ছে। এটা ওদের বিশেষ কোন রেওয়াজ নয়। তবে চলে এরকম। একটা বিশেষ ধরনের কাপড় পরার ভঙ্গীতে ওদের শক্ত সমর্থ শরীরগুলো আদমিদের কাছে একটা লোভনীয় বস্তুই বটে। মনগুলোও তাই। মহব্বতের ব্যাপারে ওরা ভয়ানক দরাজ। বোধ হয় স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ওরা হার মানিয়েছে মর্দানা লোকদের, তাই ওদের নিয়ে টানাটানি বেশী, কাড়াকাড়ি হয় প্রায়ই!

আসলে ওরা খাটতে পারে খুব আর বেপরোয়াও তাই বেশী। ফলে ওদের মর্দানাগুলো হয় নিরীহ নির্জীব গোছের। শরীরে না হলেও মনে মনে।

ঘরের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সারবার দিকে আজ ঝোঁক বেশী ওদের। কাপড় চোপড় সাফা করতে হবে। জাঁকিয়ে বসে জলসা দেখতে হবে কাল।

চুল বাঁধার পর ভগৎ বাজারে চলল ওর মেহেরারুর জন্য কাঁচপোকার টিপ্ আনতে। বৈজুর বউ কুন্থি একপাল ছেলে নিয়ে বসেছে খাওয়াতে। তা শয়তানের বাচ্চাগুলো কি খেতে চায়? খালি জলসার কথাই ওরা বক্বক্ করে চলেছে। কুন্থিকে আবার নাইতে যেতে হবে। হারামজাদাগুলো খেয়ে না উঠলে যাওয়া হবে না তার। কয়েকবার তাড়া দিয়ে যখন হল না, একটা লকড়ি নিয়ে বড় ছেলেটাকে একঘা কষিয়ে দিল সে। হাঁ, শুধু নাহালে তো হবে না, পুরোনো লাল শাড়ীটায় খুব হুঁসিয়ার করে আবার সাবুন লাগাতে হবে। অমন ভারী জলসাটা দেখতে যেতে হবে তো!

বিধবা ছোঁদি লাইনের মর্দানাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করতে করতে খিল খিল করে হাসছে আর নিজের বাঁধানো রোয়াকে একটা নতুন শাড়ীকে বাসন্তী রঙে ছোপাচ্ছে। হোলী চলে গেলেও প্রাণের উচ্ছলতা আছে। কাপড় ছোপানোটা হোলী ছাড়াও চলে তার। তাকে হিংসা করে এ লাইনের আর সব কমিনামাগীগুলো—তা সে জানে। তাই হাসির ঘটা সামান্য কারণে তার ফেনার মত ছিটিয়ে পড়ে চারদিকে। আগামীকাল জলসা দেখবার জন্য শাড়ীটা ছোপাচ্ছে সে। একটু বেশী সাজগোজ না করলে তার চলে না। সর্দার মিস্তিরিরা তাকেই আবার একটু বেশী কদর করে কিনা। পাটঘরে কাজ করে সে। পাটঘরের সর্দার তো ছোঁদিকে গিলে খাওয়ার জন্য জুলুম সুরু করেছে প্রায়। মর্দানাগুলোর আদেখ্লেপনা আর আহাম্মুকি দেখলে না হেসে পারে না সে। তাই হাসি তার কারণে অকারণে লেগেই আছে। আগামীকালের জলসায় লিবারবাবু থেকে সুরু করে সর্দার মিস্তির কুলি কামিনেরা আগে তাকেই দেখবে। সে কথা মনে করে মনের মত করে শাড়ী ছোপায় সে। সঙ্গে আবার একটা ছোট্ট হাফশার্টও ছোপায়। জাত তো খুইয়ে বসে আছে সে, একথা সবাই জানে। তাই নাম-গোত্রহীন কুড়িয়ে পাওয়া একটা কালো কুত্কুতে ছেলেকে পোষে সে। সেই ছেলেটার জামাও ছুপিয়ে নেয়। জলসা তো সেও দেখবে।

মনোহরের মেহেরারু পালিয়ে গেছে। সেই থেকে ও একলাই থাকে। বড় ক্ষীণজীবী আর খেকুঁড়ে সে। ডগদর তাকে দাওয়াই খেতে বলেছিল। খাচ্ছিলও

সে। কিন্তু এখন আর খাওয়া হয় না। তখন ওর বহু কাজ করত, পয়সা দিত দাওয়াইয়ের। কিন্তু হারামজাদীর তা সইল না। এমন মর্দানার ঘর ছেড়ে—জোয়ান একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নতুন ঘর বেঁধেছে সে। মনোহর রোজ কাজ থেকে এসে খাটিয়াটায় গা ঢেলে দেয়। আজ মাঠের দিকে মুখ করে শুয়েছে সে। জলসার সাজগোজ দেখছে। খুব ভারী জলসা হবে, আয়োজন দেখে বুঝতে পারে। অনেকদিন লোকজনের সঙ্গে মেশামেশি ছেড়ে দিয়েছে মনোহর। কিন্তু জলসার বিচিত্র রংদার সাজানো দেখে কালকে যাবে বলে এনতাম্ করতে থাকে। একটা কটূক্তি করে মনে মনে ভাবে যে সেই রেণ্ডিটাও কাল আসবে হয় তো। অর্থাৎ ওর পালিয়ে যাওয়া বউ।—আসুক, কস্বীটার দিকে সে ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু জলসায় সে যাবে। কেন না জলসার এমন আয়োজন সেই পোন্দ্রা আগস্ট ছাড়া আর হয়নি।

ভারী ভারী আদমিদের তস্বীরগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে। গান্ধীবাবা, জওহরলাল, সর্দার বল্লভভাই পাটিল।

সবচেয়ে বেশী খুসীয়ালি ভাবটা বিহারী লাইনে।

ধুলো-মাখা নেংটি পরা একদল ছেলে একটা পুরোনো জং-ধরা টিনের ওপর লাঠি দিয়ে পিটছে আর 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গাইছে। আগে ওরা সিনেমার দু'এক কলি গাইত, অথবা রামলীলার একআধ কলি। আজকাল গান্ধীবাবার ওই গানটাই সকলে শিখে নিয়েছে। ও ছাড়া গান নেই এখন। কালকে জলসার ওখানে খানা মিলবে, এ আলোচনাও হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। পুরি-তরকারির একটা রসালো আয়োজনের কল্পনায় ওরা ছাগলবাচ্চার মত লাফাতে মশ্গুল।

বাট্না বাটতে বাটতে বদন জিজ্ঞেস করে শুকালুকে—কাঁ হো শুকালু, গান্ধীবাবাকি তর্পণকে লিয়ে জলসা হো রাহা হ্যায়?

শুকালু একটু ধার্মিক গোছের লোক। জাতে সে মুচি, তাই ধর্মের গোঁড়ামি তার বেশী। পণ্ডিতের মত গম্ভীরভাবে বলে সে, হাঁ। রোহিতাস্কে গানা ভি হোগা। অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের আখ্যানও গীত হবে। এটা হল শুকালুর পাণ্ডিত্যের আন্দাজি কথা। কারণ রোহিতাস্কে গানা অনেকে তার

কাছে শুনতে আসে। বদন গোয়ালা হলেও মুচির কথায় তার অখণ্ড বিশ্বাস। রোহিতাশ্বের গান হবে শুনে সে খুব খুশি। ভুলেই গেল যে, এতক্ষণ সে শঙ্কিত চিত্তে সাহুজীর অপেক্ষা করছিল। সুদের টাকা জোগাড় হয়নি। জিজ্ঞেস করল, তুম্ গাওগে?

শুকালু ঠোঁট কুঁচকে এমনভাব করল যে তেমন বেতমিজ সে নয়।

কানের পিঠে হাত দিয়ে মহাদেও গান ধরেছে, 'কালী কেলকাত্তামে বৈঠল বারম্বার ভারতমে।' মা কালী বার বার কলকাতাতেই আস্তানা গেড়ে বসলেন, সে কথা শোনাবার জন্যে এ গান গায়নি মহাদেও। তার খুশির কারণ, কাল শুক্ হপ্তার দিন আর জলসা, পরশু শনিচার আধবেলা কাম, তারপর এতোয়ার—জংলা ঘুমে যাওয়ার দিন। মানে, শহর ছেড়ে মাঠে ঘাটে বেড়াতে যাওয়াকে ওরা বলে জংলা ঘুমে যাওয়া। চিরকালের গেঁয়ো মেঠো চাষী সে। নোকরির খাতিরে এখানে এসেছে। তাই এতোয়ার এলেই জংলা ঘুমতে যাওয়াটা তারপক্ষে খানিকটা অভিসারে যাওয়ার মত।

চন্দ্রিকা লক্‌ড়ি কাটতে কাটতে এক একবার জলসামঞ্চের দিকে দেখছে আর তার জেনানা সুভদ্রার সঙ্গে খাপছাড়া ভাবে দু'চারটে কথা বলছে। সুভদ্রার এখন ভরা পেট। অর্থাৎ অভি লেড়কাহোনেবালী। যে কোন-দিন যে কোন মুহূর্তে দরদ উঠে বেঁকে দুম্‌রে পড়লেই হল। তাই চন্দ্রিকাই এখন কাজকর্ম দেখাশোনা করে। ওর বহু এই পয়লা লেড়কাহোনেবালী। ভয়ের কারণ তো একটু আছেই, তা ছাড়া চন্দ্রিকার উদাস্ মনটাও আজকাল একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। বেহা হওয়ার বহুদিন পরে ওকে একটা বাচ্চা দিতে তৈরী হয়েছে ওর বহু। আদর আর কৃত্রিম ক্রোধে ধম্‌কে ওঠে চন্দ্রিকা—নেহি। সুভদ্রার এখন ওসব জলসা উল্‌সা দেখতে যাওয়া চলবে না। জাহ্নবী মাতার ভরা বর্ষার মত পেটের অবস্থা, এখন উজবুকের মত যেখানে সেখানে যাওয়া চলে?

সুভদ্রা এইটুকুতেই দমে যায়। আসলে চন্দ্রিকা ভয়ানক গোঁয়ার বলে কৃত্রিমতাটুকু ধরা পড়ল না ওর চোখে। মুখ বুঁজে, আটার ভুসি চালতে থাকে সে। কিন্তু জলসাটা খুব বঢ়িয়া হবে। তার নিজেরও একটা আকর্ষণ রয়েছে সেদিকে। লক্‌ড়ি ফাঁড়তে ফাঁড়তে খুব অবহেলা ভরেই আপন মনে বলে সে, অবস্থা সমঝে ব্যবস্থা হবে। নিতান্তই যদি কালকেই সুভদ্রা কাৎ না হয়ে পড়ে,

তবে না হয় ভিড় গোলমাল বাঁচিয়ে একবার ঘুরে আসা যাবে।

নারদ ঘরের মধ্যে হাত তালি দিয়ে নাচছে। লোকে দেখলে তাজ্জব বনবে তো বটেই, পাগলও মনে করবে নারদকে। ওর বাড়ী হল বিহারের সীমান্তে। আর সীমান্তের লোকেরা সাধারণত বেপরোয়া গুণ্ডা প্রকৃতির লোক হয়। নারদের লম্বা চওড়া চেহারাটা দেখেও সেই রকমই মনে হয়। বিহারীরাও ওকে সেই চোখেই দেখে। নারদ খানিকটা বিদ্রোহী আর রুক্ষ মেজাজের লোক। হাসতে সে জানে না, কথা বলে খুব কম আর আস্তে। ওর প্রতি লোকের ঘৃণা যত আছ, ভয় আছে তার চেয়ে বেশী। বিশেষ করে ওর ওই সর্পচক্ষুকে। চোখের পলক পড়ে না ওর।

কিন্তু নারদও হাসে নাচে গায় বোধ হয় আর সকলের চেয়ে একটু বেশীই। তবে সকলের সামনে নয়। ঘরের মধ্যে, ওর মেয়ে পাতিয়ার সামনে। আজ ষোল সাল মেয়েটাকে জন্ম দিয়ে বহু মরেছে। আর সাদী করেনি সে। একমাত্র মেয়েটার জন্যেই। পূর্বজন্মে রামজীর কাছে কি পাপ করেছিল সে কে জানে, তার লেড়কীটা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নিয়েছে। কোমর থেকে মাথা অবধি অপূর্ব সুগঠিত চেহারা পাতিয়ার। ষোল বছরের উচ্ছ্বল যৌবন সর্বাঙ্গে সুস্পষ্ট। একমাথা কোঁকড়ানো চুল। কিন্তু কোমরের পর থেকেই কোন পিশাচ দেবতা যেন সব চেঁছে নিয়েছে। ঠ্যাং দুটো নেমেছে ঠিক পাকানো দু'গাছি দড়ির মত। লতানো দুমড়ানো লিক্‌লিকে। মুখ দিয়ে হার-বখত নাল কাটে। নড়তে চড়তে পারে না, কথা বলতে পারে না। সারাদিন ঘরে পড়ে থাকে। বাপ এলে তার অদ্ভুত শিশুসুলভ মুখটিতে অপূর্ব হাসি ফুটে ওঠে।

কালকে জলসায় নিয়ে যাবে একথাটা অনেকবার বলবার পর একটু সমঝে পাতিয়া যখন হেসে উঠল তখন নারদও উঠল নেচে।—অর্থাৎ আমরা বাপ বেটিতে মিলে কাল খুব ফুর্তি করব। বলে ছ'মাসের বাচ্চার মত টুক্ করে পাতিয়াকে কোলে নিয়ে একটু আদর করে তাকে রোয়াকে বসিয়ে দিয়ে বালতি নিয়ে নারদ জল আনতে যায়। পাতিয়া একমুখ গড়ানো নাল নিয়ে হাঁ করে চেয়ে থাকে জলসামণ্ডটার দিকে।

নারদের মনে পড়ে, পাতিয়াকে নিয়ে নিতে চেয়েছিল এখানকার ধনী মহাজন শয়তানের রাজা ওই সাহুজী। অত্যন্ত ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সে। কথাটা

শুনে কেউ বলেছিল—সাহুজীর নাংগা ফকির দিয়ে ভিখ্ মাঙ্গা দলের ব্যবসা আছে। সেই জন্যই ও পাতিয়াকে চায়। আবার কেউ কেউ বলেছিল আসলে সাহুজীর মত বিদ্ঘুটে শয়তান পাতিয়াকে বহুর মত ঘরে নিয়ে রাখতে চায়। নারদের ইচ্ছা হয়েছিল হাতুড়ি দিয়ে বেতমিজ কমিনাটার মাথাটা টুটাফাটা করে দেয়। তার বড় আদরের, বড় বেদনার লাল ওই পাতিয়া। তার দিল দরদ সমস্ত আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওই পাতিয়াকে ঘিরে। জলসার বঢ়িয়া আয়োজন দেখে ভারী খুশি সে। নাল মোছার গামছাটা এক কাঁধে আর পাতিয়াকে এক কাঁধে নিয়ে সে যাবে কাল জলসা দেখতে। ভারী খুশি হবে পাতিয়া।

বিহারী লাইনটার পরই মাদ্রাজি লাইন।

কাঁচা হলুদ মাখা মুখে মেয়েদের আর মুখে চুরুট গোঁজা পুরুষের ভিড় এখানে। লাইনের নর্দমায় দশ বারোটি ছেলেমেয়ে সারি সারি বসেছে মলমূত্র ত্যাগ করতে আর আলোচনা চলেছে জলসার।

জোয়ানের দল নিজেদের তেলেগু ভাষায় কালকে সীতা-উদ্ধার নাটক করবে ভেবেছিল। কিন্তু জলসার আয়োজন দেখে বন্ধ করে দিয়েছে। নাটক মানে শুধু গান। মুখে রং মেখে রাম, সীতা, রাবণ ইত্যাদি সেজে যে যার ভূমিকায় খানিকটা হম্বিতম্বি করবে আর ঘুরে ঘুরে গান করবে। কিন্তু জলসার ব্যাপারেই আজ তারা মেতে উঠেছে বেশী। ওদের মধ্যে আপ্পারাওয়ের গুল্ ওড়াতে ওস্তাদির খ্যাতি আছে। জলসা সম্বন্ধে নানান্‌রকম কথা শুনতে শুনতে খুব গম্ভীর হয়ে বলে ফেলল সে যে বাবুসাহাব অর্থাৎ কর্পুর সিং কালকে তাকে জলসায় রাবণের সঙ্গে রামের যুদ্ধাখ্যানটুকু গান করতে বলেছে। আপ্পারাওয়ের বউ সরমা আবার এ সব ঝুটা ইয়ার্কি বুঝতে পারে, সইতে পারে না। সে বসে বসে বাসন মাজছিল। হঠাৎ তার ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়া নাকের প্রকাণ্ড নথ নেড়ে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে উঠল, এঃ বাবু সাহাব আর লোক পেল না!

স্বভাবতই ইয়ার-আদমিদের সামনে স্বামীত্বের অপমান বোধে রাম-রাবণের যুদ্ধের পালাটা ওদের স্বামী-স্ত্রীতেই সুরু হয়।

থামাবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অনুরূপ অবস্থা পাশের লাইনে উড়িয়াদের মধ্যেও সুরু হয়েছে।

উড়িয়া লাইনের বিশেষত্ব এখানে মেয়েমানুষ নেই। কারণ ওরা বলে, বিদেশ মুলুকে মেয়েমানুষ আনলেই নাকি খতম্।

ঝগড়া লেগেছে অর্জুনের সঙ্গে গৌরাঙ্গের। থামাবার চেষ্টা করছে জগন্নাথ। অর্জুন বলেছে ভুবনেশ্বরে যে জলোসা হয়েছিল তা এর চেয়ে ভাল—কারণ সে নিজের চোখে তা দেখে এসেছে। গৌরাঙ্গের এতে আপত্তি আছে। কারণ অর্জুনের দেশ ভুবনেশ্বর। তাই ভুবনেশ্বরের চেয়ে এ জলোসা অনেক ভাল। নইলে বাবুসাহেব আর লিবারবাবু শাদা টুপি মাথায় দিয়ে খাটতে আসিল কাঁই?

এদের [illegible] কিচিরমিচির সত্ত্বেও সামনেই বসে বহুকষ্টে কেনা শখের বস্তু হারমোনিয়মটা কোলের কাছে নিয়ে মাধব তারস্বরে গান ধরেছে—নন্দের নন্দন বক্কাকোঁ রাই। মনে তার বহু দুর্ভাবনা। দেশ থেকে চিঠি এসেছে, এ দফায় বেশী টঙ্কা না পাঠাতে পারলে মহাজনের ধার শোধ হবে না। জমি বে-হাত হতে পারে। তবু আজ জগরনাথের মন্দিরের মত জবরজং জলসামণ্ড দেখে হার-মোনিয়াম নিয়ে বসেছে সে। কিন্তু গান থেকে নিরস্ত হতে হল তাকে।

কারণ, গৌরাঙ্গ ঠাস্ করে একটা চড় কষিয়েছে অর্জুনের গালে। আর অর্জুন 'সড়া' বলে হুঙ্কার দিয়ে একটা চেলা কাঠ কুড়িয়ে নিয়েছে।

ক্রমশ অন্ধেরা ঘনিয়ে এল। আর অমনি যাদু-ই-নগরীর মত লাইনের ময়দানটা দিন মাফিক আলোয় উঠল হেসে। রাতভর কাজ হবে তা হলে আজ? জলসা সম্বন্ধে এবার সবাই আরও থোড়া বহুত সজাগ হয়ে উঠল। কারখানার মানিজার সাহাব এল মেমসাহাব আর বাবাকে (ছেলেকে) সঙ্গে নিয়ে।

হাত নেড়ে নেড়ে বুঝিয়ে দিতে লাগল লিবারবাবু আর সাহাব, মাথা নেড়ে নেড়ে 'বুলাড়ি ডাম্ গুড', 'বহুট্ আচ্ছা' প্রভৃতি বহুৎ খুসীয়ালী বাত করতে করতে হাসতে লাগল। সাহাব আর লিবারবাবুর হাসি দেখে লাইনের খানিকটা ডর তাজ্জবে ঘাবড়ানো মুখগুলোতেও দেখা দিল হাসি। সকলে তাজ্জব মানল তখন—যখন মানিজার সাহাব বাবুসাহাব কর্পূরসিংকে দেখে চিল্লিয়ে 'জোয়হিন্ড' বলে সালাম দিল। হাঁ, সাহাবকেও জয়হিন্দ বলতে হয়।

—হাঁ হাঁ আপনা কান মে শুনা হম্। বলে এ ওর কাছে বাঢ় একটা বাহাদুরি [illegible]য়ার ফিকিরে বুক ঠুকতে লাগল।

তারপর রাত্রি তার দুনিয়ার ক্লান্তি নিয়ে ঘুম হয়ে নেমে এল লাইনের বুকে। এখানে সেখানে মারীবীজের মত লাইনের আনাচে কানাচে খাটিয়া আর চাটাই ভরতি মানুষ। তবু এরই মধ্যে চলেছে বহু প্রবৃত্তির খেলা। হাসি, কান্না, গান। এমন দুর্বিষহ গুমোট আলো-বাতাসহীন পায়রার মত খোপগুলোতেও নরনারীর আদিম প্রবৃত্তির উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে তবু। অবিকল দুনিয়ার যান্ত্রিক গতির মত।

পরদিন বিহানে কাজে যাওয়ার সময় সবাই তাজ্জব। হাঁ জলসামণ্ড বটে! মণ্ডের চার তরফ ঘিরে শাদা আর গৈরিক টোপি শিরে চড়িয়ে ফৌজী কুচকাওয়াজের মত স্বেচ্ছাসেবকের দল 'ডাহিনে ঘুম্, সামনে চলো' করছে। বাবু সাহাব কপূর্র সিং, মজদুর লিডর্ বাবু রঘুনাথরাও সব বড়ে বড়ে আদমি এসেছে।

খুব ভারী জলসা হবে—হাঁ। ন জানে ক্যায়া হো রাহে, এমনি একটা সশ্রদ্ধ মুখভাবে ছেদি তার কুড়ানো লেড়কাটাকে ছ'টা পয়সা দিয়ে বলে, যা, চা উ' পি-লে। কাঁহি যানা মৎ। বলে্ কারখানায় ঢুকে পড়ল।

কুন্থি জলসামণ্ডের রংদারি আর কুচকাওয়াজ দেখতে দেখতে কারখানার গেটে দাঁড়িয়ে কোলের বাচ্চাটাকে অন্যমনস্ক ভ'ইসের মত মাই খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎ একদম লাস্ট বন্শী (ভোঁ) বেজে উঠতেই সামনেই বড় লেড়কাটার কাছে তাকে ছেড়ে দিয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ল।

শালা কুত্তাকে বাচ্চা! দাঁতে দাঁত ঘষল নারদ—বাবুসাহেবের সংগে সাহুজীকে দাঁত বের করে রঙ্গ করতে দেখে। পরমুহূর্তেই জলসার আয়োজন দেখে—চির-কালের গোমরা মুখে হেসে বলে পাশের লোককে হাঁ, ইয়ে হ্যায় জলসা!

আপ্পারাও আর সরমা' তো দাঁড়িয়েই পড়ল ফৌজী কুচকাওয়াজের রকম দেখে।

আরে বাপ্প! এর বেশী আর অর্জুনের মুখ দিয়ে বেরুল না।

খানেকা টাইমে (টিফিনে) দেখা গেল একটা যন্ত্র মুখের কাছে নিয়ে মণ্ডের ওপর থেকে একজন অচেনা আদমি চিল্লাচ্ছে—বান্, টু, থিরি, ফোর...।—আর সে কথাগুলো চতুর্গুণ জোরে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

কাঁহা কাঁহাসে বহুৎ আদমি এসেছে। প্যাঁ পোঁ করে স্বেচ্ছাসেবকের দল একটা তামার মোটা বাঁশী বাজাচ্ছে আর ঘুরে বেড়াচ্ছে ফৌজী কায়দায়।

উৎসবের উল্লাস জমাট বেঁধে উঠছে প্রতিমুহূর্তে।

কিন্তু বেলা তিনটের সময় হঠাৎ একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের মত কারখানার ভেতর সহস্র গলার একটা উত্তেজিত গর্জন ফেটে পড়ল।

আভি জল্সা সুরু হো রাহে! সেই সময় জলসামঞ্চ থেকে মোটা গম্ভীর গলায় ভেসে এল ঘোষণা। তারপর জলসার প্রাথমিক কাজ সুরু হয়। পাঁড়েজী ফুল বেলপাতা নিয়ে গান্ধীবাবার পায়ে দিয়ে প্রার্থনা মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ করে। ধূপ আর কর্পূরের পবিত্র গন্ধে ভরপুর হয়ে উঠল চারো তরফ্। করুণ কণ্ঠে গীত ওঠে—হ্যায় বাপুজী, তুঁ কঁহা চলা গ্যায়ে!......

এক ঘণ্টা যেতে না যেতেই কারখানার ভেতর থেকে কেমন একটা আক্রমণাত্মক ক্রুদ্ধ গর্জনের মত ভেসে এল।

কি ব্যাপার?

মানিজার সাহাবকে ঘেরাও করেছে কুলি কামিনের দল!

—মগর কাঁহে?

লিখা পড়ি নেই, বাত্ পুছ্ নেই, হাজারো আদমিকে বুঢ়বক বানিয়ে দিয়ে হঠাৎ মালিক লোটিশ ছেড়ে দিল, এগার শো আদমি ছাঁটাই হল। কারণ, কয়লা নেই, মালিকের আর্ডার নেই, কাম নেই। বেকার আদমি রেখে নাফা কি আছে?

পয়লা ছেদিই হাতের রুপোর ভারী মোটা কঙ্কন শুদ্ধ ঠাস করে কষালে এক ঘা সাহাবের কপালে।—আরে এ কমিনা, তোকার নাফা দেখ্তা, হাম ক্যায়া রেণ্ড বনে গা?

কার একটা খৈনির ডিবা এসে পড়ল সাহাবের লাল টুক্টুকে নাকের ডগায়।

বাইরে থেকে জলসার মিষ্টি বাদ্যধ্বনি ভেসে এল। তার সঙ্গে গান্ধী মহারাজ কি জয়ধ্বনি।

মানিজার সাহাব থোড়া কিছু বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেতমিজ কুলি কামিনদের হল্লায় ডুবে গেল তা। শেষটায় সাহাব বেশ খানিকটা জোরে হেঁকে উঠল, শুনো, হাম্ বোল্টা হ্যায়, জোয়হিণ্ড!

—তোরি জোয়হিন্ড্কে—গোঁয়ার চন্দ্রিকা একটা খিস্তি করে রুখে এল।

সেই মুহূর্তেই ঘটল পুলিশের আবির্ভাব। প্রাণ ফিরে পেল মানিজার সাহাব। থানার বড়বাবু এসে ম্যানেজারকে আগলে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, তুম্ লোক যাও, ছুট্টি হো গয়া।

কেউ কেউ কাঁচা খেউর করে বলে উঠল, সাড়ে চার বাজে তারা ছুট্টি চায় না, পাঁচটায় তাদের ছুট্টি—রোজানা যেমন হয়।

আপ্পারাওয়ের বহু সরমা হঠাৎ বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বড়বাবুর ওপর। —রেণ্ডিকে বাচ্চা, দালালি করনে আয়া?

অকস্মাৎ এ রকম একটা আঘাতে বড়বাবু টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতেই হীরালালের মেহেরারুর পায়ের মোটা বাজু শুদ্ধ ধাঁই ক'রে কষালে তার মুখে এক জবরদস্ত্ লাথ্।

জলসামঞ্চের সেই যন্ত্রটা থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—আপ্লোক চিল্লাইয়ে মৎ, আভি গান্ধীবাবাকি কহানি সুরু হো রাহে। শান্ত্ রহিয়ে আপ্লোক।

—বেয়নেট চার্জ কর্ ব্যাটারা। ককিয়ে উঠল বড়বাবু।

হুকুমমাত্র সশস্ত্র সিপাহীলোক ঝাঁপিয়ে পড়ল খোলা কিরীচ নিয়ে কুলি কামিনদের ওপর।—হট্ যাও, হট্ চলো!...

হটাতে হটাতে সবাইকে নিয়ে এল একদম লাইনকে অন্দর। তারপর চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল লাইনটাকে সশস্ত্র সিপাহীদল। লাইন ঘিরে তৈরী হল এক অচ্ছেদ্য ব্যূহ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। জলসামঞ্চের চার তরফে আলোকমালা হেসে উঠল। মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে মজদুর-লিডর বাবু রঘুনাথ রাও গান্ধীবাবার কহানি বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

সিপাহী-ব্যূহের ভেতর থেকে লাইনের মানুষগুলো কেমন বোকার মত ডর পুকে হাঁ করে চেয়ে আছে মঞ্চটার দিকে। হাঁ, বহুৎ ভারী জলসা হচ্ছে! পুরিও ভাজা হচ্ছে। ঘিউর মিঠা বাস্ এসে লাগছে ওদের নাকে।

রাত্রের অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই নিঃশব্দে একটা কালোগাড়ী এসে দাঁড়াল লাইনের সামনে। তারপর বেছে বেছে লোক ওঠানো হতে লাগল তার মধ্যে।

চন্দ্রিকার বহু প্রসব-বেদনায় এলিয়ে পড়েছে রোয়াকে। চন্দ্রিকাকে তখন

সিপাহীরা জোর করে ঠেলে তুলে দিচ্ছে গাড়িটার মধ্যে।

গান্ধীবাবার কহানি শেষ হতেই জলসামঞ্চ গীত-উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল। আলো ঝলমলে উৎসব।

লাইনের মানুষগুলো যেন কি এক বিভীষিকা দেখছে—এমনি বড় বড় ভয়ার্ত চোখে একবার জলসামঞ্চ আর একবার কালোগাড়ীটাকে দেখতে থাকে।

চন্দ্রিকা, হীরালাল, ফুলমহম্মদ, বৈজু, আপ্পারাও, হাফিজ,......সবাইকে ঠেলে ঠেলে ওঠাতে লাগল সিপাহীরা সেই গাড়ীটার মধ্যে।

নারদ টুক্ করে পাতিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে, টাট্টিখানার পেছন দিয়ে মলমূত্র মাড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। এসে উঠল একেবারে সাহুজীর মোকামে। সাহুজী চশমা চোখে দিয়ে টাকা পয়সার হিসাব কর্ষছিল। হঠাৎ চমকে তাকাতেই দেখল তিয়াকে কোলে নিয়ে নারদ এসে হাজির। নারদ পাতিয়াকে শাহুজীর সামনে রেখে দিয়ে বলে উঠল, লে লেও পাতিয়াকো।

শাহুজী আর পাতিয়া সমান বিস্ময়ে হাঁ করে চেয়ে রইল নারদের দিকে। পরমুহূর্তেই হো হো করে হেসে উঠল শাহুজী।—হাঁ হাঁ, মালুম হো গিয়া, মালুম হো গয়া। ঠিক হ্যায়!......বলে লোলুপ দৃষ্টিতে পাতিয়ার সুগঠিত ঊর্ধ্ব দেহটাকে চোখ দিয়ে গিলে খেতে লাগল সে। উগ্র লোভানিতে জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল তার শকুনের মত চোখ দুটো পাতিয়ার বুকটার দিকে চেয়ে। নারদের দম বন্ধ হয়ে এল। রক্ত বেরিয়ে আসবার উপক্রম হল চোখ ফেটে। বলল, উস্‌কো দু'বেলা পেট ভরকে খানা দেও, ব্যস্ ঔর কুছ্ নেহি।

এতক্ষণে বিস্ময় কাটিয়ে শাহুজীর চোখ দেখে পাতিয়ার মনে একটা ভীষণ সন্দেহ হয়। মুখ দিয়ে লাল আর চোখ দিয়ে জল একসঙেগ গড়িয়ে এল তার। থা বলতে পারে না। একটা জানোয়ারের বাচ্চার মত নারদের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে আঁউ আঁউ করে উঠল সে।

ছিনাটা ফেটে যাবার মত হল নারদের। কানে আঙুল দিয়ে ছুটে বেরিয়ে ল সে সেখান থেকে।

একটা আচমকা গর্জন করে আবার নিঃশব্দে মানুষ ভরতি কালো গাড়ীটা লাইনের সামনে থেকে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

জলসামঞ্চে তখন গীতবাদ্যে তুমুল হট্টগোল সুরু হয়েছে। গায়কেরা যেন

ক্ষেপে গেছে। বাব্‌ রঘ্‌নাথ্‌ রাও ঢোলক পিটছে, বাব্‌ সাহাব গান করছে, আর সবাই দোয়ারকি টেনে চলেছে—'রঘ্‌পতি রাঘব রাজারাম!...' অচেতন ক্ষ্যাপা অবস্থায় মণ্ড কাঁপিয়ে সবাই গেয়ে চলেছে।

ছোঁদির সেই কুড়ানো কালো কুত্‌কুতে ছেলেটা অন্ধকারে নারদকে চলতে দেখে বলে উঠল, হাঁ—বহ্‌ত্‌ ভারী জলসা হোতা হ্যায়! বঢ়িয়া জলসা!...

গন্তব্য

ঝোড়ো কাকের মত স্টিমার থেকে হুমড়ি খেয়ে এসে ডাঙায় পড়ল মানুষগুলো। এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়ল বাক্স বিছানা টুকিটাকি নানান্ লটবহর। হৈ চৈ লেগে গেল একটা ভীষণ।

মানুষগুলো যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাতারাতি পাড়ি জমিয়েছে শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে। এমনি একটা ব্যস্ত ত্রাসের ভাব। আলুথালু ময়লা জামাকাপড়। উস্কো খুস্কো চুল। আর শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেরই একটা রাত জাগা রুগ্ন ক্লান্ত ভাব। বসে যাওয়া চোখগুলো যেন পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে ফেলেছে এমনিই একটা অসহায় দৃষ্টি, বাঁচবার জন্য শেষ চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগার মত।

বর্ষার প্রথম ধাক্কায় মেতে ওঠা পদ্মা উল্লাসে গান করে চলেছে গোঁ গোঁ করে। ঝোড়ো হাওয়ার তরংগে তরংগায়িত সে সুর। মাটি খেয়ে নেওয়ার একটা উগ্র ক্ষুধায় বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে পাড়ে।

একটা বোঁচকার উপর দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে প্রসন্ন দলের লোকদের ডাকতে লাগল, ওহে ও অনন্ত, ও পরির মা, এই যে এদিকে এস। আরে ওই নিকুঞ্জ, ওদিকে কুনঠাঁই যাচ্ছিস? এদিকে, হ্যাঁ। আর বাঁকার বউয়ের আঁচলটা ধরে রাখিস্ টগার। পরেশ, বুড়ো গোবিন্দ কামারকে হাত ধরে রাখিস্ তুই—ও আবার দেখতে পায় না।'

অনেক হাঁকাহাঁকির পর প্রসন্নদের দলটা বোলতার চাকের মত আলাদা হয়ে গেল যাত্রীর ভিড় থেকে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল প্রসন্ন।

এরা সব পরিচিত আশেপাশের গাঁয়ের লোক। একসঙ্গে ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়েছে। প্রসন্ন এ দলের নেতা। অর্থাৎ সে-ই সবাইকে একজোট করে রাখে, নজর রাখে সকলের উপর। কখন কি করতে হবে, কোন্ দিকে যেতে হবে—হেঁকে ডেকে প্রসন্নই সে নির্দেশ দেয়।

—'ওহে ও প্রসন্ন, এবার কি করতে হবে?', বুড়ো কামার জিজ্ঞেস করল।

—'চল এবার, যে যার জিনিসপত্তর গ্ৰছিয়ে নিয়ে চল। রেলগাড়ীতে উঠতে হবে এবার।

ছোট থেকে বড়, সকলেই কিছু না কিছু হাতে বগলে নিয়ে প্রস্তুত। প্রসন্নর হাঁক পড়তেই তাড়া খাওয়া গরুর পালের মত ছুটতে আরম্ভ করল সব। এসব আগে থেকেই বলা কওয়া আছে। যে ঢিলে মারবে পেছিয়ে পড়বে, তবে সে গেল। জায়গা তো পাবেই না, হারিয়ে যাওয়াও সম্ভব।

মুশকিলে পড়ল বাঁকার বউ, তার সঙ্গে প্রসন্নর মেয়ে টগরি আর বুড়ো কামার গোবিন্দ।

বাঁকার বউয়ের পেটে প্রায় দশমাসের শত্রু, ভরা ভরতি পেট। রাখ্ ঢাক নেই। পেট বেড়েছে যেন জালার মত, দাঁড়িয়ে পায়ের পাতা দেখতে পায়না আজ দু'তিন মাস। কিন্তু জার তার পেটে। লোকে তাই বলে কয় সন্দেহ করে। ঘেন্না করে লোকে। আজ প্রায় ন' দশ মাস বাঁকা মরেছে—অপঘাতে, কালনাগিনীর দংশনে। নিকুঞ্জর মা-র নাকি হিসাব আঙুলের কড়ায়। এখন জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। গত বছরের আশ্বিনের মাঝামাঝি মা-কালীর গলা থেকে নাগিনী নেমে এসে পরানটা নিয়ে গেল বাঁকার, আর দর্শন দিল না। বাঁকা গেল, বউয়ের আরম্ভ হল ফুসুর ফুসুর গুজুর গুজুর এর তার সঙ্গে। মানো না মানো, এই ভগমানের দেওয়া চোখ দিয়ে সে সব দেখেছে। তার মাস খানেক পরেই তো মাগী পেটে করে নিয়ে এল জার, কোত্থেকে তা কে জানে! বলে নিকুঞ্জর মা ঠোঁট বাঁকায়।

প্রসন্ন আধাআধি বিশ্বাস করে কথাটা। কিন্তু বিপদের সময় মানুষকে দেখতে হয়। বিশেষ করে আবার পোয়াতি মেয়েমানুষ। তাই নিজের মেয়ে টগরিকে সে রেখে দিয়েছে বাঁকার বউয়ের পাশাপাশি।

বুড়ো কামার গোবিন্দ কানা। পরেশ আছে তার পাশে। তবু নতুন পথ ঘাট। তাতে আবার তাড়া আছে। আছে গোলমাল। বগলে কাঁথা আর হাতে বহুদিনের সাবেকী হ্যারিকেন।

—এই, দাঁড়াও দাঁড়াও, নামাও সব গাট্টি বোঁচকা, দেখি কি আছে?

প্রসন্নের দলটা থমকে দাঁড়াল মিলিটারি পোষাক পরা এক দল লোকের সামনে। তাদের সঙ্গে ছিল আরও কয়েকজন সাদা পোষাকের বাবু।

—কিছুই নাই ভাই। প্রসন্ন হাত জোড় করে বলল, আমরা গরীব মানুষ,

আমাদের আর কি থাকবে। তাড়াতাড়ি যেতে দিন—নইলে আবার গাড়ীতে জায়গা পাব না।

কিন্তু তা হল না। ন্যাশনাল গার্ডের আর কাস্টম্‌স্‌ অফিসারের দল ঝ‍ুঁকে পড়ল বাক্স বিছানাগ‍ুলোর উপর। খ‍ুলে উলটে পালটে দেখে ছেড়ে দিল। কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল নিকুঞ্জর মা। দ‍ু' ভরি সোনা পাওয়া গেছে তার ছোট টিনের স‍ুটকেশটায়।

কেঁদে চেঁচিয়ে একাকার কাণ্ড করল নিকুঞ্জর মা। তবে গার্ডের লোকটা ভাল ছিল। ছেড়ে দিল সে।

হ‍ুটপাট করে এসে সবাই যখন গাড়ী ধরল তখন আর তিলধারণের জায়গা নেই। যেখানেই যায়, জায়গা নেই। সকলেই পাশের কামরা দেখিয়ে দেয়।

ফার্স্ট ক্লাসের একজন খালি গায়ে পৈতাধারী নাদ‍ুস-ন‍ুদ‍ুস আরাম-করে বসা যাত্রী বললেন প্রসন্নকে, জায়গা যখন নেই, রাতটা কাটিয়ে কালকে চিটাগাং মেইলে চলে যেওনা বাপ‍ু।

বহ‍ুকষ্টে প্রসন্ন নিজেকে সামলে নিল একটা কট‍ু কথা বলতে গিয়ে। আরও খানিকটা ঘ‍ুরে একটা কামরার উপর ঝোঁক পড়ে গেল প্রসন্নর।

—'ওঠ এখানে, ওঠ সব।' হেঁকে উঠল সে।

ভেতরের যাত্রীদের চাপ দেওয়া দরজাটা ঠেলে হ‍ুড়ম‍ুড় করে উঠতে আরম্ভ করল সব সেই কামরাটায়।

—জায়গা নেই, জায়গা নেই! চেঁচিয়ে উঠল গাড়ীর মধ্যেকার যাত্রীরা।

আর জায়গা নেই! এ বাঁধ-ভাঙা বন্যা র‍ুখবে কে? প্রসন্ন ঠেলে উঠিয়ে দিতে লাগল সবাইকে। নিকুঞ্জর মা, কামার ব‍ুড়ো, পরেশ, অনন্ত, পরির মা, ম‍ুক্ত...সবাইকে। কিন্তু টগরি আর বাঁকার বউ কোথায় গেল? এক সোমত্ত মেয়ে আর এক পোয়াতি বউ?

ফিরে দেখে খানিকটা পিছনে বসে পড়েছে বাঁকার বউ, তার সংগে টগরি। অনিশ্চিত আশঙ্কায় কেঁপে উঠল প্রসন্নর ব‍ুকটা। পোড়া কপাল, বউটা এখানেই বিয়োতে বসল নাকি?

সে যাবার উদ্যোগ করতেই আবার উঠে দাঁড়াল ওরা। এগিয়ে আসতে আরম্ভ করল আস্তে আস্তে। জয় মা কালী! মনে মনে মা-কে ডেকে প্রকাশ্যে খিঁচিয়ে

উঠল, না এলেই হত, এমন যখন অবস্থা।

অত্যন্ত জড়সড় হয়ে পড়ল বাঁকার বউ কথাটা শুনে। ঘোমটার আড়ালে চোখের জলের ঢল নেমে এল যন্ত্রণায় আর অপমানে।

জবাব দিল টগরি, তবে তখন এনেছিলেই বা কেন? পোয়াতি কুকুরেরও ক্ষমতা নাই, তোমাদের সংগে ছোটে।

ফুট কাটল নিকুঞ্জর মা, পেটে ধরা পাপ, কষ্ট হবে বৈকি। নেও এখন উঠে এসো।

নিকুঞ্জর বউ হাসল মুখ টিপে। বিরক্ত হয়ে আস্তে বলল নিকুঞ্জ, প্রসন্ন কাকার যত বাজে বোঝা বয়ে বেড়ানো অভ্যাস।

পরির বাচাল বিধবা যুবতী বউদি মুক্ত বলে উঠল, পেট না ঢাক। মানুষের না অসুরের ছাও আছে পেটে?

—তোমরাই অসুরের ছাও পেটে ধর। বয়স সম্পর্কে জ্ঞান না করেই বলে উঠল টগরি।

ধমক দিল প্রসন্ন, থাক্ আর চোপা করিস্‌নে, গাড়ীতে ওঠ্।

উঠলে কি হবে। অন্ধকূপ না হোক, আলো জ্বালানো, দম আটকানো কূপ বটে কামরাটা। মানুষে মালে, ভ্যাপসা গরমে আর একটা বিশ্রী প্যাচপ্যাচানিতে, দুর্গন্ধে আর কলরবে নরকের একটা জীবন্ত দৃশ্য যেন অভিনীত হচ্ছে।

প্রসন্নর দলের কারুরই বসবার জায়গা নেই। একমাত্র বুড়ো কামার দু' বেঞ্চির মাঝে কোন রকমে বসে পড়েছে জোর করে। ভাবটা, আগে বসি—তারপর যা খুশি কর।

ইতিমধ্যে ঝগড়া লেগে গেছে নিকুঞ্জর মা-র সংগে অন্য একজন সমবয়সী মহিলার। তার সংগে যোগ দিয়েছে পরির মা আর পরির বিধবা বউদি মুক্ত।

প্রসন্নদের দলটাকে আপদের গুষ্ঠি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাই এই ঝগড়া। কথাটা গায়ে লেগেছে প্রসন্নরও। এমনকি টগরিও জুৎ করে বসা এই যাত্রীদের কথায় জ্বলছিল।

তাদের বিপক্ষে ওদিকে আবার ফোড়ন কাটছিল সিগারেট মুখে একটা চালিয়াৎ গোছের ছোকরা। তার সংগে যোগ দিয়েছিল শহুরে ফ্যাস্যানের জামাকাপড়-পরা গলায় রুমাল বাঁধা একটি চটকদার মেয়ে। মাঝে মাঝে তার কথায়, কথার মধ্যে

দু'চারটে ইংরেজী শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। যে জন্য শেষটায় টগরি প্রায় হিংস্র হয়ে আক্রমণ করল মেয়েটাকে।

—কি অত ইংরাজি ফলাচ্ছেন আপনি। একটু মুখ সামলে কথা বলবেন।

শাট্ আপ্! অপর মেয়েটির কাছ থেকে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদেশী কথার ধমকানিটা এলো যে, কামরার সমস্ত মানুষগুলো একযোগে চমকে উঠে ফিরে তাকালো। সব চেয়ে বেশি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল কামরার বুড়োরা। দৃশ্যটা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু টগরির মধ্যে আছে একটা বেয়াড়া গ্রাম্য ধার। সে-ও রুষে ফুঁসে গর্জে ওঠে। ফলে নাটক জমে উঠল।

—আগে এসে জায়গা দখল করেছেন বলে বুঝি আর সব মানুষ আপদ হয়ে গেল? টগরি চুপ করে থাকতে পারল না।—লজ্জা করে না আপনাদের এভাবে ঝগড়া করতে?

ধমক দিল প্রসন্ন।

ইতিমধ্যে গাড়ী চলতে শুরু করেছে।

রাজবাড়ী স্টেশন পেরোতেই বুড়ো কামার হেঁকে উঠল, ওহে প্রসন্ন, পাকিস্তান ছাড়িয়েছি তো?

কথা শুনে হাসির ধুম্ পড়ে গেল একটা। জবাব দিল নিকুঞ্জ : এখনও অনেক দেরি। তুমি এখন ঘুমুতে পার কামার।

প্রসন্নর একটা কীর্তি প্রথমে চোখে পড়ল বাঁকার বউয়ের। সে টগরি ঠাকুর-ঝিকে গা টিপে কথাটা বলল ফিসফিসিয়ে। টগরি দেখল—সত্যি, সকলের দিক থেকে আড়াল করা মুখটা প্রসন্নর চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

টগরির মনে পড়ল; ভোর রাত্রে বাড়ী থেকে বেরুবার সময় দু' চোখ ভরা জল নিয়ে বলেছিল তার বাবা, আমাদের অনেক পুরুষের ভিটা এটা টগরি, তোর মরা মায়ের সব চিহ্ন আটকা রইল ভিটার সংগে।

কেঁদেছিল সকলেই। ঘরে ঘরে বুকভরা একটা আর্তনাদে রাত্রি ভোরের অন্ধকার যেন আরও খানিকটা জমাট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পথচলার লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় সকলের কান্না দূর হয়ে গিয়েছিল।

গাড়ীতে ওঠার পর সকলের মনেই পড়েছে একটা উৎকণ্ঠার ছায়া। উদ্বেগে

সন্দেহে দ্বিধায় মানুষগুলো ভিড়ের ভিতরে কেমন অস্থিরতা অনুভব করছে। যে দেশে তারা চলেছে, কি রকম সম্বর্ধনা সেখানে অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্য কে জানে। কে জানে কোথায় পাওয়া যাবে আশ্রয়। কোথায় গিয়ে খুঁজে নিতে হবে রুজি-রোজগারের বন্দোবস্ত।

কান্না পেল বাঁকার বউয়ের আর টগরির। হাতের চেটো দিয়ে চোখ মুছল গোবিন্দ কামার। নাকি কান্নার সুরে অভিশাপ দিতে লাগল নিকুঞ্জর মা—নাম গোত্রহীন শত্রুদের—যারা তাকে ভিটা ছাড়া করিয়েছে, দেশ ছাড়া করিয়েছে।

আত্মীয় কুটুম যাদের আছে হিন্দুস্থানে, এ গাড়ীর মধ্যে অভিজাত সম্মানটুকু দখল করেছে তারাই। সকলের প্রতি একটা কৃপার আভাস তাদের চোখে।

ইতিমধ্যে সিগারেট মুখে সেই চালিয়াৎ ছোকরাটি উঠে পড়ে বসবার জায়গা করে দিয়েছে টগরি আর বাঁকার বউকে। রীতিমত সশ্রদ্ধ আর নরম গলায় অনুরোধ জানিয়েছে। সে সম্মান রক্ষা করছে টগরিও। ছোকরা ভদ্রলোকটিকে ওর মধ্যেই কষ্টেসৃষ্টে পাশে বসিয়ে নিয়েছে সে।

দলের লোক হলেও ব্যাপারটাতে চোখ টাটিয়েছে মুক্তর। সে কটকটে চোখে ছোকরাটির সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে টগরির বসার ভঙ্গিটা লক্ষ্য করতে লাগল। অসন্তুষ্ট হয়েছে নিকুঞ্জের মা-ও।

মালের উপর মানুষ, মানুষের উপর মাল, ঘামে গরমে দুর্গন্ধে বোঝাই গাড়ীটা হু হু করে ছুটে চলেছে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন করে। জোলো হাওয়া কয়লার গুঁড়ো নিয়ে ঝাপটা খেয়ে এসে পড়তে লাগল যাত্রীদের চোখে মুখে।

বাঁকার বউ ঢলে পড়েছে টগরির উপর। কামার বুড়ো আচমকা এক একটা নিঃশ্বাস ফেলছে আর বক্ বক্ করছে ঘুমঘোরে বকুনির মত। আর এ দলের নেতা প্রসন্ন সম্পূর্ণ আলাদা একটা মানুষের মত দল ছেড়ে হাঁ করে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। স্বপ্নাচ্ছন্ন, বিহ্বল!

শেষ রাত্রের দিকে কামরাটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল মানুষগুলো। সমস্ত দুশ্চিন্তা দুর্ভোগের ক্লান্তি ভরা চোখের পাতাগুলো ভারি হয়ে এসেছিল।

হঠাৎ আচমকা হট্টগোল শুনে প্রাণ ফিরে পেল গাড়ীটা।

দর্শনা।

পাকিস্তানের সীমান্ত স্টেশন।

আবার বোচ্‌কা বুচকি খোলার পালা। কয়েকজন মিলিটারি আর সাদা পোশাকপরা লোক উঠে এল।

সকলের আগে নিকুঞ্জর মা তার টিনের সুটকেশটা এগিয়ে দিল। দেখ বাপু, কিছুই নেই।

থাকবে কি করে। যে দু' ভরি সোনা গোয়ালন্দে তার প্রাণ উড়িয়ে নিয়েছিল, সেটুকু মুখে পুরে রেখেছে সে। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল কামরাটা। বেআইনি মূল্যবান বস্তু কিছু পাওয়া গেল না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দর্শনা থেকে গাড়ী ছাড়ল।

—যদি রাখেন হরি, তবে মারে কে। এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন।

আর একজন বললেন, আপনার ওই তেঁতুলের হাঁড়িটাতেই বুঝি হরিঠাকুর আছেন?

—আজ্ঞে হাঁ, প্রায় দশহাজার টাকার সোনা। ফেলে তো আসতে পারি না। ভদ্রলোক গান ধরলেন একটা।

হাসির রোল পড়ল।

—আর ভয় নাই তো? বলে নিকুঞ্জর মা মুখ থেকে বের করল তার প্রাণ দু'ভরি সোনা।

ক্রমশ আকাশ ফরসা হয়ে এল।

গাড়ী দাঁড়াল শেষবারের জন্য শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে।

কলকাতা।

বাক্স বিছানা লটবহর ধুপধাপ করে পড়তে আরম্ভ করল প্ল্যাটফর্মের উপর।

—ওরে নিকুঞ্জ, দেখিস জিনিসপত্তর খোয়া না যায়। প্রসন্ন হাঁক দিল।—পরেশ, কামারকে ধর। হুটপাট করে এখন নামবার চেষ্টা করিসনে টগরি, বোস্, ধীরে সুস্থে নামব।

—তবে আমরা এসে পড়েছি? কামার জিজ্ঞেস করল।

ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ডুবে গেল সে কথা।

পরির মা ল্যাংচাতে আরম্ভ করেছে। কার একটা ভারি ট্রাঙ্ক তার পায়ের উপর পড়ে গিয়ে থেৎলে গেছে পায়ের পাতা। আন্দাজে সে ধরে নিয়েছে, ট্রাঙ্কটা

মস্তুর।

পরেশের পিসীর গা ঘুলিয়ে উঠল। সারারাত যে গুমসনি আর ঝাঁকানিতে কেটেছে। একটা ওয়াক তুলে বলল সে, পরেশরে, আমাকে একটু বমি করবার জায়গায় নিয়ে চল বাবা।

—এখন একটু চেপে রাখ, নামতে দাও আগে। বিরক্ত হয়ে বলল পরেশ।

তা বললে কি হয়! যে ঝাঁকানি গেছে সারাটি রাত। অসুরের মত গাড়ী, সারাটা রাত দুলিয়েছে। তার মধ্যে কোথায় কাঁচা মাটি আর গাঙের জলের সোঁদা গন্ধ, আর কোথায় টিন তেল কালি ধোঁয়ার বিদ্ঘুটে উৎকট নাড়ি ঘুলিয়ে ওঠা গন্ধ। আর একবার ওয়াক তুলে সেখানেই বসে পড়ল পরেশের পিশি। পরেশ মুখ খিঁচিয়ে একবার বুড়ির মরণ কামনা করল। বেশি কিছু বলাও মুশ্কিল। এ বিদেশে বিভুঁয়ে পিশির সম্বলের উপর নির্ভর করেই তাকে থাকতে হবে। কামারকে অনন্তর কাছে রেখে পিশির দিকে এগুল সে।

মস্তুকে দেখা গেল মাথায়-ট্রাঙ্ক একটা কুলির পিছনে ছুটতে আর চেঁচাতে।—দ্যাখো তো ড্যাকরা মিন্ষির কাণ্ড, ব্যাটা ট্রাঙ্কটা আমার কেন নিয়ে যাচ্ছে? আরে ওই অজাত!...

কুলিটা এবার মেজাজ দেখিয়ে ট্রাঙ্কটা প্রায় আছড়ে ফেলল মেঝের উপর।—লেও বাবা, লেও। বুঝতে পারল এখানে হবে না কিছু। নতুন খদ্দেরের সন্ধানে ছুটল সে।

প্রসন্নদের দলটা গেটের দিকে এগুতে আরম্ভ করল।

গেটের কাছে বিরাট জগদ্দল পাথরের মত মানুষ আর লটবহর জমাট হয়ে উঠেছে। ক্রমশ তার পিছনে জমাট বেঁধে উঠতে লাগল মালবাহী যাত্রীদের একটা ঠাসা লম্বা মিছিল।

বাঁকার বউয়ের নাকের পাশে একটা যন্ত্রণার রেখা পড়েছে। হাঁপ লাগছে তার, অসহ্য ভারি লাগছে পা দুটো। টগরি সাবধানী সান্ত্রীর মত আগলে চলেছে তাকে ঠেলা-ধাক্কার হাত থেকে।

গেটের বাইরে এসেই যতখানি সম্ভব জায়গা জুড়ে যে যার সংসার পেতে ফেলতে ব্যস্ত হল।

—আপনাদের আত্মীয়স্বজন নেই বুঝি কলকাতায়? টগরিকে হঠাৎ জিজ্ঞেস

করল সেই ছোকরাটি।

নিজেদের লোকের মত লাগল টগরির ছেলেটিকে। বলল, না। আপনাদের?

—আমাদেরও কেউ নেই। খুশির আভাস দেখা গেল ছোকরাটির রাতজাগা গর্তে বসা চোখ দুটোতে।

কলকাতার লোকেরা অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ভ্রূ কুঁচকে সম্বর্ধনা জানাল পূবের এই আশ্রয়প্রার্থীদের। দু'একজন জঞ্জাল বলল, বাঙাল বলতে শোনা গেল কাউকে কাউকে। বাজারের দর চড়বে এদের জন্য—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে গেল সবাই।

সতর দিন পর।

শিয়ালদা স্টেশনের যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটুকুতে পা ফেলবার স্থান নেই আর কোথাও। আরও লোক এসেছে, সংসার পেতেছে আরও অনেকগুলো পরিবার। শিশুদের মলমূত্র পরিত্যাগ থেকে শুরু করে সবই চলেছে। মানুষে মালে দুর্গন্ধে, মলমূত্রে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানান জঞ্জালে নরক গুলজার।

—দুইডা পয়সা দেন বাবু। কিছুদিন থেকে সকালবেলা ওই একই কণ্ঠস্বর শোনা যায়, আপনাগো আশায়ই পাকিস্তান ছেড়ে এসেছি, কিছু দেন হিন্দু বাবুরা।

আর প্রসন্ন কানে আঙুল দেয়, মাথার চুলগুলোকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য টানা হেঁচড়া করতে থাকে। চারিপাশের লোকজনকে বিস্মিত করে দিয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মোছে।

ওই ভিখিরির গলার স্বরটা যে বুড়ো গোবিন্দ কামারের। পুঁজি বলতে তার কিছু ছিল না। সামান্য একটু জমির উপর ভরসা করে নিজের ভিটেয় পড়েছিল সে। কিন্তু এখানে, হিন্দুস্থানের এ রাজধানীতে এ ছাড়া তার অন্য গতি বাতলে দিতে পারেনি কেউ।

পারেনি প্রসন্ন। বুক ফেটে গেছে, চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে। তবু পারেনি একবারও বলতে তার গাঁয়ের কামারকে, 'কামার তুমি ভিক্ষে কোরো না।' তার নিজের তো কিছু নেই। সে ছিল সামান্য একটা দোকানের গোমস্তা। এই নিকুঞ্জ জেলা শহরের একটা প্রেসে কাজ করত। পরেশ ছিল এক ডাক্তারের কম্পাউন্ডার। কেউ তারা ভরসা করে বলতে পারেনি কিছু কামারকে।

পরির মার ঘায়ে পচ্ ধরার অবস্থা। পরেশের পিশি সেই থেকে ভূমিশায়িনী। রুক্ষ চুলে, রুক্ষ চেহারায় টগরিকে দেখতে হয়েছে বিধবার মত।

একটা গভীর শঙ্কা ভয় ভাবনা ছায়াপাত করেছে বাঁকার বউয়ের চোখে। মুহূর্ত গুণছে সে পেটের উপর হাত রেখে। সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু এমন একটা জায়গাও তো চোখে পড়ে না, যেখানে সে নিশ্চিন্তে জন্ম দিতে পারে তার সন্তানকে। একটুখানি আড়াল, একটু নিরাপদ একটা জায়গা।

সে ভয় প্রসন্নরও আছে। আছে বোধহয় আরও অনেকের। সকলেই অত্যন্ত বিব্রত হয়ে যায় বাঁকার বউয়ের দিকে চেয়ে। চিন্তিত হয়ে ওঠে সকলেই। নিকুঞ্জর মা বলে 'পাপের পেট', কিন্তু মেয়েমানুষ বলেই বোধহয় গায়ে তার কাঁটা দিয়ে ওঠে। হায় পোড়া কপাল, মাগী বিয়োবে কোথায় এ মেলা বাজারের মধ্যে?

আর বলতে গেলে সব মানুষগুলোই রাত্রিদিন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হাঁচে। জ্বরো গলায় গোঙায়। রুক্ষ নোংরা রোগীদের ভিড় বলে মনে হয়।

কলকাতার লোকেরা চমকে উঠে। চার বছর আগেকার কলকাতাকে মনে পড়ে যায় পূবের এই আশ্রয়প্রার্থীদের দেখে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের ভিখারীদের কথা।

প্রত্যহ ভোরবেলা পরেশ নিকুঞ্জ অনন্ত আর সেই ছোকরাটি যায় কলকাতার ভিতরে রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে একটা বাড়ীর জন্য। আর প্রত্যহ ব্যর্থতায় পরিশ্রমে ঘৃণার জ্বালায় স্টেসনের বাঁধানো রোয়াকের মাটিতে গা এলিয়ে দেয় ফিরে এসে। কলকাতায় আর একটা কুকুরেরও নাকি থাকবার জায়গা নেই।

কিন্তু আজ সতরদিন পর ওরা ফিরে এসে বলল—চল, বাড়ী পেয়েছি।

সত্যি? একটা সাড়া পড়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠল প্রসন্ন। গা ঝাড়া দিয়ে উঠল পরেশের পিশি। ভগবানকে ডাকল নিকুঞ্জর মা। পরির মা খোঁড়া পায়ে উঠে দাঁড়াল।

বাঁকার বউয়ের চোখে জল এল! হাসি দেখা দিল তার শুকনো ঠোঁটে। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল টগরি! বলল, পোড়াকপালি তোর পয় আছে, ভাগ্যিমন্ত হবে তোর ছেলে।

প্রসন্নদের দলটা উঠল আবার লটবহর নিয়ে।

টগরির পাশে এসে দাঁড়াল সেই মেয়েটি, ট্রেনের সেই কুঁদুলে জায়গাদখল-কারিণী। মিনতি করল সে, আপনাদের সঙ্গে আমাদের নেবেন। আমি, মা,

বাবা আর একটা ছোট ভাই, আর কেউ নেই।'

নিশ্চয়ই!

টগরি হাত ধরল তার।

অপ্রসন্ন হল প্রসন্ন টগরির এ সম্মতিতে। মুক্ত বলল, মেয়েটার ঢং সবতাতেই। নিকুঞ্জর মা বলেই ফেলল, হ্যাঁ, আরো কাঁড়িখানেক জোগাড় কর।

স্টেশন এলাকা ছেড়ে প্রসন্নদের দলটা চলল। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের গৃহস্থালী কাঁধে-মাথায় এক দীর্ঘ মিছিলের মত চলেছে দলটা।

রাস্তার লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই মিছিল।

মানুষগুলো এদিক ছাড়া কি আর দেখতে পারে না? বাঁকার বউ সংকুচিত হয়, আড়াল করে রাখে নিজেকে। কলকাতার সমস্ত লোকগুলো যেন একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার দিকে। মাগো, কি বেহায়া!

এ মিছিল দেখে ট্রামের স্পীড্ বেড়ে গেল। বাস অনেকটা দূর দিয়ে ছুটে গেল। যাত্রী হিসাবে এ মিছিলকে এড়িয়ে না গিয়ে উপায় নেই তাদের।

আগে আগে চলেছে পরেশ, নিকুঞ্জ, অনন্ত আর সেই ছোকরাটি।

কলকাতার মধ্যে ঢুকে একটা নতুন সংশয় এল প্রসন্নর মনে। তার মনে পড়ল টগরির জন্য কাপড় আনতে গিয়ে সেদিনের সেই ব্যাপারটা। একটি মাড়োয়ারীর দোকানে ঢুকেছিল সে কাপড় কিনতে। দু'চার কথার পর হঠাৎ মাড়োয়ারীটি হেসে জিজ্ঞেস করেছিল তাকে ঃ তুমি বুঝি বাঙাল আছো মশায়?

আর তাই শুনে পাশের কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক এমন হো হো করে হেসে উঠেছিলেন যে প্রসন্নকেও ছলছল চোখে হাসিচ্ছলে দাঁত বার করতে হয়েছিল একটু।

সংশয় এল তার মনে। কলকাতায় কি সেই সব ভদ্রলোকদের পাশেই থাকতে হবে নাকি তাদের?

অবশেষে দলটা এসে থামল অনেক পথঘাট পেরিয়ে বিরাট বড় রাজপ্রাসাদের মত একটা বাড়ীর সামনে। নিস্তব্ধ নির্জন বাড়ীটা। যেন ভুতুড়ে বাড়ী।

—এই বাড়ী? প্রসন্ন থম্‌কে গেল।

—হ্যাঁ, মরতে তো পারব না। জবাব দিল নিকুঞ্জ। খালি পড়ে আছে এতবড় বাড়ীটা।

প্রসন্নর দ্বিধাচ্ছন্ন চোখ পড়ল বাঁকার বউয়ের উপর। নেতিয়ে পড়ছে বউটা, যন্ত্রণায় কেমন কালো হয়ে উঠেছে মুখটা। সমস্ত দলটাই অসহ্য ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে।

আঁতকে উঠল নিকুঞ্জর মা বাঁকার বউয়ের দিকে চেয়ে। টগরি চেঁচিয়ে উঠল, কি, ইয়ার্কি করতে এসেছ নাকি সব? চল তো চল।

বাঁকার বউকে নিয়ে এগুল সে। সঙ্গে প্রসন্নও। তারপরে সমস্ত দলটাই।

হঠাৎ বাড়ীটার দরজায় দেখা দিল লাঠি হাতে এক বিরাট চেহারার দারোয়ান—ক্যায়া মাংতা? হিঁয়া ভিখ্‌উখ্‌ নেহি মিলতা।

সকলে হেসে উঠল লোকটার কথায়। নিকুঞ্জর মা বলল, গাড়ল কোথাকার!

পরেশ বলল, ভিক্ষে করতে আসিনি, বাস করতে এসেছি।

—ক্যায়া? হাতের লাঠিটা বারকয়েক বন্‌ বন্‌ করে ঘুরিয়ে দিল দারোয়ানটা। কিন্তু থেমে পড়ল নিশ্চল মেয়ে পুরুষগুলোর মুখের দিকে চেয়ে। কেমন যেন ভয় করতে লাগল তার এই দলটাকে। পথ ছেড়ে দিয়ে বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড ভুতুড়ে বাড়ীটা এতগুলো মানুষের কোলাহলে যেন প্রাণ ফিরে পেল। জেগে উঠল রাক্ষুসে মায়াপুরী এক লহমায়। প্রতিধ্বনির সাড়া পড়ল খিলানে খিলানে। পায়রাগুলো ডেকে উঠল বক বকম্‌ ক'রে।

অপেক্ষাকৃত একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরে টগরি শুইয়ে দিল বাঁকার বউকে। নিকুঞ্জর মা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল সেই ঘরে। মুখ বিকৃত করে বলল, কই লো মুক্ত!—জাঁকিয়ে বসল সে বাঁকার বউয়ের পাশে।

মুক্ত তার ট্রাঙ্ক খুলে বার করল এক গাদা পুরনো কাপড়, আর ছোট্ট লাল টুকটুকে একটি জামা।

অসুরের ছাওয়ের জামা-ই বটে! বলে মুক্ত হেসে ছুঁড়ে দিল জামাটা বাঁকার বউয়ের গায়ে। বলল, নে, ছিল। সেই কবেকার! পেটের আমার পেত্থম আর শেষ শত্তুর। কিন্তু রইল না। বলতে বলতে মুক্তর চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল।

আরও নিশ্চিন্তে এলিয়ে পড়ল বাঁকার বউ। ব্যথায় নীল ঠোঁটে হাসি লেগে রয়েছে তার একটু।

—নে বাপু, আর ভোগাস্‌নি। খিঁচিয়ে উঠল নিকুঞ্জর মা। আল্‌তো করে একটু হাত বুলিয়ে দিল আদর করে। চোখের কোণে টলমল করে কয়েক ফোঁটা জল। বলল, মায়ের নাম নে। কি করবি, কপালের ভোগান্তি তো কেউ রুখতে পারে না!

মুক্ত বলল, যা টগরি, বাইরে যা। তোর বাবাকে ছটফট করতে বারণ কর। বলে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

প্রকাণ্ড বাড়ীটার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে বিরাট দলটা। সকলেই ব্যস্ত, কিন্তু কথা বলছে আস্তে। উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে আছে সব প্রসূতির ঘরের দিকে।

এই সময়ে আবার একটা হট্টগোল উঠল। অনেকগুলো ভারি বুটের শব্দ কাঁপিয়ে তুলল বাড়ীটা। সশস্ত্র পুলিসের একটা দল হলঘরে এসে ঢুকল।

প্রসূতির ঘরে শিশুর কান্না শোনা গেল। যে প্রাসাদের ভূমিতে জন্ম নিয়েছে রাজারাজড়ার ছেলেরা, বিনা দ্বিধায় বাঁকার বউ সেখানে তার সন্তানের জন্ম দিল।

নিকুঞ্জর মা দরজা খুলে একগাল হেসে বলল, ছেলেটার মুখে বাঁকার মুখ একেবারে বসানো।

সত্যি? প্রথানুযায়ী কে যেন উলু দিয়ে উঠল।

—উরে বাবারে। কে যেন আর্তনাদ করে উঠল প্রায় সংগে সংগে।

সেই সঙেগ একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল ঃ নিকালো বাহার।

বন্দুকধারী পুলিশেরা এসেছে থানা থেকে—এ বাউণ্ডেলে ঘরছাড়া ভিটেছাড়া বদমাস্‌গুলোকে তাড়িয়ে দিতে।

—এমনিতেও মরতে আছি, না হয় মরব। কঠিন গলায় বলল নিকুঞ্জ।

—তবু আমরা এ বাড়ী ছাড়ব না। যাব না পথে ঘাটে মরতে। বলল প্রসন্ন। এগিয়ে চলল সে হলঘরের দিকে। পিছনে চলল পরেশ, নিকুঞ্জ, অনন্ত, সেই ছোকরাটি। টগরিও চলেছে। আস্তে আস্তে সমস্ত মানুষগুলোই লটবহর রেখে চলল তাদের সঙ্গে হলঘরের দিকে।

মোকাবিলা করবার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে সকলের ক্লান্ত রুক্ষ মুখগুলো। শিশু বৃদ্ধ মেয়ে পুরুষ সবাই ভিড়েছে—চলেছে, এ বাড়ী তারা ছাড়বে না, মরবে না, সে কথা জানাতে।

নতুন বাচ্চাটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। আর তারই প্রতিধ্বনি উঠল রাজ-বাড়ীর প্রতিটি কোণে, প্রতিটি খিলানে।

বিষের ঝাড়

মান্ধাতার আমলের পুরনো নোনাধরা দোতলা বাড়িটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে এমনভাবে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ার মুহূর্তে হঠাৎ ঠেকো দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। বাড়িটা পূবমুখো। সেদিকের সদর দরজার ঠিক মাথার উপর দিয়ে একটা অশ্বত্থের শিকড় বাড়িটার একটা পাশ দীর্ঘদেহ অজগরের মত বেড় দিয়ে সেই পশ্চিমে ডাল-পালাপত্রপল্লবে ঝাঁকড়া হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। বাদবাকি একটা অংশ ভেঙে চুরে স্তূপ হয়ে উঠেছে যেন আধলা ইঁটের। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে আছে আগাছা জঙ্গলে আর বড় বড় আম জামের ছায়ায় কেমন একটা ভুতুড়ে অন্ধকার থমথমিয়ে আছে। পূবদিকে ভাঙাচোরা ফাটল-ধরা রকটা ছাগল-নাদিতে ভরা। সদর দরজাটার সামনেই একগাদা গোবর। আগাছার মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ দরজা থেকে পাড়ার গলিপথটায় গিয়ে মিশেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনায়। বাড়িটারও রূপ বদলায়। ঝুপ্সিঝাড়ের কোল থেকে অন্ধকার গলে গলে পড়ে বাড়িটাকে ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে।

মনে হয় বাড়িটাতে মানুষ নেই। অথচ পোড়ো বাড়ির মত বাতাস এখানে হাহাকার তোলে। নৈঃশব্দ্য নিরেট নয়, যেন ছটফট করছে। সেই ছটফটানি টের পাওয়া যায় আচমকা শিশুকণ্ঠের দুর্বোধ্য স্বরে কিংবা যেন হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে আসা কিশোরী গলার গানের সুরে। আর সে সুরের কোন বৈচিত্র্য নেই। একই সুর, একই কথা।...ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...

সদর দরজার চৌকাট আছে পাল্লা নেই। সেই দরজা দিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল হারাধন চক্রবর্তী, এ বাড়ির বাসিন্দা। মালিক নয়, ভাড়াটিয়া। মালিকেরা চার শরিক, চার মুলুকে থাকে। মাঝে মাঝে তারা এসে তম্বি করে হারাধনের উপর এবং যাওয়ার সময় শুনিয়ে যায়, দাঁড়াও মামলাটা হোক্, তখন তোমাকে দেখব। কিন্তু মামলা আর তাদের হয় না, সেজন্য কোন গতিও হয় না ভাগের মায়ের। সেই পড়ে থাকা ভাগের মায়ের কোল আঁকড়ে পড়ে আছে হারাধন। দুই পুরুষের ভাড়াটে তারা। এক পুরুষ ভাড়াটা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে গেছে, কারণ তখন চার শরিকের একটা বাপ ছিল। শরিক বলে কথা নয়, হারাধন ভাড়া দিতে পারে না। সে বলে,

'মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান।' মামলা হয়ে যদি কোন বিলিব্যবস্থা হয়ে যায়, তবু ওই চার শরিকের বাড়িটা ভাগাভাগি করে গড়তে হবে তো! সে হবেও না। আর এ বাড়ি না ধসলে আমারও ছেরাদ্দ হবে না। সুতরাং এ সব বৈষয়িক বিষয়ে হারাধন মাথা ঘামায় না।

দরজার মুখে পিছল মাটির উপর গোবর দলাটা দেখেই খিঁচিয়ে ওঠার মত তার এক পাটি অসমান দাঁত বেরিয়ে পড়ল, হিংস্র জানোয়ারের যেমন সামান্য বিরক্তিতে ভয়ংকর দাঁতগুলো একবার ঝকমকিয়ে ওঠে। তা ছাড়া হারাধনের সিংহরাশি কি না জানা নেই, চেহারার মধ্যে পশুপতির ছাপ আছে খানিকটা। তবে উপবাসী এবং সেইজন্য ক্ষ্যাপাটে পশুপতি। দাঁত খিঁচিয়েই আছে। শক্ত মোটা হাড়ের চওড়া শরীর, লম্বাও নেহাৎ কম নয় কিন্তু মাংস নেই। তার মাঠের মত পাথুরে কপালটার ঠিক মাঝখান থেকে সূক্ষ্মাগ্র তীরের মত উঠে সারা মাথায় সিংহের পাকানো কেশরের মত চুল ছড়িয়ে পড়েছে। এককালে এ চুল কালো ছিল। এখন হয়েছে খানিকটা মেটে আর জায়গায় জায়গায় পাক ধরে সাদা কালোর মাঝামাঝি ধোঁয়া ধূসর বর্ণ। নাকটা মন্দ ছিল না কিন্তু নীচের দিকে একেবারে থ্যাবড়া হয়ে গেছে। চোখ দুটো সামান্য গোলাকৃতি, তাতে গাছের শিকড়ের মত লাল ছড়ের ছড়াছড়িতে কিছুটা হিংস্র হয়ে উঠেছে। অনবরত কুণ্ঠনের ফলে ঠোঁটের ডান পাশটা কুঁচকে বেঁকেই থাকে। শরীরটা সব সময়েই ঝুঁকে থাকে সামনের দিকে। পরিশ্রম হলে তো কথাই নেই তখন এই চার শরিকের বাড়িটার মত হারাধনকেও মনে হয় মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে কোন রকমে চলেছে। আর এই হারাধন, যার আঠারো বিশে হয়তো শরীর ছিল সটান, আজ তার জঙ্ঘা থেকে ঠ্যাং দুটো নেমেছে যেন পাকা বাঁশের বাঁকা গোড়া। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকলে দু-পায়ের মাঝখানে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায়। বয়স মাত্র চল্লিশের কোঠা ধরব ধরব করছে। এই হল হারাধন চক্রবর্তী। সব নয়, চেহারার। কাজের মধ্যে গল্প, সর্বদর্শন, এবং ডাক্তারি। হ্যাঁ, ডাক্তারিটাই প্রধান। ডাক্তারিও আজব, সৃষ্টিছাড়া। তার কোন ডিসপেন্সারি নেই, তার ঘরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না একটা ওষুধের শিশি বা কোন সরঞ্জাম। সে তো অনেক দূরের কথা, ঘরের মানুষের রোগে এক ফোঁটা ওষুধ কেউ হারাধনকে হাতে করে আনতে দেখেনি। কোন রোগীকে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়নি আজ অবধি ওই চার শরিকের ফাটা ভাঙা রকের উপর, হারাধন ডাক্তারের অপেক্ষায়। তার জীবনে সে কারো নাড়ি দেখেনি, দেখেনি

জিভ চোখ বা পেট টিপে। তবু হারাধন ডাক্তার। পাড়ার ফক্কড় ছোঁড়াগুলি বলে, ডবল এম্ বি, পাড়ার এম্ বি ডাক্তার বলেন, ব্যাটা আমেরিকা ঘোরা ভি-ভি স্পেশালিস্ট। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার নন্দদুলাল বলেন, মরা হ্যানিমানের ভূত হারাধন। ওর জুড়ি নেই। বলেই অবশ্য তাড়াতাড়ি জরি দিয়ে বোনা হ্যানিমানের কোটের কলারের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন হাত জোড় করে। অর্থাৎ হ্যানিমানের আত্মা যেন ক্ষুণ্ণ না হন।

আর হারাধন মাঝে মাঝে চৌমাথার জনারণ্যের ভিড়ে কিম্বা দু-ধারে কারখানার উঁচু পাঁচিলে আড়াল করা শহরের পাকা সড়কে আচমকা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় দেড় ফুট ঠ্যাং ফাঁক করে। ঠোঁট কুঁচকে মনে মনে বলে, এঃ সত্যি সত্যি ডাক্তার হয়ে গেছি!...

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউসের চিমনি চারটের দিকে, আশেপাশের কারখানা বাড়িগুলোর দিকে। দুনিয়াজোড়া মানুষ এসে একটা গতি করে নিয়েছে এখানে কিন্তু তার সামনে সমস্ত ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কেবলি। বাপ ছোটকাল থেকে যজমানের বাড়ি নিয়ে নিয়ে ঘুরেছে। ছেলেকে একটি অকালকুষ্মাণ্ড করে দিয়ে মরেছে। সে বলে, শালা মন্তর বলাটাও ভালো করে শিখিয়ে দিয়ে যায়নি! যজমানি করা দূরের কথা, হপ্তার নারাণপুজোটার জন্যও কেউ ডাকে না। দুটো চাল কলা এলেও বা...। না, সে তার জীবনের প্রথম দিকেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাপের মৃত্যুর পর যজমানেরা ডেকেও জিজ্ঞেস করেনি। বলেছে, বামুনের ঘরের আকাট। ও কোষাকুষিতে হাত দিলে তা অপবিত্র হবে।

গোবর দলাটার দিকে আর একবার দেখে সে উপরের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকতে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। তার কানে এল সেই গানের কলি, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা... নিজেই সে উবু হয়ে তাড়াতাড়ি থাবলা থাবলা গোবর হাতে তুলে নোনা ধরা ইঁটের গায়ে চাপটি মেরে দিল। বাড়ির পেছনে পানা পুকুরটায় হাত ধুয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে চলতে শুরু করল বড় রাস্তার দিকে। আশে পাশে দেখে না, সামনে মুখ তোলে না। দূর থেকে দেখে মনে হয় পিঠে বোঝা নিয়ে বুঝি একটা মানুষ আসছে।

আশপাশ থেকে নানান্ কথা ছিটকে আসে ওকে উদ্দেশ করে। উৎকট এবং কুৎসিত সব মন্তব্য। সিনেমার ধারের চা-খানাটার কাছ থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—

হারাধনের দশটি রোগী, ঘোরে বাজার ময়
একটি মল গরমী রোগে রইল বাকি নয়।

হারাধন নির্বিকার। কোনদিকে দৃকপাত না করে রোজকার মত লাইটপোস্ট গুণতে গুণতে এগোয় সে। সতের, আঠার...তেত্রিশটা হলেই ডানদিকের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এমনি সে রোজ। কেমন করে যেন এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বোধ হয় সামনে তাকায় না বলেই।

অচেনা লোককে হঠাৎ হকচকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় গলিটার মোড়ে। মনে হয় একটা অন্ধকার গুহা, তার মধ্যে দূরে দূরে কতকগুলি জোনাকি জ্বলছে পিট পিট করে। আর অশরীরী ছায়ার মত যেন কারা ঘোরাফেরা করছে সেখানে, ভিড় করে আছে কারা সারবন্দী হয়ে গুহার গায়ে পাথরের মূর্তির মত। নিঝুম নয়। হাসি, গান, গল্প, মারধোর, কান্না, হাঁক হল্লা, কী নেই! তবু যেন হাওয়া নেই, আকাশ নেই গলিটার মাথায়। রুদ্ধশ্বাস দমবন্ধ, পাথরের দিকে ঠেসে ধরতে চাইছে।

'সেলাম হো ডগদরবাবু।' জং-ধরা গলায় প্রথমেই একজন অভিনন্দন জানায় হারাধনকে।

লোকটাকে এ মহল্লার মালিক বলা চলে। মোষের মত বিশাল কালো লোমশ চেহারা, গলায় সোনার সরু চেন, কানে দুটো সোনার মাক্‌ড়ি।

হারাধন সে কথার জবাব না দিয়েই এগুল।

মাতাল মেয়ে গলার বেসুরো গান এক কলি শোনা গেল—

প্রেমের বাজারে যাব লো সজনী,
দেখে শুনে আনব কিনে প্রেমের পশরাখানি।...

কে একজন মুখে জিভ্ দিয়ে তবলা বাজিয়ে উঠল, তাক্ ডিমা ডিম্।..

শ্লথগতি হয়ে এল হারাধনের। দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় ভেংচে উঠল চাপা গলায়, 'প্রেমের পশরাখানি!'

'বাউনবাবা নাকি গো' একটা মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ রকের উপর হারাধনের কাছে এসে দাঁড়াল।—'এই তোমার জন্যেই বসে আছি। সময় আর তোমার হয় না আজকাল।'

সামান্য আলোর একটা রেখা পড়েছে হারাধনের মুখে। মুখটা তার আরও বিকৃত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো তীক্ষ্ন, খোঁচা খোঁচা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র জন্তুর মত। বলল, 'কেন, এখনো তো মরনি, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন?'

'উর্বশী নাচুনির বোন না আমরা? আমাদের কি মরণ আছে?' মোটা গলায় হাসল মেয়েমানুষটা।

'তবে আর তাড়া কিসের। তোদের না মেরে তো আমি মরছি না।' বলে হারাধন লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফাঁক করে এগুল সামনের অন্ধকারের দিকে।

'কি হল, আসবে না?' মেয়েমানুষটি আবার বলল।

'আসছি, পুতুলের ঘরটা ঘুরে।'

আশপাশ থেকে অনেক মেয়েই বাউনবাবাকে ডেকে ওঠে, অকারণ দুটো কথা বলে জবাবের প্রত্যাশা না করে। যে সব পুরুষেরা ভিড় করেছে, তাদের কেউ কেউ মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে হারাধনকে দেখে, কয়েকটা পাড়ার ছোকরা ছুটে পালায় এদিক ওদিক দুড়দাড় করে।

হারাধন এ পাড়ায় বাউনবাবা বলে পরিচিত, আসলে এখানেই সে ডাক্তারি করে। সে কয়েক বছর আগের কথা। হারাধনের তখন ছ-মেয়ের পর একটি ছেলে হয়েছে। তার বিশিষ্ট বন্ধু, ইতর শ্রেণীর মহাপুরুষ বলে যার খ্যাতি সেই পরাণ ভট্চায এসে বলল, 'দেখ্ হেরো, কারখানার দরজা ধাক্কিয়ে তো সে মন্দিরের দরজা খুলতে পারলিনে, মাঠের ঘোড়াও তোকে খালি ল্যাং মেরেই গেল আর বড় বড় কথা বলে কার পেট ভরাবি? তার চে এক কাজ কর। ছুঁচ ফুঁড়তে পারবি?'

হারাধন প্রথমটা ঠাওর করতে পারেনি। বলেছিল, 'ছুঁচ ফুঁড়ব মানে?'

'মানে ডাক্তারি করতে হবে।' বলে পরাণ ভট্চায বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, বাজার ঘরের মেয়েদের তো চিকিৎসার কোন বালাই নেই। অথচ সবগুলোই ব্যামোতে ভোগে। ওদের যারা কর্তা, তারা রোজের টাকাটা উঠিয়ে খালাস। কে মল বাঁচল সে-সব ওরা দেখে না। তা মেয়েগুলোর তো আর রোগ পুষে রাখা চলে না, রোজগার করতে হবে যে! লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু পয়সা ওরা রেখে দেয়, সেটা দিয়েই ওষুধ কেনে। তবে কর্তারা তা জানে, বিশেষ কিছু বলে না। আর বাজারের ডাক্তারদের খাই মেটানো ওদের পক্ষে সম্ভবও নয়। আমি ওদের বুদ্ধি দিয়েছি, তোরা পয়সা দিয়ে বাপু ওষুধগুলো কিনে আনিস, আমি ফুঁড়ে দেব। যা হয়, দিস্ আমাকে, আর যদ্দিন পারিস্ রোগ সারিয়ে বেঁচে থাক। তা ফলটা কিছু খারাপ হয়নিরে। তবে বাজার সবখানেই মন্দা, খদ্দের আছে কাঁড়ি কাঁড়ি, পয়সা নেই। ছুঁচ ফোঁড়াও কিছু খারাপ নয়, লক্ষণটা একটু বুঝে নেওয়া। সে দু-দিন দেখলেই হয়ে যাবে। বাজারের

ডাক্তারে তাও দেখে না।'

হারাধন প্রথমটা পরাণ ভট্চাযের কথা বিশ্বাস করতে পারেনি, খোঁচা খোঁচা দাঁতগুলো বের করে হাসবার চেষ্টা করেছিল পরাণের রসিকতায়। কিন্তু পরাণ রসিকতা করেনি। রেগে বলেছিল, 'তবে ঘর ভরা মা ষষ্ঠীর কৃপা নিয়ে বসে থাক। ঘোড়ার লাথি আর পাঁচজনের ভিক্ষেতে শালা পো-পেটা পড়ে থাক্‌গে। ব্যাটা বামুনের ঘরের আকাট হয়েছিস্, বেশ্যার ডাক্তার হতে পারবিনে?'

সত্যি, ঘোড়া ঠিক দৌড়াতে পারলে ভাগ্য ফেরে, তার ল্যাং খাওয়া যায়। গয়লার ছেলে কেনোও একটু চা দিতে হলে জাত নিয়ে গালাগালি দেয়। কেউ কেউ তাকে দু-চার আনা পয়সা দিত, যাদের ঘোড়ার টিপ্ ধরে দিত সে। যারা পেয়েছে এক আধবার, তারা হারাধনকে একটু ভালো নজরেই দেখে। তা ছাড়া মিছে মামলার হক্‌দার সাক্ষী সে বাঁধা, সত্য বই মিথ্যা না বলবার প্রতিজ্ঞা বোধ করি তার জীবনের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। তবু বড়মানুষ ছোটজাতের যজমানি হারাধন নেয়নি। বামুনে শুয়োরের ব্যবসা করে, তা বলে কি রাঢ়ী কখনো বারেন্দ্র হয়, না, নিজেকে ভঙ্গ করে। আর খিদের সময় নিজের সন্তানদের কাড়াকাড়ি, বাপ হয়ে বাটপাড়ি, তার ফাঁকে ফাঁকে বৌয়ের মাটির পুতুলের মত চোখ জোড়ার বিচিত্র অবাক অলস চাউনি, এসব ভেবে গয়লা কেনোর আর না চাওয়ার দিব্যি দেওয়া চা গিলে সে উঠেছিল এসে পরাণ ভট্চাযের কাছে।

সেই থেকে শুরু। পরাণ ভট্চায্ সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে কবে কোথায় উধাও হয়ে গেছে, রয়ে গেছে হারাধন। মেয়েরা পরাণকে বলত ভট্চায্, কেননা সে ছিল তাদের বন্ধু। হারাধন বন্ধু হয়েও বাপ হয়েছে। তাই সে হয়েছে বাউনবাবা।

এখানকার বস্তির বাইরে থেকে ভেতরটা বোঝা যায় না। সেখানে আছে অনেকগুলো হ্যারিকেনের আলো, একটা লম্বা চওড়া কাঁচা উঠোন, তার মাঝখানে তুলসীমঞ্চ ও ছোদ ফোকড়ের মধ্যে জ্বলছে সন্ধ্যাপ্রদীপ। বাইরের চেয়েও বেশী লোক, বেশী হল্লা হাসি গান। চারপাশ জুড়ে ঘর।

উঠোনটা ভেজা ছিল। তার উপরে একটা মাতাল পড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর গান গাইছে।

প্রথম প্রথম এসব চেয়ে দেখেছে হারাধন। এখন দেখা দূরের কথা, মনেই থাকে না। সে দেখে খালি মেয়েগুলোকে, চেনে মেয়েগুলোকে, কথা বলে কেবল ওদেরই সঙ্গে

এবং কোন দিনও হেসে কথা বলেনি। যেটা হাসি বলে মনে হয়েছে সেটাকে দাঁত খিঁচোনো বলাই ভালো।

পুতুল গান করছিল ঘরের মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে মুখের কাছে একটা বালিশ নিয়ে। হারাধনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

হারাধন মুখ খিঁচিয়েই আছে। বলল, 'গান হচ্ছে? বলি কোন্ সুখে।'

'ব্যামোর।' ম্লান হেসে বলল পুতুল। 'ব্যামোতে মানুষে গান গায় তা বুঝি জান না, বাউনবাবা?'

'জানি বই কি। পাগলে ছেলে মলেও হাসে। ঢিল খেলেও হাসে। এখন ওষুধ বের কর্ দিনি।'

হারাধন এখন একজন প্রকৃতই ডাক্তার। বলল, 'খেয়েছিস্ কখন?'

'সেই দুকুরবেলা!'

খ্যাঁক করে উঠল হারাধন, 'মিছে কথা বলিস্ কেন? গাদা বমি করে মরবি। বিকেলে কিছু খাস্‌নি?'

পুতুল অমনি আদুরে মেয়েটির মত ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'সে তো কোন্ বেলায় দুটি মুড়ি আর চা খেয়েছি।'

'তবু কতক্ষণ আগে?'

'তা চার ঘণ্টা হবে।'

'ঠিক তো?'

'তো কি, তোমাকে মিছে বলব?'

'পাগল, তা কখনো বলতে পারিস।' দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল হারাধনের বিকৃত মুখটা বিস্ফারিত করে।

আবার চকিতে গম্ভীর হয়ে পুতুলের নাড়ি দেখল গভীর অভিনিবেশ সহকারে। এটুকুও সে জানে বোঝা গেল। তারপর পকেট থেকে একখানি ছোট পিজবোর্ডের বাক্‌স বার করে সিরিঞ্জ্ নিল, স্পিরিট তুলো বার করল, টকাস্ করে ভাঙল ইন্‌জেকসনের এ্যাম্‌পিউল।

পুতুল তাড়াতাড়ি হাঁক দিল, 'ও পুঁটি, একদুস্ আমাকে ধরবি আয় ভাই।'

পুঁটির জবাব এল, 'হ্যাঁ, পেথম রাত্তির, আমার কি দরজা ছেড়ে যাওয়া চলে?'

পুতুলের গলায় আরও খানিক ভয় ও মিনতি ফুটে ওঠে, 'তোর পায়ে পড়ি পুঁটি।'

হারাধন সিরিঞ্জে ওষুধ পুরতে পুরতে বলে উঠলো, 'এখনো মরণের ভয়? বাঁচতে সাধ?'

'তা বাউনবাবা, মরতে পারলে কি আর গংগার জল কিছু কম ছিল?'

'থাক।' বলে নিঃশেষিত এ্যাম্‌পিউলটি ফেলে দিয়ে চোখ তুলে সে পুতুলের দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো উঠল সরল হয়ে। বলল, 'একটু দেখেশুনে মানুষ ঘরে তুলতে পারিসনে, অ্যাঁ?'

পুতুলের মুখটি পুতুলের মতই হয়ে উঠল। 'তা কি হয় বাউনবাবা? খদ্দের কাণা হোক, খোঁড়া হোক, সে যে ভরসা!' পরমুহূর্তেই মুখটা বিকৃত করে বলল, 'তা রোগ ব্যামো কি মুখপোড়াদের ধরা যায়।'

পুঁটি এল মুখ গোঁজ করে। উপায় তো নেই। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, এমন দিন সবারি আসে। পুঁটিকে একদিন ধরতে হবে হয়তো পুতুলকে এসে।

একটা পাকা ডাক্তারের মত শিরা খুঁজে প্যাঁক করে হারাধন ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। 'কণ্ট হলে বলিস্‌।'

ইনজেকসনের পর, খানিকক্ষণ পড়ে থেকে পুতুল চার আনা পয়সা বাড়িয়ে দিল হারাধনের দিকে। 'ওষুধ এনে এই ছিল বাউনবাবা, পরে আবার দেব।'

হারাধনের ক্রুদ্ধ মুখটার দিকে চাওয়া যায় না। চিবিয়ে বলে, 'তোরা মরবি কবে, কবে?'

নিশ্চুপ পুতুল তেমনি পড়ে রইল। হারাধন তার হাত থেকে ছোঁ মেরে পয়সা চার আনা নিয়ে গেল বেরিয়ে।

বাইরে গজ্‌গজ্‌ করছে পুঁটি। কে জানে এই দশ মিনিটের মধ্যে হয়তো একটা খদ্দের মিলত তার।

একটা লোককে কয়েকটা মেয়ে মিলে পিটছে। লোকটা নাকি পয়সা ফাঁকি দেয়।

অবসর নেই কিছু দেখবার হারাধনের। সে চষছে সারা মহল্লাটা পাকা বাঁশের মত বাঁকা পা বকের মত ফেলে ফেলে, ঘর থেকে ঘরে।

কিন্তু তার চেয়েও দ্রুত হুতোশে মন দৌড়চ্ছে মেয়েদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দুরু দুরু বুকে শিকারীর মত অপলক চোখে তারা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কে যে শিকারী, তা বোঝবার যো নেই। যে দেখছে, না, যে দেখাচ্ছে?

গান তেমনি চলছে, প্রেমবাজারে যাব লো...। আর দম-দেওয়া পুতুলের মত হারাধন ফিস্ফিস্ করে চলেছে ভেংচে। প্রেম না পেম।...কেউ ওষুধ কিনে রাখেনি, কেউ না। অথচ রোজই বলে, রাখবে। তারপরে আর পয়সা থাকে না। থাকলেও নেশা করে বসে থাকে, নয়তো কিছু খেয়ে বসে থাকে ভালো-মন্দ। কিন্তু বেশীর ভাগই পয়সা জমাতে পারেনি। একটা অজানা রাগে তার আঙুলের টিপুনিতে সিকিটাই না ভেঙে যায়।

'চন্ডী, চন্ডী কোথায়? সে তো মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল ওষুধ এনে রাখবে।...' চন্ডীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই খুট্ করে দরজাটা খুলে গেল আর চামচিকের মত ফুড়ুৎ করে একটা লোক গেল ছুটে বেরিয়ে।

চন্ডীর গায়ে কাপড় নেই। হারাধন বিকৃত মুখটা ফিরিয়ে বলল, 'কাপড় পর্।'

মদ খায়নি, তবু যেন নেশাচ্ছন্ন চন্ডী তার কালো মোটা শিথিল শরীরটা ঢাকল ধীরে ধীরে, নিস্তেজ গলায় ডাকল, 'এস বাউনবাবা।'

ঢুকেই হারাধন তার দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল, 'তবে তোর ব্যামো সারবে কী করে? খুব তো এন্তার...'

বাধা দিয়ে বলে উঠল চন্ডী, 'কোথায় বাবা, সবে তো দুজন।'

কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে হারাধনের। মনে হল এখুনি এক ঘুষিতে অর্বাচীনা চন্ডীর মুখটা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু মুখ কই।

চন্ডীর তো মুখ নেই! মাটির ড্যালা তো একটা। বলল, 'ওষুধ এনেছিস?'

'এনেছি।'

'বার কর।'

সেই এক কথা, এক ভাব, এক ব্যাপার।

ইন্জেকসনের শেষে একটা পুঁটলি বাড়িয়ে ধরল চন্ডী হারাধনের দিকে। 'এইগুলো নেও বাউনবাবা, পয়সা নেই।'

'কি এগুলো?'

'চাল একসের।'

চাল? হঠাৎ যেন হারাধনের শূন্য পেটটা পাক দিয়ে উঠে মুখটা রসালো হয়ে উঠল। ভাতের গন্ধ লাগল যেন তার নাকে। তবু বলল, 'চাল কলা আমার বাপ

আনত মন্তর পড়ে, আমি কি করব?'

'খাবে।' নিরুপায় গলায় বলল চণ্ডী, 'এর জন্যেই তো সব বাউনবাবা। শরীলে যে এত বিষ ধরি...' কিন্তু কী যে মোহিনী গন্ধ চালের! হারাধন ততক্ষণে একমুঠো চাল কটর মটর ক'রে চিবোতে আরম্ভ করেছে। তার চিবোনো মুখের খুশি দেখে মনে হল সে সব ভুলে গেছে বুঝি। তরপর হঠাৎ চণ্ডীর দিকে নজর পড়তেই অপ্রস্তুত হয়ে চালের দলাটা গিলে ফেলল কোঁৎ করে। মুখটা বিকৃত করে বলল, 'শালা চাল নিতে হবে? আচ্ছা, তাই সই।'

বলে পুঁটলিটা নিয়ে আবার ফিরে বলল, 'তোর চাল আছে তো?'

'চালিয়ে নেব কোনরকমে।' চণ্ডী এলিয়ে পড়ল বলতে বলতে।

মুখটাকে আরও কুণ্ঠিত করে পুঁটলিটা মাটিতে রেখে বলল হারাধন, 'তবু বাঁচতে হবে।'

হেসে ফেলল চণ্ডী, 'তোমার কি কথা মাইরি, বাউনবাবা। বাঁচতে না হলে তুমিই বুঝিন্ এ ছুঁড়িদের দেখতে?'

'হয়েছে, থাক।' খ্যাঁক করে উঠে হারাধন বলল, 'ওর থেকে দুটো রেখে বাকিটা আমাকে দিয়ে দে।'

চণ্ডী সংশয়ান্বিত চোখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাগ করবে না তো বাবা?'

হারাধন তখন আপন মনে বিড়বিড় করছে, 'শালা পরাণ ভটচায যে কি আপদের কাজে রেখে গেল আমাকে। এর থেকে আমার......'

অমনি তার মনে আবার প্রশ্ন ওঠে, কী? চেয়ে চিন্তে, মিছে ধার করে আর মরীচিকার মত ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটে জীবনধারণ? না-ই বা হল। কিন্তু এ কোন্ বিদ্ঘুটে জীবনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে তার ভাগ্য? একদল প্রতিমুহূর্তে গণ্ডূষ গণ্ডূষ বিষ পান করছে, কী ক্ষমতা আছে হারাধনের সে বিষ সে শুষে নেবে?

চণ্ডী এক কুনকে চাল রেখে আবার পুঁটলিটা তুলে দিল হারাধনের হাতে।' হারাধন চলে যেতে যেতে বলল, 'দু-একটা রাত একটু কামাই দে, কামাই দে।'

চণ্ডীর সেই মাটির ড্যালা মুখটাতে যেন আচমকা আগুন ধরে গেল। সত্যিই একটা মুখ ফুটে উঠল এবার এবং বিতৃষ্ণায় রাগে ঘৃণায় তা যেন জ্বরবিকৃত। 'এ জীবনে কামাই দেওয়া আর হবে না। এক রাত্রিও থামতে পারা যাবে না। এ শরীরের

বিশ্রাম নেই। পারলে কি নিজের মুখের ভাত কেউ তুলে দেয়!......'

কোলাহল পড়েছে ঝগড়ার। একটা ছুতোর অপেক্ষা মাত্র। ঝগড়া তাদের, যাদের পসার নেই আর যাদের আছে তাদের মধ্যে।

সরলা বসে আছে রকের উপর। সেজেছে, রং মেখেছে, কাজল টেনেছে চোখে, কপালে বসিয়েছে টিপ। কিন্তু পথের ধারে যায়নি। কাপড় এলিয়ে খাটো জামাটা শরীরটাকে আরও কটুদৃশ্য করে তুলেছে। হারাধনের দিকে তাকিয়ে আছে ভিক্ষুকের মত যন্ত্রণাকাতর মুখে।

হারাধন পাথরের মত শক্ত মুখে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'তাকিয়ে আছিস কেন, কিসের জন্যে? আমি কি ভগবান যে তোর রোগ সারিয়ে দেব? ওষুধ না পেলে কিছু হবে না।'

সরলা কাছে এসে বললে, 'কি করব বাউনবাবা, রোজগারে কুলোয় না যে!'

রেগে কটূক্তি করে উঠে হারাধন, 'শালা ভিক্ষুকের ডেরা নাকি এটা ? তাদেরও তো রোজগার আছে, আর......। আমি কী করব? আমার কী আছে?'

এক, একই ব্যাপার ঘরে বাইরে। কোন যেন ফারাক নেই ঘরের বৌটার সঙ্গে এদের। তার রোগ নেই, কিন্তু সেও যেন এমনি অবস্থায়, প্রাণভীত চোখে হারাধনের সামনে এসে দাঁড়ায়।......চালের পুঁটলিটা শক্ত করে ধরে সে সরে গেল।

উপায় নেই। আগুনের হাল্‌কা লেগে যেন সরলা ছুটে পথের উপর চলে যায়।

'বাবা। বাউনবাবা।......'

কচি গলার ডাক শুনে ধ্বক্‌ করে উঠল হারাধনের বুক। যেন তার সেজ মেয়েটি এসে ইজের পরে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। রোগা লম্বা, সরল রেখার মত অপুষ্ট কাঁচা মেয়েটা। ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর বাউনবাবার প্রকৃতি ওর জানা নেই তাই হারাধনের হাত জাপটে ধরে মেয়েটা বলে উঠল, 'শরীলে আমার রোগ হয়েছে, সারিয়ে দেও, সারিয়ে দেও।'

হারাধনের মনে হল কে যেন গান গাইছে কচি গলায়, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা......

'এই-এই ছোক্‌রি।' হাঁকছে সেই মোটা লোমশ চেহারা, গলায় সোনার চেন দেওয়া লোকটা। মেয়েটা শুনল না সে ডাক। লোকটা হেসে উঠল। 'আচ্ছা, আচ্ছা ডাক্তার, কাল এসে ওকে দাবাই দিয়ে যেও, আমি আনিয়ে রাখব। চলে আয় ছোকরি,

চলে আয়।......'

মেয়েটা শুনল না।

'কিষণ!' মোটা লোকটা জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

সেই ডাক শুনে চকিতে মেয়েটা কাদার মত দলা পাকিয়ে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। কিষণ এখানকার বেয়াদপ্ মেয়েদের যম। মোটা লোকটা কেশো গলায় হেসে উঠল, 'তুমি ডাক্তার মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছ!...'

দড়াম করে একটা ঘরের দরজা খুলে রানী একটা সুবেশ ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এল চেঁচাতে চেঁচাতে। 'আরে আমার কোথাকার পুটকে ভাতার এলরে। দ্যাখো দিনি কাণ্ড। বলে আমার নেই সময়, ছোঁড়া কাজ মিটিয়ে পালাবি, তা না, বলে তুমি কেন বেবুশ্যে হয়েছ? একি যাত্রার ঢং রে বাবা। এখন আমি ওর সঙ্গে গল্প ফাঁদি আর কি। কেন হয়েছি সে তোর বাড়িতে জানে।'...বলে অগোছাল রানী অশ্রাব্য কটূক্তি শুরু করল।

ছেলেটার দিকে একমুহূর্ত দেখে হারাধন এগিয়ে গেল সেদিকে। নরম শান্ত নবীন যুবক। হারাধন তার চিবুক ধরে বলল, 'কাকে খুঁজছ বাবা? চন্দ্রমুখী না পিয়ারীবাইজী?'

ছেলেটা সন্ত্রস্ত বড় বড় চোখে হারাধনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার হাত পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, ঠোঁট দুটো নড়ে চড়ে উঠছে।

হারাধন তার খোঁচা খোঁচা দাঁতে বোধ হয় হেসে বলল, 'এরা সব মেয়ে কুলি, ফুরনে খাটে। ওসব গপ্পেই ভালো জমে, নয়তো জায়গা বাছতে হয়। এখানে সে সময় নেই। বাড়ি যাও, বাবা।'

ছেলেটার চোখে তখন প্রায় জল দেখা দিয়েছে। সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল।

রানী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলল, 'ছোঁড়ায় মরণ ধরেছে! চন্দ্রমুখীটা কে বাউনবাবা?'

'সে এক গপ্পের বেবুশ্যে। শরৎ চাটুয্যের নাম শুনেছিস্?'

'নরসিং চাটুয্যেকে তো চিনি, ও নাম তো জানি না।'

হারাধন বলল, 'তিনি বেবুশ্যেদের গপ্প লিখতেন, খুব নামী লোক ছিলেন রে।' পরমুহূর্তেই মুখটা ঘোঁচ করে বলল, 'তা বলে তিনি তোদের মত হাভাতেদের কথা লেখেননি, তাদের একটা প্রাণ ছিল।'

'সে পেরাণ নিয়ে তোমরা থাক গে, জান থাকলে বাঁচি।' মুখ বেঁকিয়ে রানী সরে গেল।

'জান থাকলে বাঁচি।' বিড়বিড় করতে করতে হারাধন এগোয়। ছোঁড়াটা বোকা, তাই এখানে এসেছে প্রেমের সন্ধানে। ব্যাটা মুখে দুটো তুলে দিয়ে প্রেম কর, জমবে। সবই জমবে। তা না, নভেলিয়ানা! চালের পুঁটলিটা নাকের কাছে ঘষতে ঘষতে পথে এল হারাধন।

সারাক্ষণ ঘুরে তার বারো আনা আর ওই চালটুকু রোজগার হয়েছে। তাও আট আনা পয়সা ভবিষ্যতের জন্য একটা মেয়ে জমা রেখেছে।

'প্রেমবাজারে যাব লো সজনী...' সেই গান চলেছে। হারাধন অন্ধকারে ঠাওর করে দেখলে, গান গাইছে মতিবালা। বয়স বেশী নয়, কিন্তু চামড়াগুলো ছাইপানা হয়ে কুঁচকে ঝুলে পড়েছে, চুলগুলো হয়েছে পাঁশুটে, দাঁত নেই একটাও। চোখ আছে দুটো সাপের মত। বলল, 'কি, বাউনবাবা? এই আঁধারে বসে গাইছি। দেখি যদি কেউ আসে।'

হারাধন মুখ ভেংচে বলল, 'প্রেমের সখ এখনো মেটেনি?'

মতি মাড়ি বের করে বলল, 'যা পেলেম না, তা মিটবে কী করে? আর পেটটা তো ভরাতে হবে। গান শুনে একবার উঁকি তো দেবে।'

'দিলই বা।'

'তখন ঘরে না যায়, দুটো পয়সা চেয়ে নেব।'

'তবু মরবে না।'...ছিটকে গলিটা থেকে বেরিয়ে এল হারাধন। এক, দুই... লাইটপোস্ট গুনতে আরম্ভ করেছে সে। রাতটা এখন ফাঁকা। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘাড় গুঁজে হেলে পড়ে ছায়া ফেলে চলেছে হারাধন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকে পড়ছে। কেবল মনে হচ্ছে সামনে এসে কে যেন দাঁড়াচ্ছে। কে?... কেউ না। রাতে পুলিশের বুটের শব্দ আসছে। তবু যেন একটা কিসের দেওয়াল এসে পথরোধ করছে বার বার হারাধনের।...হঠাৎ মনে হল রাস্তাটা একটা কুৎসিত ব্যাধির মত দলা পাকিয়ে উঠে এসেছে তার সামনে। ধাক্কা দেওয়ার মত এগিয়ে গেল সে। আঙুলে যেন সিরিঞ্জ ধরেছে। ফিস্ ফিস্ করে উঠল, দেব শালা ছুঁচ ফুঁড়ে? দেওয়া যায় না ইন্‌জেকসন করে এক হাতে দুনিয়াটাকে সাপটে ধরে?...উনত্রিশ .. ত্রিশ.....

গলিটাতে ঢুকে তার গতি শ্লথ হয়ে আসে। ঘাড়টা আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে। বাঁকা পায়ের পদক্ষেপের তালে তালে যেন সে বলছে, ধরণী দ্বিধা হও! দ্বিধা হও!

গলিটাতে আলো নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের চাঁদ ছিল আকাশে। অষ্টমীর চাঁদ বোধ করি, এক বিচিত্র কুহেলিকাপূর্ণ আলো আঁধারে ভরা সমস্ত গলিটা। কোথায় একটা গো-সর্পিণী উলু দেওয়ার মত লু লু করে ডেকে উঠছে গো সাপকে।

ডোবার ধারের সরু ধার দিয়ে ঝুপসিঝাড়ে ছাওয়া হেলে পড়া বাড়িটার সামনে এসে হারাধন দাঁড়াল। ভুতুড়ে বাড়ি, ছিটে ফোঁটা ঝাপ্সা আলোয় মনে হয় নিশ্বাস আটকে হেলে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা।

হারাধনের পায়ের শব্দে কিসে যেন ফোঁস করে উঠল। সে দেখল দেওয়ালের ফাটলে অর্ধেক বেরিয়ে আছে কাল নাগ, চক্‌চক্‌ করছে রং। কিন্তু হারাধন যেন চেনা মানুষ। মাথা নামিয়ে তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে গেল। বাস্তু সাপ এটা। একজোড়া আছে। ওরা চার শরিককে চেনে না, চেনে হারাধনকে। পোড়া বাড়িতে ভূতের মত নিঃসাড়ে ঢুকল হারাধন। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। উঠোনটাতে আগাছার ঝাড়—তার ব্যাপ্তি উপরে নীচে সর্বত্র। উপরের সব ঘরগুলোই ভাঙা আধ ভাঙা, একটা ঘর আস্ত। হারাধন সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। দাঁতগুলো তার বেরিয়ে পড়েছে। বুক খোলা জামাটার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে পৈতাটা।

ঘরটাতে জানলা ও ভাঙা ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকছে। সেই আলোয় দেখা গেল সারি সারি তার ন'টি ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে। আটটি মেয়ে, একটি ছেলে। বড় মেয়ে দুটোর সারা গায়ে রং-এর যাদু লেগেছে। হারাধনের মুখের এলোমেলো কোঁচ-গুলো যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। সে উবু হয়ে সকলের ধার দিয়ে একবার হাত বুলিয়ে গেল। ছেলেটার কাছে এক মুহূর্ত থমকাল।

আলোয় যেন নীল দেখাচ্ছে ছেলেটার মুখটা। ছেলে মাত্র একটি। মুখের কষ বেয়ে নাল পড়ছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল।...কিছু দিন আগে পাড়ার কে দু-কোয়া কাঁঠাল দিয়েছিল ছেলেটাকে। ছেলেটা ডোবার ধারে বসে তা খাচ্ছিল। হারাধন হঠাৎ কি মনে করে খেলাচ্ছলে কাককে দিয়ে দেবে বলে ক্ষ্যাপাতে ক্ষ্যাপাতে কপ্‌ করে কাঁঠালের কোয়াটা মুখে দিয়ে গিলে ফেলেছিল।......আর ছেলেটার সে কী চিল চেঁচানি! হারাধন ভয় পেয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল তার বৌয়ের সেই একজোড়া অপলক চোখের অলস চাউনি।

তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল গয়লা কেনোর দোকানে একটা বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা করতে।

কিন্তু বৌটা কোথায়? একেবারে অন্য গলায়, নরম সুরে সে ডাকল, 'ন-বৌ! ন-বৌ কোথায় গেলিরে?'

সে ডাকে যেন সারা ঘরটায় একটা মায়া ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কোন জবাব এল না। হারাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক করে পূব দিকের ছাদটার দিকে গেল।

সেখানে জামরুল গাছটার পাশে, আল্‌সের ধারে ন-বৌ নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে।......হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ন-বৌ অপারিসীম সুন্দরী। এই আলোয় গায়ের রং যেন ধপধপ করছে, রূপময়ী হয়ে উঠেছে ন-বৌ। মাথায় ঘোমটা নেই, ময়লা কাপড়টা শরীরটা ঢেকে রেখেছে।......

কিন্তু সামনে এলে দেখা যায়, সমস্ত শরীরটা একটা সরল রেখা। কোথাও তার নেই উঁচু নীচু বঙ্কিম রেখা। মুখটা কঙ্কালের মত সাদা ও ছোট। সেই হাড় কপালে একটা মস্ত লাল টিপ। চোখ দুটো যেন পোয়াতী গাভীর।

হারাধন চালের পুঁটলিটা রেখে বৌয়ের হাত ধরে ডাকল—'কী করছিস্ এখানে ন-বৌ, খুঁজে আর পাই না।'

ন-বৌ তড়াতাড়ি ক্লান্ত হারাধনের দিকে ফিরে দু-হাত ধরে তাকে বসায়, জামাটা খুলে নেয়, বলে, 'কখন এসেছ?'

'এই তো কিছুক্ষণ!' হারাধন একটা নিশ্বাস ফেলে ন-বৌয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'চাঁদ দেখছিস্?'

'চাঁদ কোথায়?' ন-বৌ অবাক হয়ে দেখল সত্যিই তো চাঁদ রয়েছে আকাশে।

হারাধন বলল, 'চোখেও পড়েনি, না রে? এ সব বুঝি আর চোখেই পড়বে না কোনদিন। ন-বৌ, এ বাড়িটার মতই আকাশটা কোন্‌দিন ভেঙে পড়বে।'

ন-বৌয়ের মুখটা যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠল। হারাধনের হাড় বের করা মুখটায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমার যে শরীরটা'—

'বলিস নে।' বাধা দিয়ে বলে উঠল হারাধন। 'বলিস্ নে ন-বৌ। তুই গায়ে হাত দিয়ে বলছিস। আমি যে তোদের দিকে আর তাকাতে পারি নে।......এই তো রোজগার করেছি বারো আনা পয়সা তিন পো চাল। কী দিয়ে তোদের ছোঁব, বল্!'

বুঝি রাত থেমে গেছে, চাঁদ ঢেকে গেছে, হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

ন-বৌ বলল, 'তা হলে তোমাকে দুটি রান্না করে দিই?'

'আজ আর নয়, কাল দিস্। চল্ ঘরে যাই।' বলে ন-বৌয়ের হাত ধরে কাছে টেনে নিল সে।

ন-বৌ উঠল কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে রইল। হারাধন ডাকল, 'চল, রাত যে পুইয়ে এল?'

যেন দারুণ অপরাধিনীর মত ন-বৌ হঠাৎ হারাধনের পায়ের কাছে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল, 'উঠানের ওই তেলাকুচোর ঝাড়টা তুমি কেটে দিও।'

হারাধন অবাক হয়ে বলল, 'কেন রে?'

'ওখান থেকে কি একটা ফল খেয়ে ছেলেটা মরে গেছে।......'

হারাধনের মনে হল সত্যি আকাশটা ভেঙে পড়েছে তার মাথায়, বাড়িটা টলছে, চাঁদটা ছিটকে পড়ছে আকাশ থেকে। ন-বৌ তখন বলছে, 'সন্ধ্যাবেলা কেবলি খেতে চাইছিল আর কাঁদছিল। ওদের জন্য তখন ক-খানা রুটি করছিলাম। সেই ফাঁকে... খোকার খিদে মানল না।...দেখলাম, কি খেয়ে বোবা ছেলে শুয়ে আছে।...'

হারাধনের চোখের উপর ভেসে উঠল ছেলেটার নীল মুখ, নাল গড়াচ্ছে। যেন আকাশের বুক থেকে বলল, 'ও! তবে জন্মের মত দেখে এসেছি তাকে?...তবু চল্ ন-বৌ সে যে একলা রয়েছে!...আমার যে আরও জ্যান্ত আটটা মেয়ে রয়েছে!'

পরদিন ছেলেকে শ্মশানে পুঁতে এসে হারাধন পৈতেটা কোমরে গুঁজে একটা মস্ত ঠ্যাঙ্গা দিয়ে ঝাড়টাকে পিটে পিটে দুমড়ে দিতে লাগল, আর মনে মনে বলতে লাগল, মেয়ে আটটা যেন আর না মরে।...

সেই ঝাড়ে ঘা লেগে ছরকুটে যেতে লাগল সবুজ লাল সব বিচিত্র ফল। পালাল কতগুলো ঢোঁড়া হেলে সাপ, পোকা মাকড়। শিকড়ে ঘা লেগে সারা বাড়িটার দেওয়ালের বিস্তৃত শিরা-উপশিরায় টান পড়ে যেন নড়ে উঠল বাড়িটা।

ন-বৌ উপরে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাই দেখছে। মেজ মেয়েটা কোলের বোনটাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে দোলাচ্ছে আর সরু মিষ্টি গলায় গাইছে, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা......

গুণিন

বহুদিন পরে গাঁয়ের স্টেশনে পা দিয়ে নকুড় অচেনা এক দেশে আসার মত এক মুহূর্ত অবাক্ হয়ে রইল।...যে গ্রামকে সে ছেড়ে গিয়েছিল, এ সে গ্রাম নয়। রেল লাইনের পশ্চিম দিকটা অবশ্য বরাবরই খানিক শহর-পানা জায়গা, কিন্তু এখন তো প্রায় আস্ত একটা শহর হয়ে উঠেছে! মেলাই পাকা বাড়ী উঠেছে, কারখানাও উঠেছে [illegible]' একটা।

কিন্তু পরমুহূর্তেই তার বুক উজাড় করে মস্ত একটা নিঃশ্বাস পড়ল, তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল এক মহাসুখের হাসি। বহুদিন পরে যেন আচমকা গাঁয়ের হাওয়া লেগে তার শরীরটা আনন্দে শিউরে উঠল। ইস্! কতদিন পর। সে দিন-মাসের বুঝি বা হিসেবই নেই।...তার জন্মভূমি! ওই তো পুবে বেনাহাটি গাঁ। সামনের মাঠটায় গরু চরাচ্ছে হয় তো দাশু রাখালই। কিন্তু রাস্তার ধারে ধারে অনেকগুলো চালাঘরও উঠেছে। বোধ হয় নতুন দোকান-পাট হয়েছে।

একে একে গাঁয়ের সবার কথাই তার মনে হতে লাগল আর তাকে দেখে সকলে কি বলবে, কেমন করে তাকাবে সে কথাটা ভাবতে গিয়ে তার ঠোঁটের কোণে মজার হাসি খেলে গেল। সেই সঙ্গে নিজের কৌতূহলও তার বড় কম নয়।...তা ছাড়া মা! মা কি তার বেঁচে আছে! বোনটার হয় তো এতদিনেও কোন গতি হয়নি। কে বিয়ে দেবে! ফুটো চাল, ফাটা হাঁড়ি, কে-ই বা মেয়ে নেবে সে ঘরের। তা বলে এতদিন কি আর বসে আছে, কিছু হয়তো হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি টিনের স্যুটকেসটা নিয়ে গেটের দিকে এগুল। ভেবেছিল বোধ হয় তাদের সেই পুরনো স্টেশন-মাস্টারই আছেন। তাই সে হাসতে হাসতে আসছিল। কিন্তু কাছে এসে দেখল একজন অন্য বাবু।

তবু সে টিকিটটা দিয়ে দু' হাতে স্যুটকেসটা কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'বাবু তো আমাকে চিনবেন না, নতুন মানুষ। কদ্দিন এয়েছেন এখানে বাবু?'

স্টেশন-মাস্টার একটু অবাক হয়ে নকুড়কে দেখলেন। কালো কুচ্কুচে বর্ণ, একহারা অথচ পেটানো শক্ত শরীর। গায়ের চেয়ে কয়েক পোঁছ কালো পাতলা জ্যাল্-জেলে কাপড়ের জামা, একটা সাদা প্যাণ্ট পরনে। পায়ে কালো জুতো, সেটিও বেশ

পালিশ করা। এক-মাথা ঘন কালো বাব্‌রি চুল।

দেখে-শুনে স্টেশন-মাস্টার বোধ করি অভক্তিতেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'এসেছি তো অনেক দিন। তা তুমি কে বটে?'

নকুড় মুখ ভরে হেসে বলল, 'আঁজ্ঞে আমি? আমি আপনার এই বেনাহাটির ননী দিগরের ছেলে ছিরি নকুড়চন্দর......' বলতে বলতে সে হঠাৎ থামল। দিগর হল তাদের পদবী। কিন্তু সে পদবী ছেড়ে তো সে নতুন পদবী নিয়েছে। তবু এক ঝটকায় বলতে আটকাল। পরে বলল, ছিরি নকুড়চন্দর গুণিন।

'দিগরের ছেলে গুণিন?' স্টেশন-মাস্টার বিদ্রূপে হেসে বললেন, 'গুণ-তুক শিখেছ বুঝি?'

'আজ্ঞে তাই। নইলে', পরম বিনয়ে হেসে বলল নকুড়, 'এই যেমন আপনার গে, রেলের ইঞ্জিন যারা চালায়, তাদের বলি আমরা ডেরাইবার। কিম্বা ধরেন—'

'হ্যাঁ, যেমন আমি আর হরেকেষ্ট পাল নই, শুধু স্টেশন-মাস্টার।' বললেন তিনি।

'ঠিক ধরেছেন বাবু। তাই হল আর কি।'

মাস্টারের মনটা খুশী হয়ে উঠল। বললেন, 'আচ্ছা গুণিন, তা হলে এস মাঝে মাঝে।'

'নিশ্চয় বাবু।' আর একদফা কপালে হাত ঠেকিয়ে স্টেশন থেকে নকুড় বেরিয়ে এল। মাস্টারের গুণিন বলে আমন্ত্রণে মনটা তার আরও চাঙ্গা হয়ে উঠল। মনে যে তার একটা ছোট কাঁটার খচ্‌খচানি ছিল, তা যেন কেটে গেল অনেকখানি। যতই শহুরে হও আর মাথা চাড়া দাও, গুণিনের কেরামতি মারতে পারে না কেউ।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে দেখল কয়েকটা সাইকল রিক্‌সা। একটু দূরে দুটো ঘোড়ার গাড়ী রয়েছে। রিক্‌সাওয়ালাদের কাউকেই সে চিনতে পারল না, ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানও চেনা দেখা গেল না। একপাশে একটা গরুর গাড়ীতে সে দেখল পালদীঘির কাশেম সওয়ারীর জন্য অপেক্ষা করছে।

কাশেম!......শালা উল্লুকের মত দেখছে, তার ল্যাংটাকালের বন্ধু নকড়েকে চিনতেও পারছে না! কাশেমেরও চেহারাটা অনেক বদলে গেছে।

সবাই তার দিকে তাকিয়েছিল। তাতে নকুড়ের বুকটা উঁচু হয়ে উঠল আরও খানিক, ঠোঁটের কোণে কষ্ট করে সে হাসিটা চেপে রাখল। গম্ভীর হয়ে বোধ করি

তার বেশ-বাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

সে সকলের দিকে দেখে কাশেমের দিকে এগিয়ে গেল।

কাশেম তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে বলল, 'কোথা যাবেন কত্তা?'

নকুড় চোখ পিট্-পিট্ করে হেসে উঠল খিল্‌খিল্ করে। কাশেমের বোকাটে মুখটার দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'এই দেখ, দেখ শালা আমাকে চিনতে পারলনি।' কাশেম তাড়াতাড়ি কাছে এসে আধা পরিচয়ের হাসি হেসে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে নিচ্ছিল বটে যে—'

'আমি তোর সোয়ারী, কত্তামানুষ?' নকুড় বলল।

কাশেম তবু দ্বিধা করে বলল, 'না, নকুড় তো তুমি?'

বলতে বলতে তারা দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল।

নকুড় বলে উঠল, 'চিনি চিনি মনে লয়, তুমি কি কুব্‌জার কাল বট হে?'

কাশেম বলল, 'ইস্, একটা যুগ গেল যে। সেই কবে গেছ।'

'আট বচ্ছর।' বলল নকুড়।

'সেই কি কম?' বলতে বলতে কাশেমের গলা গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'কত কি গেল, এল। কি দিন দেখে গেছলে, কি দিন হয়েছে। পাকিস্থান হিন্দুস্থানের ব্যাপার।'

'তাতে কি হয়েছে! তোমরা থাক না, কার কি বলার আছে।' বেশ ভারিক্কি গলায় বলে উঠল নকুড়। যেন সে-ই থাকতে দেওয়ার মালিক।

কাশেম একটু অবাক হয়ে নকুড়ের মুখের দিকে দেখল। না ঠাট্টা নয়, তবে নকুড়ের একথায় বিশেষ মনও নেই। বলতে হয় বলেছে।

ইতিমধ্যে আরও দু' চারজন এসে ভিড় করেছে তাদের কাছে। কিন্তু সকলেই নকুড়ের কাছে অচেনা।

কাশেম কয়েকজনকে দেখিয়ে বলল, 'এই তো, এরা তোমার ব্যানাহাটির লোক। ওই তো, তোমাদের পাড়ার কান্ত বাগ্‌দির ছেলে ললিত। চিনতে পারবে না এখন, বড় হয়ে গেছে। রিস্‌কা চালায়।'

'বটে, কান্ত খুড়োর ছেলে। ভারী জোয়ান হয়ে গেছে দেখছি।'

ললিত বিস্মিত হেসে দেখছিল নকুড়কে। আপনি বলবে, না তুমি বলবে বুঝতে

না পেরে বলল, 'শুনে আসছি ছোটকাল থেকে, অমুকে বিবাগী হয়ে গেছে। লোকে বলে নানান্ কথা। কেউ বলে লড়ায়ে গে মরে গেছে, কেউ বলে, ওই তো অমুক জায়গায় দেখে এয়েছি।'

নকুড় হো হো করে হেসে উঠল।

সকলেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তার প্যান্ট, জামা, জুতো, বাব্‌রি, তার কথা বলার ঢঙ্। টিনের নতুন স্যুটকেসখানিও বেশ। সকলেই ভাবল, বেশ দু' পয়সা কামিয়ে এসেছে নকুড়। সম্ভ্রম এবং সম্মানের পাত্র মনে হল। সকলেই তাকে নানান্ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সবই কাজের কথা। বাইরে কি রকম সুবিধা, কিছু করা টরা যাবে কি না ইত্যাদি।

নকুড় প্রায় এককথায় সবাইকে জবাব দিল, 'কাজ, সে তো ভাগ্যের কথা। যেখানেই যাবে, কপাল তো আর রেখে যেতে পারবে না। তবে, বাইরে গেলে মনে এট্টা জেদ আসে, বুইলে। তবে আমি......আমি তো ও সবের দিকে বড় এট্টা নজর দিইনি। আমি তোমার গে এক গুরুর কাছে কিছু মন্তর তন্তর শিখেছি। মানে......আসলে এক গুণিনের সাক্‌রেদি করেছি।'

কেউ কেউ ভড়কে গেল, কেউ কেউ হতাশ হয়ে গেল একেবারে নকুড়ের কথায়। কেউ কেউ তাকে রীতিমত একটা গুণিন ভেবে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

নকুড় আবার বলল, 'তবে কাজও করেছি। করেছি ভাই অনেক কিছু, সে সব পরে হবে। এখন আমি বাড়ী যাই।'

বলতে বলতে বেশ খানিকটা ভয়ে ও আগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমার মা বোনের খবরটা এট্টু বল তো তোমরা। সব বেঁচে-বর্তে আছে তো?

ললিত বলল, 'হ্যাঁ বেঁচে আছে। মা তো বুড়ি থুত্থুড়ি। কোনো কোনো দিন দুটো কল্‌মি হিংচে শাক বিক্কিরী করে, রেল নাইনে কয়লা কুড়োয়, ঘুঁটে দেয়। আর...'

ললিত থেমে গেল।

নকুড় বড় বড় চোখে হাঁদার মত চেয়ে রইল।

ললিত বলল, 'রাধা চলে গেছে, তোমার বোন।'

কোন কথা বেরুল না নকুড়ের মুখ দিয়ে। কেমন একরকম হতভম্ব হয়ে বেনা-হাটির রোদভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।......অবশ্য এখানে আসার আগে কেবলি তার ভাবনা হয়েছিল, হয় তো গিয়ে দেখবে মা-বোন দুটো মরে গেছে। ফিরে

গেলে গাঁয়ের লোকে বলবে, আহা এতদিনে এলি, সে দুটোকে দেখতে পেলিনে। আর ঘর তো নকুড় বড় সহজে ছাড়েনি। ঘরে ছিল না খুদ-কুঁড়ো। অতবড় দামড়া ছেলে নকুড় দু' পয়সা পারত না রোজগার করতে। কাজের আকাল সেদিনে এদিনে একই-রকম। নকুড় তার নিজের খেয়ালে ঘুরত ওঝা সাপুড়ের পিছে পিছে। ওই ছিল তার এক বাই। মা বলত, দূর দূর, বোনটার ছিল না বড়ভাই বলে একটা মান্যি।... তা ছাড়া বয়সকালে যা হয়। মনটা পড়ে গিয়েছিল হরিমতির উপর, ওই ললিতেরই দিদি, কান্ত খুড়োর মেয়ে। সে নিয়েও কত কথা। কত কথা কেন? না, দু' পয়সা রোজগার ছিল না নকুড়ের, তাই তো! নইলে হরিমতি আজ (কে জানে কার ঘরে আছে) নকুড়ের ঘর করত কিনা!

না, রোজগার নেই, সবাই টিট্‌কারি দিত, মা দিত ধিক্কার। একফোঁটা হরিমতিও ঠোঁট উল্‌টে বলত, 'না-কামানোর নোক কেন আবার বে করবে।'

সত্যি, একটা পোড়া বিড়ির জন্যও হাত পাততে হয়। ধু-র শালার জীবন, মরিবাঁচি করে সে বেরিয়ে পড়েছিল।

আজ যদি বা ফিরল ভরাট হয়ে, অন্যদিকে সবটাই প্রায় খালি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দু' পয়সা নিয়েই ফিরেছে নকুড়, গুণতুকও শিখেছে অনেক। সেটা লাভ হিসাবে অবশ্য অনেকখানি। কিন্তু আর কি আছে, বোনটাও ঘর ছেড়ে গেছে।

সে হঠাৎ রাগে চোখ পাকিয়ে বলল, 'কোন্ শালার সঙ্গে গেছে একবার বল দিকিনি, তাকে আমি কাটা পাঁঠার মত আমার পায়ের তলায় এনে মারি।'

যেন জানতে পারলে এখুনি বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলবে সে।

কিন্তু সে হদিস কেউই জানত না। সবাই তাকে সান্ত্বনা দিল, বলল, রাগ সামলাতে।

সে কথাও ঠিক। গুণিনের আবার যখন তখন মেজাজ গরম করতে নেই। গুরুর বারণ। তবু বুকটার মধ্যে ভারী টাটাতে লাগল নকুড়ের। ফিরে আসাটা যেন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ললিতের মনটা বিস্ময়ে ও সম্মানে অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েছিল নকুড়ের উপর। সে বলে উঠল, 'দাদা অত ভাবনার কূল নেই। ঘরে মা-টা তো রয়েছে। এ্যাদ্দিন বাদে এলে, আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। চল, গাঁয়ে চল।'

বলে সে স্যুটকেশটা নিয়ে তুলে ফেলল তার রিক্সায়।

মনটা আবার নকুড়ের এদিকে ফিরে এল। আবার একটু গুণিনের হাসি হেসে বলল, 'রিস্কাতে যাব নাকি? মস্ত বড় তিনটে খানা রয়েছে যে পথে।'

ললিত বলল, 'সে কবে বুজে দিয়েছে, পুল হয়ে গেছে না?'

'বটে?' ভারিক্কী চালে সবাইকে 'আসি ভাই', 'চলি গো' ইত্যাদি বলে রিক্সার উঠে বসল নকুড়। বসল বেশ পায়ের উপর পা দিয়ে।

সহরকে পশ্চিমে রেখে পুবে কাঁচা সড়কের উপর দিয়ে রিক্সা চলল।

রোদ ভরা সকাল, পরিষ্কার আকাশ। ঝিরঝিরে হাওয়ায় দিন যেন মন্থর মনোরম।

নকুড় বলল, 'কান্তখুড়ো কেমন আছে হে?'

'ওই আছে আর কি! থাকে থাকে যায় যায়। গেলেও তো হয়।' প্যাডেলে চাপ দিতে দিতে বলল ললিত।

বুড়ো রুগী ঘরে থাকলে অমনি কথাই বলে লোকে।

নকুড় কয়েকবার কাশল, ঢোক গিলল, পা দোলাল, তাকিয়ে দেখল ললিতের ঘাড় আর মাথাটা। তারপর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার দিদি...মানে হরিমতি, ওকে বে দিলে কোথা?'

ললিত সামনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই জবাব দিল, 'বে তো দিছেলাম পালদীঘির কালী মোড়লের ছেলের সঙ্গে। তা...'

হঠাৎ কথা পাল্টে বলল, 'এই, এই হল সেই খানা, এখন পুল হয়ে গেছে। জানলে দাদা, সে ব্যানাহাটি আর নেইকো।'

হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে নকুড় বোকার মত হাসতে হাসতে পুলটার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক পাল্টে গেছে।'

কিন্তু সমস্ত বেনাহাটি যেন হারিয়ে গেছে নকুড়ের কাছে। তাদের কথাও যেন হারিয়ে গেছে।

নকুড় কয়েকবার তাল ঠুকল রিক্সার গদীতে। বোধ হয় গুন্‌গুন্‌ও করল একটু। তারপর আবার বলল, 'তা কালী মোড়লের অবস্থা তো—'

'আর অবস্থা।' বলে উঠল ললিত, 'মোড়লের ছেলে মরে গেল, দিদি তো এখন আমাদের ঘাড়ে। ছেলে একটা হয়েছেল, সেটা মরে গেছে।'

নকুড়ের মনটা 'আহা' করে উঠতে গিয়েও হঠাৎ প্রাণটার কোথায় যেন খুসির

বাজনা বেজে উঠল। হঠাৎই বেনাহাটির আকাশ বাতাস বড় মিষ্টি হয়ে উঠল। মনে হল, হ্যাঁ বহুদিন বাদেই সে ফিরে আসছে গাঁয়ে। মায়ের জন্য ব্যাকুলতা, বোনটার জন্য দুঃখে ভরে উঠল মনটা।

পাড়ায় ঢুকতে না ঢুকতে রাষ্ট্র হয়ে গেল বিবাগী নকুড় গাঁয়ে ফিরেছে। আধকানা বুড়ি নকুড়ের মা তো ডুকরে চেঁচিয়ে কান্নাই জুড়ে দিল। একদিন যাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকেই আজ গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আর আশ মেটে না।

মুহূর্তে একথাও রটে গেল, নকুড় শুধু দু পয়সা কামিয়েই আসেনি, এসেছে এক মস্ত গুণিন হয়ে।

পাড়াটা ভেঙে পড়ল নকুড়দের উঠোনে। সোমত্ত মেয়ে-বউরাও ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে নিল নকুড়কে।

আশ্চর্য, নকুড় এত সুন্দর, এত গুণবান, এত বড় মানুষ।

কান্ত খুড়ো মনে মনে কপাল চাপড়ে বলল, কে জানত, এমন দিনও আসবে। একেই বলে বরাত।

বরাত বলে! নইলে মতি মোড়ল অমন নকুড়ের গা ঘেঁষে অত খাতির করে। মতির ঘরে আছে আইবুড়ো মেয়ে। নকুড়কে যদি রাজী করানো যায়, তা'হলে আর পায় কে?

নানান জনে নানান কথা বলল। কেউ কেউ তো তর্কবিতর্কেই গেল লেগে।

নকুড়ও কিছু অর্বাচীন নয়। সে রীতিমত দুরস্তভাবে জোড় হাতে হেসে নরম গলায় সবাইকে আপ্যায়ন করল এবং ঘোষণা করে দিল, 'এই দেখেন কান্তখুড়ো আছেন, মতিখুড়ো আছেন, আপনারা সবাই জানেন, জাতে তুমি দিগর হলে কি মস্তান হলে, সেটা বড় কথা নয়। গুণের একটা নাম আছে। আমাকে কিন্তুন পিথিমীর লোকে গুণিন বলেই জানে, নকুড় গুণিন।'

সবাই বলল, 'নিশ্চয়, গুণিনকে আমরা গুণিন বলব। ভাল ভাল।'

কিন্তু হরিমতি, হরিমতি কোথায়? আশেপাশে এত বউ ঝি, হরিমতি তো আসেনি। লজ্জায়ই হয় তো আসেনি সে। সেদিনের নকুড় একেবারে অন্য মানুষ হয়ে এসেছে, লজ্জা তো হবেই। শত হলেও সেদিনের অচ্ছেন্দাটা কি কম ছিল।

পরদিন সকালের ভিড় কাটলে দুপুরের ঝোঁকে এল হরিমতি।

নকুড় তখন খাওয়া শেষে বসে বসে পান চিবুচ্ছে। পরনে একখানি নতুন ধুতি। তেলে জলে ধোয়া চকচকে খালি গা, মাঝখানে সিঁথি কেটে বাবরি চুল আঁচড়েছে পাতা পেড়ে।

হরিমতিকে দেখে এক মুহূর্ত কথা সরল না নকুড়ের। আধা পরিচয়ের হাসিতে থমকে গেল সে।

মাজা মাজা রং হরিমতির, সেই কিশোরী শরীরটা লম্বায় চওড়ায় বেড়ে উঠেছে শুধু নয়, শক্ত পুষ্ট গায়ে তার রূপেরই বা কি বাহার হয়েছে! গায়ে জামা নেই, শাড়ীর রেখায় রেখায় শুধু শ্রী নয়, প্রাণ ভুলানো গমকের ওঠা নামায় তা অপূর্ব।...মুখে ঠাসা পান, ঠোঁট দুটি লাল টুকটুক করছে।...সেই ঠোঁটে ও স্থির চোখে তার বিচিত্র হাসি। কে বিধবা, তায় বাপের বাড়ী। মাথায় তার ঘোমটা নেই, টান করে বাঁধা আলগা চুল। কে বলবে এ মেয়ের বিয়ে হয়েছিল?

হরিমতিই হেসে বলল, 'চিনতে পারলেনি?'

চকিতে থম্‌ধরা ভাব কাটিয়ে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল নকুড়। বলল, 'খুব খুব চিনেছি। এস এস, বস এসে।'

হাসলে পরে বেঁকে ওঠে হরিমতির ঠোঁট। বলল, 'থাক্ থাক্, কুটুম তো লই, তুমি বস।'

নকুড় বসল, কিন্তু তার মনটা বসল না। আচমকা সব গুছনো বস্তু হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার মত মনটা এলোমেলো হয়ে গেল তার। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'মা মা, হরিমতি এসেছে গো।'

সে কথা শুনে মায়ের পিত্তি জ্বলে গেল ঘরের মধ্যে। একদিন যে ধিক্কার দিয়েছে নকুড়কে, আজ সেই ধিক্কারেই সোয়ামীখাগী হরিমতিকে মনে মনে গাল দিয়ে উঠল বুড়ি। শুধু রাগ নয়, ভয়ও হল, তার অমন ছেলের মাথাটা না আবার খারাপ করে ছুঁড়ি।

হরিমতি বসে পড়ল নকুড়ের অদূরেই। বলল, 'তুমি নাকি মস্ত গুণিন হয়ে এয়েছ?'

নকুড় হরিমতির দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি এবং বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। কোথায় লজ্জা হরিমতির মুখে। দিব্যি ঠোঁট টিপে বাঁকা হেসে কথা বলছে। চোখের কোণে অপলক। জড়তাহীন স্বচ্ছন্দ ভাব।

নকুড় বলল, 'মস্ত আর কি, তবে একটু আধটু শিখেটিখে এয়েছি।'

হঠাৎ ঘাড় বাঁকিয়ে হরিমতি বলে উঠল, 'আমিও কিন্তু মস্ত গুণিনী হয়েছি, সত্যি।'

ঠাট্টা না সত্যি, নকুড় বুঝতে পারল না হরিমতির মুখ দেখে। হ্যাঁ, সেদিনের কিশোরী হরিমতির মুখে চোখেও অনেক কথা ফুটে বেরুত। আজও তার সারা মুখে চোখে যেন কত কথা, কিন্তু সবই ধাঁধার মত রহস্যময়ী মনে হল নকুড়ের। টিপে টিপে হাসে, ঠেরে ঠেরে দেখে।

নকুড় তাড়াতাড়ি বলল, 'সে তা'লে আমারই কপাল। গুরু ছেড়ে এয়েছি, নতুন গুরু পেলাম। তোমার শিষ্যি করে নিও আমাকে।'

হরিমতি বলল, 'গুরু যেমন আপনি পাওয়া যায়, শিষ্যিও তেমনি আপনি হবে, অবিশ্যি শিষ্যির মতন শিষ্যি হলে।'

'বটে? তবে পরখ করে নেও।'

'করব।' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল হরিমতি। বলল, 'পেরায় আগের মতনই আছো বাপু।'

'তুমি কিন্তুন বদলে গেছ', নকুড় বলল।

'তা গেছি।' বলে চকিতে যেন নকুড়ের বুকের শেষ অবধি দেখে হরিমতি বলল, 'তা'পর বে টে করবে তো?'

কেবলি কথা আটকায় নকুড়ের গলায়। বলল, 'তা মেয়ে পেলে—'

'ও মা! মেয়ের কি এ সম্‌সারে অভাব?'

'না। কিন্তুন মনের মানুষের অভাব।'

আবার হরিমতি হেসে উঠল খিলখিল করে। মনের মানুষ!......

কিন্তু হরিমতিও হঠাৎ চুপ করে গেল।

নকুড় সমস্ত আড়ষ্টতা কাটিয়ে স্থির দৃষ্টিতে হরিমতির দিকে তাকাল।

হরিমতি বলল, 'কি দেখ?'

'দেখি তোমাকে।'

এক মুহূর্ত সমস্ত হাসি মস্করা উবে গেল হরিমতির মুখ থেকে। পরে হেসে বলল, 'তুমি তেমনি আছ। কেন লোকে বলে তুমি পাল্‌টেছ?'

'লোকে বলুক। তোমার কাছে তো পালটাইনি।'

এবার হরিমতি হাসতে হাসতে উঠে পড়ল। কিন্তু বাড়ীর বাইরে এসে এলো-

মেলো মনটা নিয়ে সে বড় ফাঁপরে পড়ে গেল। দ্রুত নিশ্বাসে বুকটা দুলে উঠল, চলার গতিতে তার উদ্ধত স্তব্ধ যৌবন যেন আচমকা আজ নেচে নেচে উঠল।

দম ভারী হয়ে গেল নকুড়ের। আচমকা ঝড়ের মত এসে হরিমতি তার আটঘাট বাঁধা মনটাকে খুলে ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে দিয়ে গেল। হরিমতির আশা নিয়ে সে ফেরেনি গাঁয়ে সত্যি, কিন্তু তাকে এসে এমনটি দেখবে তাও আশা করেনি। আর যদি দেখল, তবে হরিমতির মনের হদিস পেল না শুধু নয়, অর হাবভাব দেখে তার বুকটাতে জমাট বেঁধে উঠল ব্যথা আর অস্বস্তি। মন তার হরিমতির পিছে পড়ে রইল। কিন্তু লোকজন বন্ধুবান্ধবের হাত থেকে তার রেহাই নেই। সকালে বিকালে তাকে অনেকে ঘিরে থাকে। সে যে গুণিন। বহুজনের বহু প্রার্থনা। এ এটা চায়, সে ওটা চায়।

সে কাউকে মাদুলি দেয়, জলপড়া দেয়। তবু রোগের ঝামেলার চেয়েও বেশী আসে সব অন্য ফিকিরে। বলে, বশীকরণ শিখিয়ে দাও। আর বশীকরণের ব্যাপারটা এমনই ছোঁয়াচে যে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, মহকুমা জেলায় পর্যন্ত যেন বাতাসের আগে খবর ছড়িয়ে পড়ে।

ছেলে বুড়ো নেই, মেয়ে পুরুষ নেই, সকলের সব কথা শোনে নকুড়। বিধি ব্যবস্থা বাতলে দেয়। হরিমতির ভাই ললিতও বশীকরণের বিধি চায়।

গুণিন গম্ভীর হয়ে ব্যবস্থা দেয়, পেথমে ছোট পেতলের বাটিতে একটু তেল নেবে। সে তেল আমি দেব, গুণ তেল। নেয়ে শুদ্ধ হয়ে না খেয়ে ভোরবেলা পুবমুখো বসবে। সামনে তেল রেখে, সূর্যের দিকে চেয়ে এক হাজার আটবার এই বলবে—

বলে এক মুহূর্ত থেমে হাত পেতে বলে, 'সোয়া পাঁচ আনা পয়সা দেও।' পয়সা পেলে বলে, 'বলবে,—

শিবঠাকুরে পাথর ঘষে,
গৌরী ছোটে কৈলাসে।
বাঁশী বাজায় কেষ্ট বসে,
আয়ানের বউ ছুটে আসে।
আমি ভূতের মাথার ঘিলু নিয়ে
ছিটা দিলাম অমুকের গায়ে।

হরিমতি শুকোয়। চোখের কোল বসে যায়। তবু হা পিত্যেশে বসে থাকা নকুড়ের কাছে এসে আবার তেমনি হাসে। নকুড়ের মা তো হাড়েমাসে জ্বলে যায়। ছেলেকে বিয়ের তাড়া দেয়।

নকুড় অন্য লোককে জিজ্ঞেসাবাদ করে, 'হরিমতির কোন দোষ টোষ আছে নাকি?'

জবাব পায়, চাল দেখে বুঝতে পার না?

চাল দেখে? হ্যাঁ, তা ধন্দ তো খানিকটা লাগেই নকুড়ের মনে।

কয়েক মাস কেটে গেল। নকুড় ঘোরে এখানে সেখানে। স্টেসন মাস্টারের সঙ্গে ভারী ভাব জমেছে। সেখানে নানান্ কথায় সময় কাটায়। মাস্টারের বন্ধ্যা বউ আবার তার কাছ থেকে মাদুলি নিয়েছে।

মাস্টার বলেন, 'সবই বুঝলাম গুণিন। তা একটা গুরু ঠিক কর, মানে প্রাণের গুরু হে। নইলে সব যে ভেস্তে যাবে।'

মাস্টার তার বউকে দেখিয়ে বলেন, এই যে আমার গুরু। এ গুরু যদি না ঠিক ধরতে পার, তবে গুণিনের মন যে আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে।'

বাঃ মাস্টার এত গুণের কথাও বলতে পারে? শুনে নকুড়ের মনটা আরও বেদনায় যন্ত্রণায় ব্যস্ততায় ভরে ওঠে। সে স্থির করে ফেলে, এবার বলেই ফেলবে সে হরিমতিকে তার প্রাণের কথাটা।

সেদিনও যখন হরিমতি এল, নকুড় মন স্থির করে ভাল করে তাকাল তার দিকে। শরীরটা ভারী শুকিয়ে গেছে হরিমতির কিন্তু হাসির ধার তাতে কমেনি, বরং বেড়েছে। তার বাঁকা ঠোঁটের পাশে হাসি যেন তিক্ত হয়ে উঠেছে খানিকটা। তার অপলক চোখে, কথায় লাঞ্ছনার ছায়া।

নকুড় বলল, 'ভারী শুকেঁ গেছ।'

'যাব না। তোমাদের মত গুণিন গাঁয়ে থাকলে আর কি হবে?'

'কেন কেন?'

হরিমতি বলে ফেলল, 'আমাকে এট্টুস্ মন্তর শিখে দেও না?'

'কিসের?'

'বশীকরণের।'

চকিতে নকুড়ের বুকটা পাথরের মত জমে গেল। কথা বেরুল না তার মুখ

দিয়ে। যেন চোখের সামনেই কেউ তার হৃৎপিণ্ডটা খুলে নিয়ে ঘেঁটে চটকে ফেলেছে। বলল, 'বশীকরণের। কেন?'

হরিমতি তেমনি হেসে বলল, 'মরণ আমার! পীরিত হয়েছে, বুঝেছ? সে মিনসের কোন রীতি বুঝি না আমি, দেও দিনি এট্টু কিছু।'

হরিমতির পীরিতের সে বস্তু আবার দিতে হবে নকুড়কেই? নকুড় বলল, 'তুমিও তো গুণিনী।'

'আমি তো পারলুমনি বাপু।' হাসির ছটায় যেন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠল হরিমতির মুখ।

সব, সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে গেছে নকুড়ের, ছিঁড়ে গেছে মনের সব আঁট-ঘাট। কিছুক্ষণ সে কথা বলতে পারল না। তার চোখে হঠাৎ রক্ত উঠে এসেছে, দপ্ দপ্ করছে মাথার শিরাগুলি। মনের গুমুরানি ফুটে উঠল তার শক্ত পেশীগুলিতে। বলল চিবিয়ে ফিস্ ফিস্ করে, 'দেব, দেব মন্তর। থাকল আমার মনে, তুমি যাও।'

'নকুড়ের সে মুখ দেখে ভয় পেল হরিমতি।' বলল, 'রাগমাগ করলে নাকি বাপু?'

'রাগ?' হেসে বলল নকুড়, 'আমার কাছ থেকে বশীকরণ শিখবে, রাগ করব কেন?'

তবু মনটায় ভারী অস্বস্তি নিয়ে গেল হরিমতি। গুণিনদের মাথায় কি আছে? এ সম্সারের মানুষদের কি ওরা চোখ চেয়ে একটু দেখতেও পায় না! গুণতুক ছাড়া কি আর কিছু নেই? পোড়াকপাল, বশীকরণের গুণেই যদি কিছু ঠাওর না পেল।

কিন্তু অদ্ভুত উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল নকুড়। তারই দেওয়া বস্তু দিয়ে নিজের জীবন ভরবে হরিমতি? না, তার আগে নকুড় নিজের জন্যই সে বস্তু আনবে। তার আগে সে-ই হরিমতিকে বাঁধবে আষ্টেপৃষ্ঠে। সে আর হেলাফেলার জিনিষ নয়। একেবারে আসল অস্ত্রই ছাড়বে সে। যক্ষ রক্ষ দত্যি দানো, যে-ই হও, কেউ ঠেকাতে পারবে না নকুড়কে।

দুদিন বাদেই অমাবস্যা এল।

নকুড় বেশখানিকটা সিদ্ধি খেয়ে ভাম্ হয়ে রইল। তারপর মাঝরাত্রে নিশ্চুপে কোদালখানা নিয়ে গাঁয়ের বাইরের পথ ধরল।

ঘুটঘুটে কালো রাত। অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। মনে হয় প্রতিমুহূর্তেই যেন কারা আশেপাশে উপরে নীচে যাওয়া আসা করছে। গাছগুলো যেন ওৎপাতা ভূতের মত আছে দাঁড়িয়ে। বিদ্ঘুটে নৈঃশব্দ্যকে ছাপিয়ে থেকে থেকে শেয়াল ডেকে উঠছে।

নকুড় হন্ হন্ করে এসে হাজির হল বেনাহাটি ও পানদীঘি গাঁয়ের সীমানায়। পানদীঘির কোল ঘেঁষে গোরস্থান। অদূরেই মস্ত দীঘি। দুদিকেই দিগন্ত-বিস্তৃত তেপান্তর অন্ধকার প্রেতের মত ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে আছে।

মুহূর্তে নিজেকে বিবস্ত্র করে নকুড় একটা মাস কয়েক আগের গোরে কোপ দিল।...অমনি মনে হল কারা যেন দুড়দাড় করে পালিয়ে গেল ছুটে।

কিন্তু নকুড় থামল না। সে কুপিয়ে চলল ঝপ্ ঝপ্ করে। আর কি সব বিড় বিড় করতে লাগল। তার সারা গায়ে ঘাম ফুটে বেরুল।

শেয়াল ডাকছে, কাঁদছে বুঝি বা শকুনের বাচ্চা।

কোদাল ঠক্ করে উঠল। পাওয়া গেছে! তাড়াতাড়ি নকুড় দু' হাতে মাটি সরিয়ে ফেলতেই কি যেন ঠেকল হাতে নরম আর ভেজা।—এঃ, টুকরো টুকরো মাংস লেগে থাকা কঙ্কাল। কিন্তু কংকাল যেন নীরবে হাসছে!...

কে যেন হেসে উঠল উপর থেকে খিল্‌খিল্ করে। হরিমতি! হরিমতি হাসছে! মাটির তলা থেকে চকিতে ফিরে দেখল নকুড়।...না কেউ নেই।

সে প্রাণপণ শক্তিতে কঙ্কালের কব্‌জিতে চাড় দিল। কিন্তু চকিতে তার মনে হল, একি করল সে? সে ফিরে তাকাল? তবে কি সব পণ্ডশ্রম হল!

এবার কঙ্কালও হা হা করে হেসে উঠল। উপর থেকে বার বার ডাকতে লাগল হরিমতি।...নকুড় দাদা, নকুড় দাদা।...একি করল সে? বার বার খালি একই কথা মনে হতে লাগল। তবু মট্ করে হাড় ভেঙে ফেলল সে কঙ্কালের কব্‌জি থেকে কনুই পর্যন্ত।

কিন্তু চারদিকে তার বিচিত্র হাসির কলরোল। কারা যেন তাকে ঘিরে ফেলে নাচছে।

সে লাফ দিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু পা হড়কে যেতে লাগল, আছাড় খেতে লাগল বার বার।

কোন রকমে যেই উঠল, অমনি হরিমতি তাকে পেছন থেকে স্পর্শ করে ডাকাল।

চম্‌কে সে পিছন ফিরল।...কিন্তু কোথায় হরিমতি!...আবার...আবার ভুল!

তাড়াতাড়ি দম আটকে সে ছুটে গেল দীঘির ধারে। নিস্তরঙ্গ কালো জল, তারার ছায়ায় চক্‌ চক্‌ করছে।

আবার ডাকছে হরিমতি!...জলে লাফ দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত চমকাল নকুড়। তখন আর দম্‌ থাকছে না। তার ভয় করছে। তার ভুল হয়েছে, সে পেছন ফিরেছে।

দত্যি-দানোর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে এসে সে নিজেই অন্ধকারে একটা উদম ন্যাংটো প্রেতমূর্তি যেন।

ঝপ্‌ করে জলে ল্যাফিয়ে পড়ল নকুড় হাড় শুদ্ধ। কিন্তু সেখানেও হাসি, সেখানেও হরিমতি। নকুড় পাড় খুঁজতে লাগল। যত খোঁজে, তত তলিয়ে যায়। কোথাও পাড় নেই।

কিছুক্ষণ বাদে দীঘির জল স্থির হয়ে গেল। কেবল এক জায়গায় কতগুলি বুদ্‌বুদ্‌ উঠে গেল মিলিয়ে।

নকুড় আর উঠল না।

পরদিন খানিক বেলায় গুণিনের মৃতদেহ যখন ভেসে উঠল দীঘির জলে, তখন লোকজন ছুটে গেল সেখানে। দেখল সবাই অদূরে মাটি খোঁড়া কবরের পাশে পড়ে আছে একটা কোদাল।

সবাই বলল, দানোয় মেরেছে চুবিয়ে গুণিনকে।

কেবল হরিমতি জলভরা চোখে ঘরের ছেঁচে আকাশের দিকে মুখ করে হাহাকার করে উঠল, গুণিন, তুমি হরিমতির মন বুঝলে নি। ও ছাই বস্তু কে চেয়েছিল। আবার যে জীবনে বাঁচতে চেয়েছেলাম, তুমি তা দিলেনি—দিলেনি।

প্রাণ-পিপাসা

এক কৃষ্ণপক্ষের দুর্যোগময়ী রাতের কথা বলছি।

দুর্যোগটা হঠাৎ মেঘ করে হাঁক ডাক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে মুষলধারে দু-এক পশলা হয়ে যাওয়ার মত নয়। একঘেয়ে রুগ্ন গলার কান্নার মত কয়েকদিন ধরে অবিরাম ঝরছেই বৃষ্টি, তার সঙ্গে পুব হাওয়ার একটানা ঝড়। শহরতলীর বড় সড়কটি ছাড়া আর সব কাঁচা গলিপথগুলো সুদীর্ঘ পাঁক ভরা নর্দমা হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধ আর আবর্জনায় ছাওয়া। অসংখ্য বাড়ির ভিড়, ঠাসা, চাপাচাপি।

পথ চলছিলাম রেল লাইনের ধারে মাঠের পথ দিয়ে। কিন্তু ভিজে ভিজে শরীরের উত্তাপটুকু আর বাঁচে না। হাওয়াটা মাঠের উপর দিয়ে সরাসরি এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল শরীরটা। রীতিমত দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। বেগতিক দেখে বাঁয়ে মোড় নিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। অন্ততঃ হাওয়ার ঝাপ্‌টাটা কম লাগবে তো!

একটা নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে পড়া ভাব চটকল শহরটার। যেন কাজ এবং চাঞ্চল্য সবটুকু এই অবিরাম বৃষ্টি ভিজিয়ে ন্যাতা করে দিয়েছে। কুকুরগুলো অন্যদিন হলে বোধহয় তেড়ে এসে ঘেউ ঘেউ করত। আজ দায়-সারা গোছের এক-আধবার গড়গড় করে গায়ের থেকে জল ঝাড়তে লাগল। গেরস্থদের তো কোন পাত্তাই নেই। কোন জানলা দরজায় একটি আলোও চোখে পড়ে না। রাস্তার আলোগুলো যেন কানা জানোয়ারের মত স্তিমিত এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে, কিন্তু অন্ধকার তাতে কমেনি একটুও।

রাস্তাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, তবে উত্তরদিকেই চলেছি তা বুঝতে পারছি। একটা ধার ঘেঁষে চলেছি রাস্তার। নীচু রাস্তা, জল জমেছে। কোন বারান্দায় যে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেব তার কোন উপায়ই নেই। কারণ বারান্দা বলতে যা বোঝায়, এখানে সে-রকম কিছু ঠিক চোখেও পড়ছে না আর বস্তিগুলোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভেতরে ঘরগুলোও বোধ হয় শুকনো নেই। তা ছাড়া, অবস্থাটা তো নতুন নয়। জানা আছে, যেখানে শুয়ে পড়লে লোকজনেও নানান্‌খানা বলতে পারে। পুলিসের বেয়াদপি তো আছেই তার উপর।

যেতে হবে নৈহাটি রেল কলোনীর এক বন্ধুর কাছে। অন্ততঃ কয়েকটা দিনের খোরাক, শুক্‌নো কাপড় একখানি আর এমন বিদ্‌ঘুটে প্যাঁচপেঁচে ঠাণ্ডা রাতটার জন্য একটু আশ্রয় তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আড্ডা ছেড়ে না বেরুনোই ভালো ছিল। তবে উপায় ছিল না। বিশেষ করে, কয়েকদিন আগে আমাদের আড্ডার হা-ভাতে বন্ধুদের মধ্যে একজন যখন মরে গেল, তখন থেকেই একটু নিশ্বাস নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ব ভাবছিলাম। বন্ধুটির মরা হয় তো ভালোই হয়েছে। তা ছাড়া আর কি হতে পারত আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। বাঁচার জন্য যা দরকার তার কিছুই তো ছিল না, তবু বুকটার মধ্যে...যাক্‌। ওটা কোন কথা নয়। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়ে গেছে, ছোট্ট জিনিস অথচ মনে হয় পর্বতপ্রমাণ তার ভার আর কষ্টকর। বোঝাটা হল......

আরে বাপ রে, হাওয়াটা যেন শিরদাঁড়াটার ভিত্‌ ধরে নাড়া দিয়ে দিয়ে গেল। জলটাও বেড়ে গেল হঠাৎ। এতক্ষণ পরে মেঘের গড়গড়ানিও যাচ্ছে শোনা। এবার আর দাঁত নয়, রীতিমত হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। গাছের মরা ডালের মত ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গেছি। এসে পড়লাম একটা চৌরাস্তার মোড়ে, চটকলের মাল চালানের রেল সাইডিং-এর পাশে। জায়গাটা একটু ফাঁকা। কাছাকাছি একটা মোষের খাটাল দেখে ঢুকব কি না ভাবতে ভাবতে আর একটু এগুতেই হঠাৎ একটা ডাক শুনতে পেলাম, এই যে, এদিকে।

না, অশরীরী কিছু বিশ্বাস না করলেও ভয়ানক চম্‌কে উঠলাম। আমাকে নাকি? জলের ধারা ভেদ করে গলার স্বরের মালিককে খুঁজতে লাগলাম। ডানদিকে একটা মিটমিটে আলোর রেশ চোখে পড়ল আর আধ ভেজানো দরজায় একটা মূর্তি। হ্যাঁ, মেয়েমানুষ। তাহলে আমাকে নয়। এগুচ্ছি। আবার, কই গো, এসই না।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে?

জবাব এল, তাছাড়া আর কে আছে পথে?

কথার রকমটা শুনে চম্‌কে উঠলাম। ও! এতক্ষণে ঠাওর হল পথটা খারাপ। ঠিক বেশ্যাপল্লী নয়, তবে এক রকম তাই, মজুর বস্তিও আছে আশেপাশে ধার ঘেঁষে।

আমি মনে মনে হাসলাম। খুব ভালো খদ্দেরকে ডেকেছে মেয়েটা। তাই ভেবেছে নাকি ও? কিন্তু সত্যি, এ সময়টা একটু যদি দাঁড়ানোও যেত ওর দরজাটায়।

তবু আমাকে যেতে না দেখে মেয়েটা বলে উঠল, কিরে বাবা, লোকটা কানা নাকি? মনে মনে হেসে ভাবলাম, যাওয়াই যাক না। ব্যাপার দেখে নিজেই সরে পড়তে বলবে। আর কোনরকমে বৃষ্টির বেগটা কমে আসা পর্যন্ত যদি মাথার উপরে একটু ঢাকনা পাওয়া যায়, মন্দ কি। এমনিতেও নৈহাটী দূরের কথা, মোষের খাটালের বেশী কিছুতেই এগুনো চলবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম প্রবাদে যারা বিশ্বাস করে না তারা এ রকম অবস্থায় কখনো পড়েনি।

উঠে এলাম মেয়েটার দরজায়। একটা গতানুগতিক সংকোচ যে না ছিল তা নয়। বললাম, কেন ডাকছ?

কোন্ দেশী মিন্‌সে রে বাবা। হাসির সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বলল সে, ভেতরে এস না।

আমি ভিতরে ঢুকতেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির শব্দটা চাপা পড়ে গেল একটু। হাওয়াটা আসবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু দেখলাম, এ ঘরের মেঝে ও টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ভিজে গেছে। তক্তপোষের বিছানাটা ভেজেনি। ঘরের মধ্যে আছে দু-চারটে সামান্য জিনিস থালা গেলাস কলসি।

কোথায় মরতে যাওয়া হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে? এমনভাবে বলল সে যেন আমি তার কতকালের কত পরিচিত।

বললাম, অনেক দূর, কিন্তু—

বুঝেছি। মুখ টিপে হাসল সে। ঘরটা তুমি একেবারে কাদা করে দিলে। এগুলো ছেড়ে ফেলো জল্‌দি।

ঠাণ্ডায় আর আচমকা ফ্যাসাদে রীতিমত জমে যাওয়ার যোগাড় হল আমার। বললাম, কিন্তু এদিকে—

সে বলে উঠল, কী যে ছাই পরতে দিই! ভেজা জামাটা খুলে ফেলো না।

ফেলতে পারলে তো ভালোই হয়। কিন্তু...গলায় একটু জোর টেনে বলেই ফেললাম, মিছে ডেকেছ, এদিকে পকেট কানা।

এবার মেয়েটা থম্‌কে গেল। যা ভেবেছি তাই। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল, কিছু নেই?

তার সমস্ত আশা যেন ফুৎকারে নিভে গেছে, এমন মুখের ভাবখানা।

বললাম, তা হলে আর দুর্যোগ মাথায় করে পথে পথে ফিরি?

মেয়েটা অসহায়ের মত চুপ করে রইল। এ তো আমি আগেই জানতাম। কিন্তু মেয়েটা এখানে ব্যবসা করতে বসেছে, না, ভিক্ষে করতে বসেছে। আমি দরজাটা খুলতে গেলাম।

পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে এখন?

বললাম, ওই মোষের খাটালটায়। দরজাটা খুলে ফেললাম। ইস্! হাওয়াটা যেন আমাকে হাঁ করে খেতে এল। পা বাড়িয়ে দিলাম বাইরে।

মেয়েটা হঠাৎ ডাকল পেছন থেকে, কই হে, শোন। রাত্তিরটা থেকেই যাও, ডেকেছি যখন। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কপালটাই খারাপ আমার।

বললাম, কেন, কপালটা ভালোই থাকুক তোমার। আমি খাটালেই যাই।

যা তোমার ইচ্ছে। হতাশভাবে বসে পড়ল সে তক্তপোষে।—আজ তো আর কোন আশাই নেই।

ভাবলাম, মন্দ কি? এই দুর্যোগে এমন আশ্রয়টা যখন পাওয়াই যাচ্ছে, কেন আর ছাড়ি। কিন্তু মেয়েমানুষের সংগে রাত কাটানোটা ভারী বিশ্রী মনে হল। কেননা, এটা একেবারে নতুন আমার কাছে। অবশ্য মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল তোমাদের আর দশ জনের চেয়ে হয় তো একটু বেশীই আছে। তা বলে এখানে? ছি ছি! সে আমি পারব না।...তবে ওর সংগে না শুয়েও রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

লম্বা ছেয়ালো গড়ন মেয়েটার। মাজা মাজা রং। গাল দুটো বসা, বড় বড় চোখ দুটো অবিকল কচি ঘাস সন্ধানী গোরুর চোখের মত। ওই চোখে মুখে আবার রং কাজল মাখা হয়েছে। মোটা ঠোঁট দুটোর উপরে নাকের ডগাটা যেন আকাশমুখো।

খুঁজে খুঁজে সে আমাকে একটা পুরনো সায়া দিল পরতে, বলল এইটে ছাড়া কিছু নেই।

সায়া? হাসি পেল আমার। যাক্, কেউ তো দেখতে আসছে না। কিন্তু—

ধুক করে উঠল আমার বুকটার মধ্যে। তাড়াতাড়ি পকেটে চাপ দিলাম

আমি। মরবার সময় আমার বন্ধু যে ছোট্ট জিনিসটা পর্বতের বোঝার মত চাপিয়ে দিয়ে গেছে সেটা দেখে নিলাম। জিনিস নয়, একটা রক্তের ডেলা। হ্যাঁ, রক্তের ডেলাই। ভীষণ সংশয় হল আমার মনে। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সে তখন পেছন ফিরে জামার ভিতরে বডিস্ খুলছে। বললাম, কিছু কিন্তু নেই আমার কাছে, হ্যাঁ!

ক-বার শোনাবে বাপু আর ওই কথাটা? সে হতাশভাবে বলল।

হ্যাঁ বাবা। বললাম, বলে রাখা ভালো। তবে আমার কোন ইচ্ছে নেই কিছু। খালি মুসাফিরের মত রাতটা কাটিয়ে দেওয়া।

মেয়েটা ওর গোরুর মত চোখ তুলে এক দৃষ্টে দেখল আমাকে। বলল, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে?

তা বটে। আমি সায়াটা পরে নিলাম। কিন্তু খালি গায়ে কাঁপুনিটা বেড়ে উঠল। বাইরে জল আর হাওয়ার শব্দ দরজাতে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলে দিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে একপ্রস্থ হেসে নিয়ে একটা পুরনো সাড়ী দিল ছুঁড়ে। নাও, গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

বলে আমার জামা কাপড় দড়িতে ছড়িয়ে দিল। বলল, একটু আঁসিয়ে যাবে খন।

আরাম জিনিসটা বড় মারাত্মক, বিশেষ এরকম একটা দুরবস্থার মধ্যে। আমি প্রায় ভুলেই গেলাম যে, আমি একটা বাজারের মেয়েমানুষের ঘরে আছি। বললাম, পেটটা একেবারে ফাঁকা দু-দিন ধরে, তাই এত কাবু করে ফেলেছে জলে।

সে কোন জবাব দিল না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইল। বললাম, তাহলে শোয়া যাক্!

সে মুখ তুলল। মুখটা যন্ত্রণাকাতর, তার সুস্পষ্ট বুকের হাড়গুলো নিশ্বাসে ওঠানামা করছে। বলল, খাবে? ভাত চচ্চাড়ি আছে।

ভাত চচ্চাড়ি? সত্যি, এটা একেবারেই আশাতীত। ভাতের গন্ধেই যার অর্ধেক পেট ভরে, তার সামনে ভাত। জিভটাতে জল কাটতে লাগল আর পেটটা যেন আলাদা একটা জীব। ভাত কথাটা শুনেই ভেতরটা নড়ে চড়ে উঠল। কিন্তু—

সে ততক্ষণ টিনের থালায় ভাত বাড়তে শুরু করেছে। দেখে, আমার মনের সংশয়টা আবার বেড়ে উঠল। আমি দড়ির উপর থেকে জামাটা তুলে নিলাম তাড়াতাড়ি। গতিক তো ভালো মনে হচ্ছে না। সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, ভাতের পয়সা-টয়সা কিন্তু নেই আমার কাছে।

গোরুর মত চোখ দুটোতে এবার বিরক্তি দেখা গেল। বলল, মোষের খাটালই তোমার জায়গা দেখ্‌ছি। ক-বার শোনাবে কথাটা।

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। হতভাগা মরবার সময় এমন জিনিসই দিয়ে গেল, এখন সেই বোঝা নিয়ে আমার চলাই দায়। রাখাও বিষ, ছাড়াও বিষ। বাইরে পড়ে থাকলে এ বোঝাটার কথা হয় তো মনেই থাকত না। সে আবার বলল, মানুষের সঙ্গে বাস করনি তুমি কখনো?

শোন কথা। তাও আবার জিজ্ঞেস করছে কারখানা বাজারের মেয়েমানুষ। বললাম, করেছি, তবে তোমাদের মত মানুষের সঙ্গে নয়।

সে নিশ্চুপে তাকিয়ে রইল আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর বলল, রয়েছে যখন খেয়ে নাও, নইলে নষ্ট হবে। ভেবে দেখলাম, তাতে আর আপত্তি কি? বিনা পয়সায় ভাত। আর দেখ্‌ছেই বা কে। জামাটা হাতে গুটিয়ে নিয়ে গপ্‌ গপ্‌ ক'রে ভাত খেয়ে নিলাম, তারপর এক ঘটি জল। এ রকম বাড়া ভাত খেয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে চূড়ান্ত বাবুগিরি বলে মনে হল আর সেই জন্যই সংশয়টা বাঁধা রইল মনের আষ্টেপৃষ্ঠে।

তারপর শোয়া। সে এক ফ্যাসাদ। আমি শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি শোবে কোথায়? সে নিরুত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে খসা ঘোমটাটা টেনে দিল। তাহলে তুমি শোও, আমি বসে রাতটা কাটিয়ে দিই। আমি বললাম।

সে পাশতলার দিকে বসে বলল, তুমিই শোও. আমি তো রোজই শুই। একটা রাত তো। ডেকেছি যখন......

বলতে বলতে আমার হাতের মুঠির মধ্যে জামাটা দেখে সে দড়ির দিকে দেখল। তারপর আমার দিকে। আমিও তাকিয়েছিলাম। বলল, জামাটা ভেজা যে।

হোক। তাতে তোমার কি?

চুপ করে গেল সে। শরীরটা আরাম পেয়ে আমার মনে হল সিটনো তন্দ্রী-

গ্নলো স্বাভাবিক সতেজ ও গরম হয়ে উঠছে। বাইরের যে জল-হাওয়া আমাকে এতক্ষণ মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তারই চাপা শব্দ যেন আমার কাছে ঘ্নমপাড়ানির গানের মত মিষ্টি মনে হল। চোখের পাতা ভারী হয়ে হয়ে এল বেশ।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তেমনি বসে আছে। চোখের দ্নষ্টিটা ঠিক কোন্‌দিকে বোঝা যাচ্ছে না। অত্যন্ত ক্লান্ত আর একটা চাপা যন্ত্রণার আভাস তার চোখে। কি জানি! এদের নাকি আবার ঢং-এর অভাব হয় না। হয় তো ঘ্নমিয়ে পড়ব, তখন—

নাঃ হতভাগার এ জিনিসটার একটা ব্যবস্থা আমি কালকেই করে ফেলব। কী দরকার ছিল মরবার সময় আমাকে এটা দিয়ে যাওয়ার? একটা রক্তের ডেলা! রক্তের ডেলাই তো! ঘামের গন্ধে ভরা ছোট্ট ন্যাকড়ার প্নটলিটা। একটা রাক্ষ্নসে খিদে খিদে গন্ধও আছে। ছোঁড়া মরতে মরতে ম্নখের কষ বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলল, এটা তুই রাখ্‌।

এমনভাবে বলেছিল কথাটা যে, আজও মনে করলে ব্নকটার মধ্যে—; যাক সে কথা।

মেয়েটা তখনও ওইভাবে বসে আছে দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম, তুমিও শ্নয়ে পড় খানিকটা তফাৎ রেখে।

সে আমার ম্নখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, ছিষ্টিছাড়া মান্নষ বাবা।

তারপর শ্নয়ে পড়ল।

আমার শরীরটা তখন আরামে রীতিমত ঢিলে হয়ে এসেছে। আর মেয়েমান্নষের গা যে এত গরম তা মেয়েটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে থেকেও আমি ব্নঝতে পারলাম। কী অদ্ভুত রাত আর বিচিত্র পরিবেশ! লোকে দেখলে কী বলত! ছি ছি! কিন্তু এতখানি আরাম, আমার দ্নস্থ ক্লান্ত শরীরে এতখানি স্নখবোধ আর কখনও পেয়েছি কি না মনে নেই। ঘ্নমে ঢ্নলে আসছে চোখ। কিন্তু—

নাঃ তা হবে না। সেই বন্ধ্নটির কথা বল্‌ছি। হতচ্ছাড়া মরবার সময় ব'লে গেল প্নটলিটা দিয়ে, আমার রক্ত।

বললাম, রক্ত কিসের?

চোখের জল আর কষের রক্ত মুছে বলল, আমার বুকের। না খেয়ে খেয়ে রোজ—

বলতে বলতে রক্তশূন্য অস্থির আঙ্গুলগুলো দিয়ে হাতাতে লাগল পুঁটলিটা।

আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, বানচোৎ কিসের জন্য র‍্যা?

বলল, ঘর বাঁধার আশায়!

এমনভাবে বলেছিল কথাটা যে ফের গালাগালি দিতে গিয়ে আমার গলাটার মধ্যে...

যাক সে কথা।

মেয়েটা একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

সে তাকাল। চোখ দুটো যেন যন্ত্রণায় লাল আর কান্নার আভাস তাতে। বলল, কিছু না।

তার গরম নিশ্বাসে এত আরাম লাগল আমার গায়ে। ঠাণ্ডা জমে যাওয়া গায়ে যেন কেউ তাপ বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে হল হঠাৎ, খুব খারাপ নয় দেখতে। ঠোঁট আর নাকটা যা একটু খারাপ। বোজা চোখের পাতা, বুকে জড়ানো হাত দুটো আর তার নমিত বুক বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করল। সে জিজ্ঞেস করল আমাকে, ঘুম আসছে না তোমার?

আমি ঘুমুবো না। বললাম। মনে মনে ভাবলাম, তাহলে তোমার বড় সুবিধে হয়, না? সেটি হচ্ছে না বাবা। কথা বললেই তো সংশয়টা বাড়ে আমার মনে। তার চেয়ে চুপ করে থাকুক না।

বাইরের তাণ্ডব তখনও পুরো দমেই চলেছে। টালি চোঁয়ানো জলের ফোঁটার শব্দ আসছে মেঝে থেকে, সঙ্গে ছুঁচোর কেত্তন।

সে আবার ককিয়ে উঠল।

কী হয়েছে?

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, রোগ।

রোগ! কিসের রোগ?

সে নীরব।

বল না বাপু।

তবুও নীরব।

আমি হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলাম।—বল না কেন রোগটা। যক্ষ্মা কলেরা টলেরা হলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। রোগের সঙ্গে পীরিত নেই বাবা।

সেও হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল। কার সঙ্গে আছে তোমার পীরিত, শুনি?

তা বটে। পীরিতের কথাই তো ওঠে না এখানে। বললাম, তা বলই না কেন রোগটা।

যা হয় এ লাইনে থাকলে। সে বললে।

লাইনে থাকলে? সর্বনাশ! ভীষণ সিঁটিয়ে গেলাম। ভয়ে ও ঘৃণায় জিজ্ঞেস করলাম, এর উপরও সন্ধ্যারাত্র—

নিশ্চয়ই......

পাঁচজন। সে বলল।

ইস্! কী সাংঘাতিক! বললাম, চিকিচ্ছে করাও না কেন?

পয়সা পাব কোথায়?

কেন, নিজের রোজগার?

সে তো মনিবের পয়সা।

মনিব? এটা কি চাকরি নাকি?

নয় তো? মনিবের ব্যবসা, ঘর দোর জায়গা জিনিস। আমরা আসি খাটতে।

ভয়ানক দমে গেলাম কথাগুলো শুনে। এরা বেশ মজায় থাকে না তাহলে? এও চাকরি! বললাম, মনিব শালাই বা কেমন, চিকিচ্ছে করায় না?

যখন মর্জি হয়। কলের মানুষ রাতদিন কত মরছে, কলের মালিকরা তাদের চিকিচ্ছে করায়?

ঠিক। তার বেদনার্ত শান্ত চোখের দৃষ্টি এবার আমাকে সত্যই দিশেহারা করে তুলল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক প্রাণ দেয়, কিন্তু জীবনের এ কি প্রতিরোধের লড়াই! বললাম, তাহলে......

সে বলল, তাহলে আর কি। মনিবের চোখে ধ্লো দিয়ে যেটা রোজগার হয়, তাতে চিকিচ্ছে করাই।

বাঁচতে? হাসতে গিয়ে ম্খটা বিকৃত হয়ে গেল আমার।

সকলেই বাঁচতে চায়। সে বলল যন্ত্রণায় ঠোঁট টিপে।

ঠিকই। ডাঙগায় বাঘ আছে জেনেও মান্ষ এ ডাঙগাতেই তার বাস ও জনপদ গড়ে তুলেছে। বন্যা, ঝড়, ক্ষ্ধা, কী নেই! তব্। আর সেই হতচ্ছাড়া চেয়েছিল ঘর বাঁধতে। হ্যাঁ, তব্ প্টলির প্রতিটি পয়সা রক্তের ফোঁটা। রক্তের ডেলা একটা—এই প্টলিটা।

সে বলল, ঘ্মোবে না?

না, ঘ্ম নেই চোখে। ওর নিশ্বাস লাগছে। যন্ত্রণার গরম নিশ্বাস। মিঠে তাপ তেপে তেপে গন্‌গনে আগ্নের মত মনে হল। শক্ত করে প্টলি শ্দ্ধ জামাটা চেপে ধরে উঠে পড়লাম। বাইরে ঝড়-জলের দ্র্যোগ তেমনি। রাত প্রায় কাবার। নিজের জামা কাপড় পরে নিলাম।

সে উঠল। হাসতে চাইল।—চললে?

পকেটে হাত দিয়ে শক্ত করে প্টলিটা চেপে ধরে বললাম, হ্যাঁ।

হতভাগা ম্খের কষ বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল মরতে মরতে, এটা তুই রাখ। কেন? কেন?

মেয়েটা বলল যন্ত্রণার চাপা গলায়, আবার এস।

মেয়েটার কী চোখ! সমস্ত ম্খটি লাঞ্ছনার দাগে ভরা। আকাশম্খো নাক, মোটা ঠোঁট। কিন্তু এমন ম্খ তো আর কখনো দেখিনি!

ভীষণ বেগে ওর দিকে ফিরে প্টলিটা ওর হাতে তুলে দিলাম। ওর নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে। ম্হ্র্তে চোখ নামিয়ে, একটা অশান্ত ক্রোধে দাঁত দাঁত ঘষে বেরিয়ে এলাম পথের উপরে।

সে কী একটা বলল পেছন থেকে। হাওয়ায় ভেসে গেল সে কথা। বললাম, পিছ্ ডেকো না।

বোঝাম্ক্ত আমি উত্তর দিকে এগিয়ে চললাম। বানপ্রস্থে নয়, বন্ধ্র বাড়ীতে প্বে হাওয়া ঠেলে দিতে চাইল পশ্চিমে গঙ্গার ঘাটের দিকে। পারল না।

কাজ নেই

মেঘলা ভাঙা রোদ আকাশে।

ছাড়া ছাড়া উড়ন্ত কালো মেঘ, ধারে ধারে তার ঝিকি-মিকি করে রোদ। মেঘবতী গলায় পরেছে ঝকমকে রূপোর হাঁসুলী। তার ছটা চোখে বেঁধে। রূপো আবার কখনো শ্যামল অঙ্গে সোনার ধারে ঝলমল করে।

রোদের পিছনে পাল্লা দিয়ে ছায়া দৌড়ায় পূব থেকে পশ্চিমে। উত্তরদক্ষিণে লম্বালম্বি রেললাইনের উঁচু জমি, মাথায় তার সচল আকাশ। মেঘে নেই জল, রোদে আছে শুধু পোড়ানি। পূবের নাবিতে দিগন্ত-বিস্তৃত ধানখেত যেন লক্ষ্মীছাড়ি! পোড়া পোড়া পাঁশুটে মরকুটে ধানের ছড়া, সরু সরু গুছি, লম্বায় হাত দেড়েকও নয়। পশ্চিমে শুকনো নয়ানজুলি হাঁ করে রয়েছে। আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে বিস্তৃত ঘেসো জমি আর জলা। ঘেসো জমিতে ঘাস নেই। তবু পশ্চিমা রাখালটা ওইখানেই সমস্ত গোরু চরাতে নিয়ে আসে। বাদবাকি সমস্ত জমিই কোন-না-কোন কোম্পানির করায়ত্ত। গোরুগুলো ঘাস পায় না, খালি মাঠ চষে বেড়ায়।

সামনেই যে-গ্রামটা দেখা যায় পশ্চিমে, গোরুগুলো সেখানকার গৃহস্থদের। লোকে বলে গ্রাম, কিন্তু গ্রাম নয় ওটা। আবার পুরোপুরি শহরও নয়। গ্রামটার আরও পশ্চিমে গঙ্গার ধারে ভিড় করে আছে কলকারখানা। এটা একটা আধ-খ্যাঁচড়া জায়গা।

দুপুরটাকে দুপুর বলে বোঝবার জো নেই মেঘের জন্য। এমন সময় রেললাইনের উপরে পূবে ওই কিম্ভূতকিমাকার কালো মেঘটার আড়াল থেকে একটা চিতাবাঘের মতো মুখ উঁকি মারল। তার লোলুপ দৃষ্টি এপারের মাঠের গোরুগুলোর দিকে। একটু একটু করে সন্তর্পণে সে-মুখ পুরোটা বেরিয়ে এল যেন মেঘের আড়াল ছেড়ে।

বসন্তের কতগুলো বড় বড় ক্ষতের দাগ সেই মুখে। চোয়াল দুটো ছুঁচলো পাথরের মতো। নাকের মাঝখানটা বসা, সামনেটা তোলা। মাকুন্দ বলতে যা বোঝায় তেমনি তার মুখে গোঁফদাড়ির বদলে কয়েকগাছা পাতলা চুল। তার

ম্যালেরিয়াগ্রস্থ হলদে চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, চিতাবাঘটা বুঝি এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে এপারের গোরুগুলোর উপর। কিন্তু মানুষটা অর্থাৎ ওই আধ-খ্যাঁচড়া জায়গার দুলেপাড়ার ফটিকচাঁদ নিঃশব্দে হেসে উঠল দাঁত বের করে। হাসল পশ্চিমা রাখালটাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘুমোতে দেখে।

তারপর যেন যাদু করছে এমনি করে ফটিক একটা অদ্ভুত শব্দ বের করে তার গলা দিয়ে ঃ অ...অ...গ্‌গ...গ্‌গ...

অমনি কয়েকটা গোরু উৎসুক চোখে তাকায় তার দিকে।

সুযোগ বুঝে ফটিক পায়ের কাছ থেকে তুলে নেয় বিচুলির আঁটিটা। আঁটি সামনে বাড়িয়ে দোলায় আর মিহিমোটা গলায় অদ্ভুত শব্দ করে।

সারা তেপান্তর জনহীন। দূরের কারখানা থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে সোঁ সোঁ করে। টেলিগ্রাফের তারে কলর-বলর করছে কয়েকটা ল্যাজঝোলা পাখি।

লাইনের সামনের কয়েকটা গোরু আতুর চোখে ঘাড় তুলে তাকায় ওই সোনারঙ্ বিচুলির আঁটিটার দিকে। বার কয়েক ফোঁস ফোঁস করে নাকের পাটা ফুলিয়ে যেন একমুহূর্ত গন্ধ শোঁকে খাবারের। পরমুহূর্তেই লেজ তুলে ছোটে বিচুলির আঁটি লক্ষ্য করে।

ফটিকের নজর রাখালের দিকে। সে টের পেলেই সব ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সে-রকম দুর্ঘটনা কিছু ঘটল না।

গোরুগুলো কাছে আসতেই বিচুলির আঁটি ফেলে দিয়ে কোমর থেকে পাটের দড়িটা খুলে ফটিক গোটা তিনেক গোরুকে লহমায় বেঁধে ফেলল। বিচুলিতে গোরু মুখ দেওয়ার আগেই সে আঁটিটা বগলদাবা করে বলল, "দাঁড়া বাপু, আবার কোথাও টোপ ফেলতে হবে তো।" বলে গোরু তিনটেকে নিয়ে মুহূর্তে সে পুবের নাবিতে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এপারের মাঠ থেকে একটা বকনা ডেকে উঠল—হাম্বা! রাখাল ঘুমচোখেই বলে উঠল, হ—হ! তারপর মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে ঠোঁট উলটে থুক্ করে ফেলে দিল খৈনির ছিবড়ে। দেখল একবার এদিক-ওদিক। দেখে আবার নিশ্চিন্তে মুখ ঢাকল।

ফটিকচাঁদ ততক্ষণে নবগাঁয়ের সড়কে। সে কেবলি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর বেঁকে-বসা পোয়াতি গাইটার লেজ মলছে। বাকি দুটোর বিশেষ

আপত্তি দেখা যাচ্ছে না। তাদের নজর ফটিকের বগলের দিকে। পেট বড় দায়। সে দুটোকে ফটিক বলছে, "র, র, একেবারে লক্ষ্মী কুণ্ডুর ঘরে গে' খাবি।"

বাজার-ফেরতা এক তরকারী-চাষী ফিক্ করে হেসে জিজ্ঞেস করল, "কার সব্বোনাশ করলে গো?"

এ বিষয়ে ফটিকচাঁদ চেনা যোগী। তবু হেসে বলল, "হি হি, সব্বোনাশ আর কি, নাইনে উঠেছ্যালো তাই ধরে নে' এলুম। আইনের ব্যাপার কি না, হুঁ হুঁ..."

হাসল তরকারী-চাষীও। রেললাইনে, রাজপথে, পরের বাড়ি বা বাগানে পোষা গোরু গেলেই বে-আইনী।

ফটিক গোরু তিনটেকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসে তুলল নবগাঁয়ের খোঁয়াড়ে। এখন লক্ষ্মী কুণ্ডুর খোঁয়াড়। ইউনিয়ন বোর্ডের তিনটে খোঁয়াড়ের ডাক সে নিয়েছে।

খোঁয়াড়ের পাশের ছোট ঘরটাকে সবাই বলে আপিস। সেখান থেকে খালি গা নাদুসনুদুস গৌরবর্ণ লক্ষ্মী কুণ্ডু চাবির গোছাটা নিয়ে বেরিয়ে এল। গলায় এঁটে-বসা তুলসীর মালাটা একবার ঘুরিয়ে দিল আঙুল দিয়ে। চাবি দিয়ে খোঁয়াড়ের দরজা খুলতে খুলতে বিষণ্ণ ঠোঁট দুটো উলটে বলল, "এতক্ষণে মাত্তর তিনটে?"

"নাঃ, তোমার জন্যে সবাই পথে-ঘাটে গোরু ছেড়ে রেখে দিয়েছে।" বলতে বলতে ফটিক গোরু তিনটেকে খোঁয়াড়ে পুরে বাঁধন খুলে দিল।

নবাগতা গোরু তিনটে বাদে আর একটা ছাগী ছিল। সে একবার হুঁ হুঁ হুঁ করে ডেকে উঠল সরু গলায়। বোধহয় তার একাকিত্বের অবসানে।

ফটিকের গরম কথাতেই লক্ষ্মী কুণ্ডুর গাল ভরে ওঠে হাসিতে। তালা বন্ধ করতে করতে বলে. "তোর মতো কাজের লোকের যে কেন কাজ জোটে না, আমি তা-ই ভাবি।"

"তাহলে তোমার এ-কাজ কে করত, সেটাও ভাব", প্রায় কুণ্ডুর মতোই হাসতে গিয়ে বিকৃত মুখে বলে ফটিক। "এখন প'সা ছ আনা ছাড় দিকি চট্ করে।"

গোরু-পিছু তার দু আনা পাওনা। কুণ্ডু পাবে গোরুর মালিকের কাছ থেকে বারো আনা। আবার একদিন ছেড়ে দুদিন হলেই কুণ্ডুর পাওনা ডবল হয়ে যাবে। আইনত অবশ্য একটা খরচ আছে কুণ্ডুর, ওই পশুগুলোকে খাওয়ানো।

কিন্তু কথায় বলে, সে-কথা জানে মা ভগা, আর জানে পশুগুলো। সেদিক থেকে বরং ফটিক, কুণ্ডুর সঙ্গে হাতাহাতি করে হলেও খোঁয়াড়ের প্রাণীগুলোকে কিছু দেয়। বলে, "কুণ্ডুবাবু, পুণ্যি করে করে তো সগ্গের সিঁড়ি সব ভেঙ্গে ফেলে দিলে, নরকের দরজায় এট্টুসখানি থুথু ফেলে তো যাও।"

কুণ্ডু চিপটেন বোঝে, কিন্তু সেটা বুঝতে দেয় না। "তা যা বলেছিস। রাধাকৃষ্ণ বল।"

এখন ফটিকের কাছ থেকে পয়সার দাবি আসতেই কুণ্ডুর ফোলা গালের হাসি-টুকু মিলিয়ে যায়। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "এ-ব্যবসা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আর পোষাচ্ছে না।"

"আমারও না", ফটিক বলে আরও গম্ভীর হয়ে। "দু আনা রেটে আর চলে না।"

অমনি কুণ্ডু খ্যাঁক করে হেসে ওঠে। বোধহয় অস্বস্তিতে। বলে, "কী যে বলিস। তা পয়সা এখুনি নিয়ে যাবি? আর একটা চক্কর দিবি নে?"

"টাইম নেই।"

কুণ্ডু আর একটি কথাও না বলে গদীতে গিয়ে খতেন খুলে বসে। পিটপিটে চোখে হিসেব দেখতে দেখতে বলে, "সুদে সুদে কিন্তু তোর দেনাটা অনেক জমে যাচ্ছে ফট্‌কে।"

"তা সে-কথা এখন কেন?" ফটিকের চোয়াল-উঁচোনো মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

"বলে রাখলুম।" বলে কুণ্ডু ছ আনা পয়সা বাক্স থেকে বের করে ছুঁড়ে দিল ফটিকের দিকে।

পয়সাগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে ফটিক প্রায় একদমে বলে ফেলল, "পরশুকের তিন আনা; তার আগে পাঁচটা গোরু, দুটো মোষ, চারটে ছাগল, জগাইয়ের এঁড়ে দুটো, এগুলোর দরুন পাওনা রয়েছে আমার। তা ছাড়া..."

কুণ্ডু হাঁটু চাপড়ে হেসে উঠল। "তুই তো লেখাপড়া জানলে দিগ্‌গজ হতে পারতিস্ রে ব্যাটা।"

সে কথার জবাব না দিয়ে ফটিক বলল, "তা ছাড়া খুচরো আছে বারো আনা।"

কুণ্ডু চোখের মণি কোণে তুলে গাল ফুলিয়ে বলল, "বাঃ! সেদিনে যে তাড়িয়ালাকে দিলুম সাত আনা, ক দিন গাঁজা নিলি ক পুরিয়া...?"

ফটিক একেবারে জল হয়ে গিয়ে চোখ বুজে হেসে উঠল, "তাই ব—লো! মাইরি, ও-শালার নেশাই আমাকে শেষ করেছে।" পরমুহূর্তেই চোখ ছোট করে হাসি টিপে আবার বলল, "তবু যে তিন আনা বাকি থাকে মশাই!"

শুনে কুণ্ডু খ্যালখ্যাল করে এমন হেসে উঠল যে মনে হল তার গলার শিরা ফুলে না আবার তুলসীমালা ছরকুটে যায়। "কেষ্ট কেষ্ট বল, বলিহারি তোর হিসেব। তোকে ঠকাবে যে সে এখনো জন্মায়নি।"

"বোঝ সেটা", বলতেই মনের মধ্যে কিসের ছটফটানিতে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। ব্যাকুলতা ফুটল তার হলদে চোখে, উঁচোনো চোয়ালের কোলে দেখা দিল বিচিত্র ব্যথার হাসি। বলল, "তিন আনা পয়সা দেও বাবু, আর দেরি করতে পারিনে। ঘরে আমার মেয়ে মরছে খিদেয়।"

"তা দিচ্ছি, কিন্তু আর একটা চক্কর দিস ফট্‌কে, নইলে মারা পড়ব।" বলে কুণ্ডু চারটে আনি নিয়ে একটা করে ফটিকের হাতে তিনটে দিয়ে পরে বলল, "আর এক আনা দিলুম তোর মেয়ের জলপানি।"

মুহূর্তে কী যেন ঘটে গেল। কুণ্ডুর চোখে ভয়, মুখে হাসির একটা অদ্ভুত ভাব; আর ফটিকের হলদে চোখ জ্বলে উঠল ধ্বক্ ধ্বক্ করে। সে-ভাবও এক মুহূর্ত।

আনিটা কুণ্ডুর কোলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে ফটিক বলল, "আমার মেয়ে তোমার দেয়া সোনাও পায়ে মাড়াবে না। অমন প'সা আবার যদি কোনদিন দ্যাও—"

বাকিটা কুণ্ডু বুঝে নিল ফটিকের সর্বনেশে মুখটার দিকে তাকিয়ে। তবু হাঁফ ছেড়ে কুণ্ডু হাসল আর আনিটা রেখে দিল একটা কৌটোতে। এমনি ফিরিয়ে দেওয়া সব পয়সাই কুণ্ডু ওই কৌটোতে রাখে। উৎসর্গীকৃত বস্তু তো আর বাক্সে রাখা যায় না। শুধু মনের মধ্যে একটা গোপন হাসির ধার চকচকিয়ে ওঠে তার।

ফটিক ততক্ষণে কুণ্ডুর বিচুলির গাদা থেকে তিনটে আঁটি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল খোঁয়াড়ের মধ্যে।

কুণ্ডু হা-হা করে ছুটে এল। কে কার কথা শোনে। ফটিক ততক্ষণে আবার

কুণ্ডুর ঝাঁপাল কাঁঠাল গাছে উঠে মট করে ভেঙে ফেলল একটা পাতাভরা বড়সড় ডাল, তারপর ছুঁড়ে দিল ছাগীটার দিকে।

কুণ্ডু তো খেপে মরে। খেঁকিয়ে উঠল, "শালা দিচ্ছিস, এর দাম দেবে কে?"

ফটিক হাসে হি হি করে, "ওরা আইনের মারপ্যাঁচে তোমার খোঁয়াড়ে আসে, তা বলে আইন তো আমার পরেও আছে গো", বলে সে সোজা ঘরের পথ ধরে।

ফোলা গালে একটু থমকে থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কুণ্ডু, "আর একটা পাক কিন্তু দি—স।"

ফটিকের কোন জবাব শোনা গেল না। কুণ্ডু তখন মনে মনে হিসেব করছে, তিন আঁটি বিচুলি ছ-আনা আর কাঁটালপাতা আট আনা, একুনে চোদ্দ আনা। ঐ হরেদরে এক টাকা। ঘরে গিয়ে খতেন খুলে ফটিকের ধারের পাতায় এক জায়গায় লিখে রাখল—দফায় এক টাকা।

ফটিক এসে পড়েছে প্রায় রেললাইনের উপরে। পশ্চিম দিকে মিউনিসি-প্যালিটির এলাকা, এদিকটা ইউনিয়ন বোর্ডের। ফটিকের কারবার সর্বত্রই।

লাইন পেরিয়ে সে দেখল পশ্চিমা রাখাল বহালতবিয়তে গান ধরেছে। মনে মনে হেসে ভাবল, ব্যাটা এখনো টের পায়নি। আর একটু এগোতেই চোখে পড়ল, ঝোপের পাশে একটা গাই একলা ঘাস খাচ্ছে। অমনি থেমে পড়ল সে। মুহূর্তে তার চোখে ফুটে উঠল মতলব হাসিলের চিহ্ন। কিন্তু চকিতে মনে পড়ে মেয়েটার কথা। আপন মনে মাথা ঝেঁকে আবার সে বাড়ির পথ ধরে। বলে, "যা বেটি, ছেড়ে দিলুম।"

এটা তার অভ্যাস হয়ে গেছে, এই পথে-ঘাটে, ঝোপে-ঝাড়ে আন্‌কা গোরু-ছাগল দেখলেই থেমে যাওয়া। অমনি তার চোখে-মুখে ফোটে ধূর্তের সতর্কতা। ফস্ করে কোমর থেকে দড়ি নিয়ে বেঁধেই পথ ধরে খোঁয়াড়ের। এজন্য অনেকবার তাড়া খেতে হয়েছে তাকে লোকের। গালাগাল-খিস্তির তো কথাই নেই। ঘুম থেকে উঠে তার মুখ দেখলে লোকে প্রমাদ গনে। ছোটখাট বিপত্তি ঘটলে বলে, "এঃ ফট্‌কে শালার মুখ দেখেছি আজ।" তা ছাড়া লাঠি তো উঁচিয়েই আছে তার মাথার উপর। কেবল হাতেনাতে ধরা যাচ্ছে না বলেই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ফটিক পথের পরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দাঁড়ায় মনের ভারে। নিজের

উপর ধিক্কার আসে তার, ঘেন্না হয়। মনে মনে বলে, এ শালার জীবন তো আর সইতে পারিনে। বলে আর হাতের মুঠোয় ঘেমে-ওঠা পয়সাগুলো কচলায়।

তার দিকে চোখ পড়তেই পশ্চিমা রাখাল ভাবে, গোরুচোট্টাটা দাঁড়াল কেন? সে অমনি সতর্ক হয়।

কিন্তু ফটিকের মনে জ্বলুনিটা এতই তীব্র যে, তাকে একেবারে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' করে দেয়। ছিল চটকলের মিস্তিরি, বাড়তি সংখ্যার গুণতিতে বেরিয়ে এল ছাঁটাই হয়ে। তা-ও আজ সাত বছর হয়ে গেল, কিন্তু এ-সংসারে কাজ নেই কোথাও কাজের মানুষের জন্যে। উপরন্তু অভাবে স্বভাব নষ্ট। ফটিক মিস্তিরি কি না আজ গোরু-ভেড়া-ছাগল দেয় খোঁয়াড়ে।...

মনের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতির জন্যই যেন সে হঠাৎ মোড় ফিরে ছুটতে আরম্ভ করে তাড়িখানার দিকে। অমনি কে যেন ডেকে ওঠে পিছন থেকে, 'বাবা গো'। চকিতে সে আবার ফেরে। মনই তার মেয়ে হয়ে ডাক দিয়েছে। ইস্‌! ছুঁড়ি যে খিদেয় মরছে এতক্ষণে। মাঠের পথ ছেড়ে দিয়ে জলার কাদা মাড়িয়ে আবার ঘরের পথে ছোটে। কথায় বলে, যেন একটা লম্বা গেছো ভূতের মতো।

সতর্ক রাখাল গোঁফ মুচড়ে মনে মনে হাসে আর ভাবে, ব্যাটার সাহসে কুলল না।

মাঠ পেরিয়ে পাড়ায় ঢোকবার ঝোপঝাড়ে ছাওয়া বাঁকের মুখে পড়তেই ফটিকের কানে এল মিহি মিষ্টি গলার ডাক, "আমার বাবা না কি গো!"

থমকে দাঁড়াল ফটিক। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বুলা, মুখভরা নীরব হাসি নিয়ে।

বুলা অন্ধ। ভ্রূর তলায় মস্ত বড় বড় দুটো চোখের গর্ত। টানা চোখের পাতা, কিন্তু সেই পাতার তলে চোখ নেই, গভীর অন্ধকার। মাজা রং, বসন্তের দাগ তার-ও মুখে। বোঁচা নাক। রূপসী না হলেও অন্ধ বুলার এক অপূর্ব শ্রী ফুটে রয়েছে তার শাদা ঝকঝকে অনুক্ষণ হাসি ও কালো টানা ভ্রূতে। তা ছাড়া, পাড়ার কথায় বলি, কানি বুলার শরীলে যে লেগেছে বয়সের ধার। লেগেছে প্রথম যৌবনের মায়া।

সে এমনভাবে ফটিকের সামনে এসে দাঁড়াল যে, কে বলবে এ মেয়ে অন্ধ।

হুতোশে ফটিক চোখ বড় করে বলে, "ঘর থেকে কী করে এলি এত পথ?"

বুলা হাসে, "পথ যে আমার চেনা গো বাবা!"

"কী করে তুই বুইলি যে, তোর বাপ আসছে?"

বুলা বলে স্বাভাবিক মিষ্টি গলায়, "কী করে আবার, যেমন করে সবাই বোঝে", বলে সে চোখের পাতা খোলে। পাতার তলায় ঝাপ্সা অন্ধকারে হাসির মতো কী যেন কাঁপে তির তির করে। বলে, "আমি ঠিক বুঝি। তুমি ছুটে এয়েছ, পায়ে তোমার কাদা।"

"পায়ে কাদা?" অবাক ফটিক নিজের কাদাভরা পায়ের দিকে দেখে, বুলার চোখের অন্ধ কোলের দিকে তাকায়। বলে, "কী করে বুইলি?"

"পাঁকের বাস লাগছে যে নাকে?" বাপের হাত ধরে বলে, "চল, ঘরে যাই।"

ফটিকের ছ্যাঁচড়া জীবনের হট্টগোলের মধ্যে তাকে যেমন ঠিক চেনা যায় না, তেমনি তার এ-মেয়েটির কাছে এলে সেও ভুলে যায় বাইরের কথা।

বাগানের গাছগাছালির ছায়ায় যেতে যেতে বুলাকে একটু কাছে টেনে বলে, "হ্যাঁ রে. পেটের জ্বালায় বুঝিন ছুট্রে এয়েছিলি, বাপ আসে কি না দেখতে?"

ভ্রূ টেনে বুলা বলে, "না। তোমার দেরি দেখে মনটা ঘরে রইলনি, তাই।"

এমনি কথা বুলার। নিজের খিদে বল, শখ বল, বল দুঃখ-জ্বালার কথা, তার 'হ্যাঁ' নেই।—কেবলি 'না'। কিন্তু ফটিক বুঝি কিছু বোঝে না? তার বুকটা মুচড়ে ওঠে, স্বর বন্ধ হয়ে আসে গলার। এমন করে মেয়েটা সব লুকোয়। যেন সব দেখতে পেয়েও ওর চোখ দুটো অন্ধ করে রাখার মতো। বুঝি ফটিকেরই দায়িত্ব নিয়েছে এ-কানা মেয়ে। কানা মেয়ের শুধু বাপের ভাবনা।

এ-সংসারে ফটিকের জন্য আবার ভাবনা! মা-বাপের কথা তো তার মনে পড়ে না। যেটুকু পড়ে. সে তার এক আবাগী পিসি, থাকত ফটিকের বাপের সংসারে। সে মরে যেতে ফটিক এনেছিল বুলার মাকে। বিয়ে দেবার তো কেউ ছিল না, তাই বুলার মাকে ফটিক কেড়ে এনেছিল এক মাতালের কাছ থেকে। বুলা তখন ছ মাসের অন্ধ শিশু। তারপর সেও মরল, রইল বুলা। তখন মনে হত, এটা গেলেই বাঁচি। কিন্তু বুলা তার মনটা আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে যে. এখন পা বাড়াতেই ভাবনা লাগে, কেমন করে ওর প্রাণটুকু ধরে রাখি।

এই ধরে রাখতে গিয়ে ফটিকের যে ছটফটানি, সেই ভাবনাতেই আবার হাড়মাস কালি হচ্ছে বুলার। তার ভাবনা যে অনেক। এই যে চলেছে বাপের সঙ্গে, এর

জন্য পাড়ার সবাই কতই না মুখ বাঁকাচ্ছে, ঠোঁট উলটোচ্ছে, মনে মনে টিপে টিপে তাদের গালাগাল দিচ্ছে। কেউই তাদের ভালবাসে না। সে শুধু ফটিকের ব্যবহারের জন্য নয়, তাদের বাপ-বেটির জীবনকে ওরা কুনজরে দেখে। বালাই-ছাড়া জীবনের সবই বুঝি এমনি হয়।

তবু পাড়ার রোগে-শোকে লোক মরলে বুলো তার বাপকে জোর করে পাঠায়। সকলের বিপদে আছে ফটিক। তখন সবাই বুঝি ভুলেও একবার ভাবে, ড্যাকরাটার দয়া খানিক আছে। কিন্তু কোন আনন্দের উৎসবের মধ্যে তার ডাক পড়ে না। রাত-দুপুরে চোর এলে ফটিক যায় আগে, পরদিন সকালে ফিসফিস গুলতানি হয় তার যে ফটকে হারামজাদা, তা কারুর বুঝতে বাকি নেই।

তা শুনে ফটিক ক্ষেপে ওঠে, লাঠি নিয়ে ছুটে যেতে চায়, খিস্তি করে, গালাগাল দেয়। তাড়াতাড়ি বুলো বাপের মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে রাখে। বলে, "বাবা, যেওনিকো। এ শুধু ওদের ঝগড়ার ফিকির। গেলে যে আরো বলবে।"

কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারে না যে, এক গোরু চুরিই যে সব বাজি মাত করেছে। এই বাজিমাতের মধ্যে আর এক নিদারুণ জ্বালা আছে বুলার মনে, কুণ্ডু-বাবুর জন্যে। শুধু জ্বালা নয়, অন্ধ মেয়ের সে এক দারুণ বেদনাভরা লজ্জা ও অপমান। যে-অপমান রাখবার ঠাঁই নেই, বুকটার মধ্যে শুধু অসহায় অভিশাপের ঝড় বয়ে যায়।

কোন-কোন সময়ে নিজের যৌবনকে সে অভিশাপ দিতে গিয়ে থেমে যায়। অদেখার আড়ালে যে এসেছে তার শরীরে শিরায় শিরায় রক্তের ঢেউ তুলে, সে যে তার দুটি চোখের মতোই এসেছে তীব্র অনুভূতি নিয়ে। সে যেন না দেখাকে দেখার মতো, না ছোঁয়াকে ছোঁয়ার মতো। তবু কি নেই একটুখানি কাঁটার খচখচানি? আছে। সে-কাঁটা তো বিশ্ব-সংসার ছেয়ে আছে মনে মনে বুকে বুকে। সে-কাঁটা এ-জীবনের বেড়াজাল, যে-বেড়াজাল সরাবার জন্য সে, তার বাপ ফটিক, এ দুলে-পাড়ার সবাই দিনের পর দিন ধরে ভাবে, কাজ করে, বিবাদ করে, এক ফোঁটা আনন্দ পেলে ধরে রাখতে চায় চিরদিনের জন্য।

কুণ্ডুকে সে ভয় পায় না, ঘেন্না করে। সে কানা হোক, হোক বোবা, তবু মন বল, শরীর বল, সবই তার নিজের। সেখানে বেঁকে যাবে না কুণ্ডুর শয়তানি!

বুলাকে দাওয়ায় বসিয়ে ফটিক বলে, "এট্টুস বস, বাসুর দোকান থেকে দুটো

চাল নিয়ে আসি", বলে ফটিক বেরিয়ে যায়।

বুলা ছাড়া ফটিকের সম্বল এই ভিটেটুকু। বেঁকে-পড়া একখানি ঘর। তার গায়ে মাথায় নারকেল-খেজুরপাতার অনেক গোঁজামিল দেওয়া। দাওয়ার এক কোণে উনুন। এ-ভিটেও যে কবেই কুণ্ডুর খতেনের অঙ্কে ডুবে গেছে, তা ফটিক জানে, তবু মুখে কিছু বলে না।

বুলা বসে বসে হাসে আর আপন মনে গুনগুন করে। ওই তার স্বভাব।

বেলা যায় মেঘে মেঘে। হিন্‌চে-কলমীর শাকটুকু নিয়ে ভাত বেড়ে বসে বাপ-বেটিতে একই পাতে। খেতে বসে একজন ভাবে, ছুঁড়িটার দিকে দুটো বেশী ঠেলে দি। আর একজন ভাবে, তার জোয়ান বাপের এই কটা ভাত তো একলারই লাগে, সে আর কি খাবে। রোজই তারা এমনি ভাবে আর খায়। কেউই কাউকে ফাঁকি দিতে পারে না।

খাওয়ার পরে ফটিক কোন কোন দিন বেরোয়। বেলার দিকে তাকিয়ে আজ আর বেরুল না। দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। বুলা বাপের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। আপন মনে বলে, পালের গোরু ফিরছে।...তারপর হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে, "ঘরের পেছন দে কে যায় গো! নোটন পিসি না কি?"

জবাব আসে, "হ্যাঁ লো কানি।"

কানি! বড় অদ্ভুতভাবে হাসে বুলা।...মনে পড়ে একদিন এক ভিখিরি এসে ভিক্ষে চাইতে বুলা তাড়াতাড়ি একমুঠো চাল দিতে গিয়েছিল। ভিখিরিটা-ও ছিল অন্ধ। সে যখন টের পেল বুলা অন্ধ, তখন সে হাত গুটিয়ে নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বলেছিল, "ধু...র, কানির হাতে ভিক্ষে লোবনি।"

সেটা পাড়ায় আজও একটি হাসির গল্প হয়ে আছে। বুলা লজ্জায়, অপমানে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু কোত্থেকে একটা গোরু এসে তার প্রসারিত হাত থেকে চালগুলো খেয়ে নিয়েছিল। তখন চোখে জল থাকলেও 'ওমা', 'ওমা' করে হেসে সারা হয়েছিল বুলা।

হঠাৎ একটা চিৎকারে বুলার ভাবনা ভেঙে গেল, তন্দ্রা ভেঙে গেল ফটিকের। কী ব্যাপার? কান পাতল ওরা।

চিৎকার করছে চরণ মিস্তিরির প্রৌঢ়া স্ত্রী। নামহীন গালাগালি ও অভিশাপে ভরে উঠল দুলেপাড়ার আকাশ—"যে আমার পোয়াতি গাই পণ্ডে দিয়েছে, সে আঁট-

কুড়োর শরীল গলে গলে পড়বে, আর জন্মে সে গোরু হবে...।"

শুধু ফটিক নয়, মুহূর্তে বুলাও বুঝতে পারল এ-গালাগাল কাদের উদ্দেশ্যে।

চরণের বউয়ের গালাগালে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার শত্রুর চেহারা। "আঁটি-কুড়ো মেয়েমেগো, কনি ছুঁড়ি নিয়ে সোহাগ করে। ওর কানি যেন পোয়াতি হয়ে পেট খসে মরে পড়ে। ওকে পোড়াতে কাঠের দাম না জোটে, ও যেন মুখ দে রক্ত উঠে মরে। ভগবান যেন ওর দুচোখ কানা করে। কানি রাঁড় নিয়ে যেন ওকে ভিক্ষে—"

ফটিক হঠাৎ ফুঁসে লাফিয়ে ওঠে, "হারামজাদীকে আজ—"

"বাবা!" কান্নাভাঙা গলায় চিৎকার করে ওঠে বুলা, "বাবা গো!"

ফিরে দেখে ফটিক, বুলার অন্ধ চোখের গর্ত থেকে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। "ছি ছি, বাবা, তুমি যেওনি কো।"

"ওরা আমায় গালাগাল দিক, তোকে কেন?'

"দিক, আমি যে তোমার মেয়ে।" বলে সে ফটিকের পায়ের কাছে এসে মাটিতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে উঠল। "উপোসে মরব, তবু এমন কাজ তুমি আর কর না বাবা। ওদের শাপে তুমি যদি অন্ধ হও...তাহলে আমায় কে দেখবে?"...

একটা অসহ্য যন্ত্রণায় ফটিকের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল, ফুলে উঠল গলার শিরাগুলো। বসে পড়ে বুলার মাথায় হাত রাখল সে। বলল ফিসফিস করে, "আমি কী করব বল! একটা কাজের জন্য কার কাছে না গেছি, রোজ হাজিরা দিচ্ছি কলে-কারখানায়। ঘুষ চায় এক-শো টাকা। একটা ঘরামির কাজও পাইনে। কাজ নেই এ-সংসারে, তবে কেমন করে বাঁচি বল্?"

জবাব নেই বুলার। সত্যি কেমন করে বাঁচা যায় এ-সংসারে! ফটিকরা কেমন করে বাঁচবে, এ-সংসারে সে-কথা বলে দেওয়ার কি কেউ নেই? লোকে পরামর্শ দিয়েছে বুলাকে নিয়ে ভিক্ষে করে খেতে। তার চেয়ে ফটিক ঠ্যাঙাড়ে বৃত্তি করে খাবে, তবু ভিক্ষে করতে পারবে না।

ইতিমধ্যে চরণের বউয়ের সঙ্গে সারা দুলেপাড়া গলা মিলিয়েছে। সে এক অদ্ভুত হট্টগোল।

বেলা যায়, সন্ধ্যা নামে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ফটিকের ঘরে। কিন্তু ওরা বাপবেটিতে বুঝি বাঁচার ভাবনাতেই অন্ধকারে বসে থাকে মুখ গুঁজে। অস্থির

চিন্তায় আড়ষ্ট, জীবনমরণের সংশয়ে যেন ভীত বিহ্বল দুটো পাতালগর্তের অভিশপ্ত জীব।

হঠাৎ ফটিক বলে ওঠে, "না খেয়ে মরলে তো কোন শালা দুটো কথা বলতেও আসে না, তবে কিসের খাতির ওদের ?"

অন্ধকারের দিকে মুখ তুলল বুলা। বুঝি জল লেগেই তার চোখের গর্ত দুটো চকচক করে। বলে, "বাবা, কে কাকে দেখবে? অভাব যে বড় শত্তুর। ওদের যে-টুকু আছে, সে-টুকুই পুতুপুতু করে ধরে রাখতে পারে না। আমাদের মতো ওরাও কোনরকমে বেঁচে থাকতে চাইছে।"

গর্তে-ঢোকা হলদে চোখ দুটোতে ফটিকের ব্যথিত স্নেহ ঝরে পড়ে। বলে, "চোখ দুটো নেই, তবু এত কি করে বুঝিস তুই বুলি ?"

"চোখ দুটো আমার নেই বলেই।" বলে সে হাসে তেমনি করে। যেন কতদূর থেকে তার গলা ভেসে আসে, "বাবা, আমার চোখ দুটো নেই, তাই মনটা সব্বোখন যেন হাঁ করে থাকে দেখবার জন্যে। সব বোঝা আমার ঐখেনে। ভাবি, যাদের চোখ মন দুই-ই আছে, তাদের বুঝিন কোনটাই পুরো নয়; আমার যে একটাই সব", বলতে বলতে তার চক্ষুহীন গর্ত থেকে আবার জল পড়ে, "তবু ভাবি, চোখ দুটো থাকলে চটকল বা চালকলে কোন কাজকর্ম করতে পারতুম।"

ফটিক বোঝে, এ হল বুলার বাপের গঞ্জনা, অপমানের ব্যথা। সে চোয়াল উঁচিয়ে ছুঁচলো মুখে ঢোক গিলতে থাকে আর মনে মনে বলে, "তোকে যন্তন্না দিতে আর যাব না গোরু ধরতে, যাব না।"...

হঠাৎ পরিষ্কার গলায় বলে বুলা, "বাবা, চাঁদ উঠেছে বুঝিন ?"

ফটিক চমকে উঠে দেখে, তাই তো, কখন তার দাওয়া পেরিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে অন্ধকার কাঁচা মেঝেয়। আলোভরা উঠোনে যেন কালো রঙে লেপে আছে পিপুলের ছায়া। মনে হয় যেন দু চোখ মেলে নির্বাক জ্যোৎস্না ঘরে এসে তাদের বাপবেটির কথা শুনছে। ফটিক বলে, "কী করে বুইলি ?"

বুলা বলে, "দ্যাখ না, সারাদিনের পর হাওয়া দিচ্ছে, কাগ্ ডেকে উঠছে, লক্ষীপ্যাঁচা ডাকছে। তা ছাড়া কাল যে একাদশী গেছে।...চল বাবা, বাইরে যাই।"

"চল্।" বুলাকে নিয়ে ফটিক বাইরে এসে বসে।

শরতের রাতে কালো আকাশ। তারা দেখা যায় না। আকাশে তিন পো

চাঁদ। শরতের এই আলো-আঁধারির কুহেলিতে মনে হয় যেন কোন এক নির্বাক অশরীরী ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই মুহূর্তটিতে তারা ভুলে যায় তাদের দৈন্য ও উৎপীড়নের কথা। বুলা বক্ বক্ করে আপন মনে। ফটিকের মনে পড়ে যায় বুলার মাকে। তারপরে চকিতে মনে আসে চরণের বউয়ের গালাগাল, "ওর কানি যেন পোয়াতি হয়ে পেট খসে মরে।"...হঠাৎ সে বলে, "বুলা, তোর বে' বসতে মন চায় না?"

এক মুহূর্ত থমকে বুলা খিল খিল করে হেসে ওঠে। অন্ধ মেয়ের সে হাসিতে সারা দুলেপাড়ায় যেন বিচিত্র স্বপ্ন নেমে আসে। সামনে বাপ হলেও শরীরের কাপড় গুছোয় সে। দশজনের চোখের মধ্যে যে সে নিজেকে দেখেছে। পরমুহূর্তেই হাসি থামিয়ে বিস্মিত মুগ্ধ মুখে চোখের পাতা মেলে ধরে আকাশের দিকে। যেন কান পেতে শুনছে কার পদধ্বনি। তারপর আস্তে যেন আপন মনেই বলে, "হ্যাঁ বাবা. মন চায়।" বলে ফেলেই মাটিতে মুখ লুকোয় দুরন্ত লজ্জায়। ফটিক হো-হো করে হেসে ওঠে হেঁড়ে গলায় আর তার চোখ ছাপিয়ে হঠাৎ জল গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে।

এমন সময় একটা ছায়া পড়ে উঠোনে। চোখের জল মুছে ফটিক বলে, "কে গা?"

"এই আমি।" যেন খানিকটা ভয়ে ভয়েই বলে কুণ্ডু একটু হেসে হেসে।

"কুণ্ডুবাবু?" ফটিক বলে, "কী মনে করে।"

"কী মনে করে? আর কিছু না" বলে কুণ্ডু এক পা পা করে এগোয়— "এই এলাম একটু তোকে দেখতে।" কুণ্ডুর গলায় কথা আটকে যায়। ফটিক মনে মনে দাঁত পেষে আর বুলা মনে মনে বলে, নচ্ছার এসেছে ওর মরণ দেখতে।

ফটিক বলে," তা এসেই যখন পড়েছ তখন বস।"

কথার হুলটুকু খেয়েও কুণ্ডু বলে. "না, এসেছিলাম তোকে বলতে যে, আর একটা পাক্ তো দিলিনে!"

বুলা কী যেন বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই ফটিক বলল. "শ'খানিক টাকা দেবে কুণ্ডুবাবু, ঘুষ দিয়ে একটা চাকরি পাই তবে।"

এবার কুণ্ডু হাসে একটু পরিষ্কার গলায়, "তোর চাকরি হলে আমার কাজ করবে কে?"

বুলা এবার তীক্ষ্ন গলায় বলে ওঠে, "তোমার অমন কাজের মুখে ছাই। কাজ না ছ্যাচড়ামো? ভ্যালা ধম্মের খোঁয়াড় খুলেছ।"

কুণ্ডুর রঙ যেন আর একটু চড়ে। বলে, "পয়সার কাছে আবার ছ্যাঁচড়ামো কি! মা লক্ষ্মী যেমন দেবে। এই দ্যাখ না, ফটকেকে তোর জন্যে কতদিন জলপানির পয়সা দি, আনে না। আনলে তো একটা বেলা..."

কথার মাঝেই ধীর গলায় ফটিক বলে ওঠে, "রামদাটা কোথায় রে বুলা?"

অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে হেসে জবাব দেয় বুলা, "ঘরে আছে। নিয়ে আসব?" হাসলে অদ্ভুত তীক্ষ্নতা ফোটে বুলার গলায়।

কুণ্ডু তাড়াতাড়ি বলে, "আচ্ছা, তাহলে আসি ফটিকচাঁদ। কালকে যাস্।" বলেই সে চকিতে পিপুলের ঘন অন্ধকারে মিশে যায়।

অমনি তারা বাপবেটিতে এক সঙ্গে গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। তাদের ছন্নছাড়া জীবনের এ দরাজ হাসি শুনে সারা দুলেপাড়া যেন চমকে ওঠে। যেমন হঠাৎ হাসি, তেমনি হঠাৎই তা থেমে যায়। এ-হাসি যে তাদের অভিশপ্ত জীবনের অন্ধকারকে উড়িয়ে নিতে পারবে না।

না, পারে না। অন্ধকার যেন আরো জমাট হয়ে আসে। কতবার ফটিক মনে মনে ভেবেছে গোরু ধরতে আর যাবে না। কিন্তু কোথায় ভেসে গেছে সেই প্রতিজ্ঞা। কার-খানায় ঘুষ ছাড়া কাজ হবে না। ঘুষের টাকাও দেবে না কুণ্ডু। সারা গাঁয়ের সমস্ত এঁদো পুকুরের কলমী-হিন্‌চে ঝেড়ে-মুছে বিক্রি করেছে ফটিক। তা-ও আর নেই।

মাঠে মাঠে পথে পথে ঘোরে। আকাশে শরতের ঝিমমারা মাথাধরা রোদ। গায়ে কম্প দেয়। যন্ত্রণায় ছিঁড়ে-পড়া মাথাটা দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে পথে পথে ঘোরে। কেবলি যেন কানে আসে, 'বাবা গো!'...মরছে, মরছে কানা মেয়েটা খিদেয়। নাকি বুঝি নিজের পেটের জ্বালাই বারবার মনে করিয়ে দেয় মেয়েটার কথা। বারে বারে সে ছুটে যায় কুণ্ডুর কাছে।

কুণ্ডু বলে, "দেনা তো তোর অনেক চড়েছে, নিজে না খাস, সেটা শুধবি তো?"

জ্বরের ঘোরে লাল চোখে একটু তাকিয়ে থেকে আবার ছুটে যায় ফটিক।— না, আজকাল আর গোরুও নেই পথে। পশ্চিমা রাখালটা চাকরির ভয়ে সব সময় সজাগ। সজাগ সকলে। শুধু ধর্মের ষাঁড় ঘোরে পথে পথে। একটা জাদুশিঙেও যদি থাকত! যেন ফুঁকলেই সব গোরুভেড়া ছুটে আসত তার কাছে।...কিন্তু মেয়েটা?

মেয়েটা কী খাবে? ভাবে আর নিজের পেটে হাত দিয়ে বসে থাকে।

কুণ্ডু বলে, "দেনা তো তোর অনেক চড়েছে, নিজে না খাস, সেটা শুধবি তো!" তারপর চোখ ঘুরিয়ে বলে, "আর, লোকের গোয়ালেও কি গোরু নেই?"

অর্থাৎ গোয়াল থেকে চুরি করতে বলছে।

মেয়েটা উদ্বেগে মাঠের ধারে শুকনো মুখে বসে থাকে। কখন শুনবে মাঠের মাঝে সেই পায়ের শব্দ। মনে মনে বলে, বাবা গো, আমি খাবনি, তুমি ফিরে এসো।...তবু হু হু করে কেঁদে ওঠে পেটের ব্যথায়।......

যদিও ফটিক ঘরে আসে, বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

দিকে দিকে বাজে শারদোৎসবের বাজনা। পুজো এসে পড়েছে। চারিদিকে কেনাকাটার রব।

বিকালবেলা ফটিক নবগাঁ পেরিয়ে শ্যামপুরের পথে পড়ে। একটা গোরু হা-হা করে ছুটে আসে তার সামনে। ফোঁস ফোঁস করে। দিক ভুলেছে গোরুটা। থমকে দাঁড়ায় ফটিক। দেখে এদিক-ওদিক। তারপরে হঠাৎ কী মনে করে কষে এক ঘা লাগায় গোরুটার পিঠে। বলে, "পালা, পালা হারামজাদী, নইলে মরবি গিয়ে কুণ্ডুর খোঁয়াড়ে।" বলে সে নিজেই পালায়। পালায় যেন সেধে-আসা পয়সা ফেলে।

তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় একটা চালার কাছে। চালাটা গাঁয়ের প্রান্তে। খেজুড় গুড় জ্বালদেওয়ার উনুন ঘর—আর একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এক পাল গোরু। অদূরেই উঁচু পাড়-ঘেরা একটা নতুন-কাটানো ডোবার জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ শোনা গেল। ফটিক উঁকি মেরে দেখল, একটা মুনিষ চান করছে, বোধহয় ফেরার পথে। চকিতে সে একবার এদিক-ওদিক দেখে অসীম সাহসে ভর করে খুঁটি থেকে খুলে ফেলে গোরুকটাকে। গাইবাছুর মিলিয়ে সাতটাকে এক দড়িতে বেঁধে লইয়া সে নেমে পড়ে পথে। একটা গাছ থেকে ছপ্‌টি ভেঙে, সপাং সপাং করে মারতে মারতে, ধুলোর ঝড় উড়িয়ে সে খোঁয়াড়ের পথ ধরে।

কুণ্ডুর খোঁয়াড়ে যখন এল, তখন ঘামে ধুলোয় তাকে আর চেনা যায় না। কিন্তু ফটিক জানে এ-ঘাম মরে গেলেই কম্প দিয়ে জ্বর এসে পড়বে। তার আগেই সে পয়সা নিয়ে চলে যাবে। তিনদিন ধরে যে নির্জলা উপোস চলেছে।

কুণ্ডু মহা খুশি হয়ে চাবির গোছাটি বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এসেই চোখ ছানাবড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক মুহূর্ত চুপ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে শালা, এ যে আমার গোরু সব গোয়ালশুদ্ধ ধরে এনেছিস! শালা, কোত্থেকে এনেছিস?"

প্রথমটা একটু ভড়কে গেল ফটিকও। কিন্তু চকিতে নিজেকে শক্ত করে ফটিক বলল, "গোয়াল-টোয়াল নয়, রাস্তা থেকে ধরে এনেছি। আইনের ব্যাপার। সে তোমারই হোক, আর যারই হোক। একটা টাকা ফেল, নয় তো বল আমাদের পণ্ডে দে' আসি।"

অর্থাৎ মিউনিসিপালিটির আওতায়।

ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কুণ্ডু কেমন করে ছেড়ে দেয় নিজের গোরুগুলো অথচ ফটিককেও তার বিলক্ষণ চেনা আছে। তাড়াতাড়ি সে একটা টাকা এনে দিয়ে গোরুগুলোকে নিজের হাতে নেয়।

ফটিক বলে, "রাগ করনি কুণ্ডুবাবু, খেতে তো হবে।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটে চলে ঘরের পথে। না, ঘরের পথে নয়, বাজারের দিকে। মনে মনে বলে, আর, একটু থাক মা, এলুম বলে।

কুণ্ডুও তখনি চাকরের উপর সব ভর দিয়ে চাবির গোছা কোমরে বেঁধে থানার পথ ধরে।

সে যখন দারোগাবাবু আর সেপাইয়ের সঙ্গে বাজারের কাছাকাছি এসেছে, সেই সময়টিতেই ফটিক বেরোয় বাজার থেকে, কোঁচড়ে চাল নিয়ে।

কুণ্ডু চেঁচিয়ে উঠল, "দারোগাবাবু, ওই যে শালা গোরু-চোর।"

বলতে না বলতেই যমদূতের মতো সেপাই একটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ফটিকের উপর। এ আচমকা আক্রমণে কোঁচড়ের চালগুলো ছড়িয়ে পড়ে মাটিতে।

দারোগাবাবু বললেন, "যাক্, আর অন্দুর যেতে হল না।"

সেপাই বলল, "চল্ শালা।"

চালগুলোর সঙ্গে যেন ফটিকের প্রাণটাই ছড়িয়ে পড়েছে। দিশেহারা হয়ে সে বলল, "কোথায়?"

কুণ্ডু বলল দাঁতে দাঁত পিষে, "শালা, সরকারের খোঁয়াড়ে।"

হঠাৎ সে বেঁকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, "বাবু, আমার কানা মেয়ে যে একলা রয়েছে।"

কুন্তু ফোলা গালে হাসি ফুটিয়ে বলল, "সেটা যাবে আমার ধম্মের খোঁয়াড়ে।"

এতক্ষণে যেন সব হৃদয়ঙ্গম করে সে ভাঙা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠে, "বু—লা রে...।"

ততক্ষণে তার মুখটা উলটো মুখে থানার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আর বুলা তার নিস্তেজ শরীরটা নিয়ে টুক্ টুক্ করে চলেছে মাঠের পথে। দিনেও যেমন, রাতেও তেমন চলেছে চেনা পথে, বাগানের ভিতর দিয়ে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে আকাশের দিক মুখ করে বলে, "চাঁদ উঠেছে বুঝিন?"

সত্যি, চাঁদ উঠেছে আকাশে। বিষন্ন জ্যোৎস্না যেন অবাক হয়ে চেয়ে আছে অন্ধ মেয়েটার দিকে। গাছের ভেজা পাতায় কাজলের চকচকানি। সেখান থেকে বুকভরা নিশ্বাসের মতো হঠাৎ হাওয়া বয়ে যায় বুলার মাথার উপর দিয়ে।

বুলা থমকে দাঁড়ায় খস্-খস্ আওয়াজে। নিজেই বলে, "দূর—দূর শেয়াল-গুলো।" সত্যি একপাল শেয়াল চলে গেল। কিন্তু বেঁকে পড়ে বুলা। পেটটা পিঠে ঠেকে যেন দুমড়ে পড়তে চায় মুখ থুবড়ে।

কোত্থেকে ডাল-সম্বরার মিঠে ঝাঁজের গন্ধ আসে হালকা। গলা ভিজে ফুলে ফুলে ওঠে বুলার নাসারন্ধ্র। তাতে যেন নির্বাক জ্যোৎস্নারই গোঙানি উঠল হঠাৎ ঝিঁঝিঁর ডাকে।

মাঠের ধারে এসে বসে পড়ল বুলা। যেদিক থেকে তার বাবা আসবে, সেদিকে মুখ করে তুলে রাখল চোখের পাতা। চোখের সেই অন্ধ গর্তে যেখানে দলা পাকিয়ে আছে কতকগুলো শিরা-উপশিরা, সেখানটা কাঁপতে থাকে থরথর করে; আর ফিস্ ফিস্ করে বলে, "বাবা গো, খেপলে যে তোমার মাথার ঠিক থাকে না। তোমার বুলা খেতে চাইনি, তুমি ফিরে এস—"

কিন্তু পেটের মধ্যে কারা যেন ব্যথার ধাক্কা দিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে। শেষটায় অনেকক্ষণ বসে থেকে যখন সে শুনল থানার পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বেজে গেল, তখন সে ভাবল, বাবা তো তার এত দেরি কোনদিন করে না! তবে কি বাবা মাঠের ওপারে তাড়িখানায় পড়ে আছে? তার অন্ধ চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল। গলা ফাটিয়ে ডাক দিল, "আমার বাবা গো..."। লাইনের উঁচু জমিতে তা প্রতিধ্বনি করে ফিরে এল।

আর আশ্চর্য, যে চরণের বউ ওদের বাপবেটিকে এত গালাগালি করেছিল, সে নিজের অন্ধকার ঘরে শুয়ে বুলার ডাক শুনে আপন মনে বক্ বক্ করে উঠল, "বাপ না, সে হারামজাদা কশাই। নইলে অমন সোমত্থ কানি মেয়েটাকে কেউ এমনি ফেলে রেখে যায়!" বলে সে চরণকে বলল, "মনটা খারাপ গাইছে, চল তো এটুস দেখে আসি।" বলে সে মাঠের পথ ধরল।

আর মাঠের উপর তখন দেখা যায়, অন্ধকারে কুণ্ডু এদিকে আসছে দ্রুত-পদে—নিঃশব্দে।

ঈশানে মেঘ

রাত প্রায় শেষ। দিন আসছে ভূপতিচরণের সৌভাগ্য বহন করে।

ঢং ঢং করে পাঁচটার ঘণ্টা বেজে গেল। কিন্তু অন্ধকার কাটেনি। যদিও শীতের শেষ, তবু কুয়াশার ওড়না দিয়ে যেন পৃথিবী আত্মগোপনের চেষ্টায় আছে এখনো। এখনো কয়েকটা বর্ণহীন তারা বিষাদে ম্লান। জমাট হিমের বুকে চাপ দিচ্ছে উত্তরে হাওয়া।

বাংলার অভ্যন্তরে এখানে মাইলের পর মাইল জুড়ে ছিল সবুজ গাছপালায় ঘেরা শত শত গ্রাম। এখন হয়েছে সামরিক ঘাঁটি। যেন রাতারাতি টেনে হিঁচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে গ্রামকে গ্রাম। এখন দিকচিহ্নহীন। গ্যালনের পর গ্যালন পেট্রোল পুড়িয়েও এই বিস্তৃত সামরিক ঘাঁটির থই পাওয়া দায়।

সামরিক ঘাঁটি নয়। লোকে বলে মেলেটারি ডিপো। কুয়াশার আস্তরণ ছিঁড়ে ধীরে ধীরে মেলেটারি ডিপো জাগছে তার সমুদ্রের মত বিস্তৃতি নিয়ে...... জাগছে হাবিলদার মেজর ভূপতিচরণের সৌভাগ্যকে শিয়রে নিয়ে। আজকের রাত্রি প্রভাত ভূপতির জন্যই। আজকের যত আলো, যত বাতাস, যত রং সবই ভূপতির।... তাই তার সদ্য-ঘুম-ভাঙা চোখে স্বপ্নাবেশ, থ্যাবড়া নাকের ফুলনো পাটার পাশ দিয়ে নেমেছে একটা বনমানুষি খুশি—হাসির চাপা ঢেউ। নিশ্বাসে চল্লিশ ইঞ্চি বুক ফুলে পঞ্চাশ হয়ে উঠেছে। মনটা একটা নেংটি ইঁদুরের মত আনন্দে যেন ছুটো-ছুটি করছে তার জালার মত শরীরটাতে।

কুয়াশার ঘোর কেটে জাগছে আলো।

জাগছে না শুধু শ্রীপতি। ঘুমটা ভেঙেছে, শরীরটা জাগছে না, জাগছে না মনটা। চটে ঢাকা বারান্দায়, কোন্ মান্ধাতা আমলের কাঁথার তলায় শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে আছে, সাড় নেই শীতের, বোধ নেই প্রভাতী ঘণ্টার। বুকটার মধ্যে কেমন ব্যথা ব্যথা করে। হাড়ে মাংসে নয়, দুনিয়ার রঙেভঙে যেখানটায় নানান্ বোধের ঘটা। কেমন যেন একটু ভয় ভয় ভাবও বা আছে। না, ভয় নয়, বিতৃষ্ণা। কি জানি কি। নাকি একটা ছেলেমানুষি কান্না, অপমানাহত শিশুর জর্জর অভিমান। তা-ই বা কেন, তা কে জানে।

শ্রীপতি। মিলিটারি নথিতে যার নামের পাশে লেখা আছে ইন্‌ভ্যালিড্‌, লোকে যাকে বলে, ন্‌লো ছিপতি বা হাতকাটা ছিপতি। ডিপোর বাইরের লোকে যাকে বলে একহেতে সেপাই। শ্রীপতি সেপাই নয়, মেজর রামচাঁদ কাপ্‌রের আর্দালি, হাবিলদার মেজর ভূপতির ভাই-বান্দা। ভূপতি বলে ভায়া, লোকে শোনে ভৃত্য।

শ্রীপতির ডান হাতটা নেই কন্‌য়ের ইঞ্চি দ্‌য়ের উপর থেকে। ডান পায়ে নেই তিনটে আঙ্‌ল, পায়ের পাতাটা দেখায় এবড়ো খেবড়ো। ডান গালের খানিকটা জ্‌ড়ে পোড়া দাগ। সেই অর্ধ নারীশ্বরের মত সে অর্ধেক বিকলাঙ্গ। ব্‌ঝি তাই ভূপতির ভাষায় তার দশ বিয়োনি ঊনত্রিশ বছরের ক্যারকেরে বৌ আদ্‌রি অঙ্গহীন দেওরকে নির্মম ভাষায় বিদ্রূপ করে বলে, সং না সং আমার শাউড়ির পেটের ডানা-কাটা কাত্তিক। ঠ্‌টো জগন্নাথ। শ্রীপতির প্রতি কোন বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ নেই শ্‌ধ্‌ বিধবা মেজবৌ আলোর। নামে আলো, কাজেও আলো। র্‌পেই যা একট্‌ আঁধার। তা আদ্‌রির যে কটা রং-এর অত দেমাক, তার চেয়ে এ আঁধারের ধারে কাটে অনেক গহন তল। আলোকে যদি মেঘনা বলি, আদ্‌রিকে পারি [illegible] দিতে খর পদ্মার আসনখানি। বলিহারী বাহাদ্‌রী তার, যে এ কালো র্‌পসীর নাম রেখেছিল আলো। এ যেন সেই কালার র্‌পে জগৎ আলা।......আদ্‌রির র্‌প আছে, রস নেই। গলায় আছে ক্‌ট। যে অর্থে নীলকণ্ঠ, সে অর্থে সে নীলকণ্ঠী নয়, নিশ্বাসে তার বিষ ঝরে। সে ব্‌ঝি আদ্‌রির আদর নেই বলে।

আজকের প্রভাতী আলো ভূপতির সৌভাগ্যসন্ধানী। আলো থাকলে তার ছায়া থাকে। যেন সে ছায়ার ঘোর পড়েছে শ্রীপতির ম্‌খে। আর আজকের আখ্যান বলতে গেলে বাদ দেওয়া যায় না আলো আদ্‌রিকে। কী করেই বা বাদ দেওয়া যায়।

ভূপতির সামরিক জীবনের উদ্দাম স্রোতে আদ্‌রি অক্‌লে ভেসে গিয়েও কোথায় যেন আটকে আছে। সেটা ভূপতির দেখবার নয়। জানে শ্‌ধ্‌, সে চলে এসেছে অনেক দ্‌রে যেখান থেকে ঘরের কাউকে দেখা যায় না কেবল আলোর কালো ম্‌খখানি ছাড়া। তার মিঠে কথা, যত্ন ঢালা সবই আলোর পিছে পিছে ভাস্‌রস্‌লভ ছদ্মবেশে চাট্‌কারের ম্‌র্তিতে ধাবিত। সে চাট্‌কথা বড় চাঁচাছোলা স্থ্‌ল ইঙ্গিতময়। ধ্যাবড়া লোমশ গরিলার চেহারাটার মতই তার চরিত্রটা। সে শ্‌ধ্‌ বোকা আর নিষ্ঠ্‌র নয়। সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতায় সে এক নতুন বাঙালী। সে বলে, ছিলাম জাতে নাপ্‌তে, হয়েছি মিলিটারি।

আলো আলেয়ার মত। আদুরির কথা বাদ দিই, কেননা এ ঘরে মেয়েমানুষ হিসাবে আলোর অস্তিত্বই তার কাছে জ্বালাময়। সব দোষ গুণের ঊর্ধ্বে। আদুরির কাছে সে সর্বনাশী রাক্ষুসী। ভাসুর ভূপতির নির্লজ্জ ব্যবহারে তার রাগবিরাগ বোঝবার যো নেই। ভাদ্দরবৌ পানা ঘোমটাটুকু আছে কিন্তু সেটা মুখখানি না দেখানোর চেয়ে দেখানোই যেন বেশী। নীরব বটে, তবু তার হাসি হাসি ঠোঁট দুটিতে যেন নিরন্তর কত কথার ঝকমকি! কটূক্তিতে প্রতিবাদ নেই, স্তুতির আড়ে প্রেমোক্তিতেও নেই আপত্তি। এতে যা বোঝার তা বোঝ। তবে এও বলি, ওই পর্যন্তই। এর পরের অদৃশ্য বেড়াটার নাগাল আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

সেই বেড়াটার গায়ে গায়ে মাথা খোঁড়ে হাতকাটা শ্রীপতি। এই দুরন্ত মিলিটারি ডিপোতে সে একটা বেখাপ্পা জীব। কথা বলে সে গোনাগাঁথা কয়েকজনের সঙ্গে। সিভিলিয়ান স্টোর ক্লার্ক অমলবাবু, বাগানের মালী গোপাল, ল্যানস্ নায়েক মুলক্‌সিং, আরও দুয়েকজন।

সে কখনো মুখ খোলে না ভূপতির বা আদুরির কাছে। এমন কি আলোর কাছেও খুবই কম। তবু এখানেই সে যেন রাধাবেশী কৃষ্ণসাধক। তার বুলি নেই, কিন্তু নিরন্তর সংশয়ের বেদনায় ও যন্ত্রণায় বুকটা তার মুচড়ে থাকে কেবলি। এ বেলার আলোকে সে ওবেলা বুঝতে পারে না, রান্নাঘরের মানুষটাকে চিনতে পারে না উঠোনের আলোর মাঝে। কী জ্বালা! সবহারার এক পাওনার মধ্যে যেন সব পাওনাই লুকিয়ে আছে। আর সে এক পাওনার হদিস মেলে না কিছুতেই। তাই যখন সে কথা বলতে যায় তখন তার ভাবনা বাড়ে, ভাবনার ভাবে মনটা করে হাহাকার।...সে তো রিক্ত নয়, অংগহীন। জন্ম অংগহীন নয়, প্রসূতি মায়ের সে ছিল বেদনাহারী নয়নমণি। আদুরে নাম গোরাচাঁদ। সে গোরাচাঁদকে পুড়িয়ে আধখানা করল ভারতের পূব সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্র। মায়ের পেট থেকে জন্মেছিল বিদেশীর সাম্রাজ্যে, সে সাম্রাজ্য বাঁচাতে গিয়ে পেয়েছে এই জঞ্জালের লজ্জা ও বেদনা।

ব্যারাক ও মিলিটারি কারখানায় এ জঞ্জালকেই তবু কেউ কেউ মানুষের মর্যাদা দেয়, যাদের সঙ্গে শ্রীপতি দু-দণ্ড কথা বলে। আর একটি নেশা আছে তার, বই পড়া। এ নেশাটা তাকে দিয়েছে স্টোর ক্লার্ক অমল। সেজন্য তাকে বিদ্রূপও বড় কম করে না ভূপতি ও তার বন্ধুরা।

আলো তার কাছে কিছু উন্দাম, খানিক সরব। হাসির ধারে রহস্যের চেয়ে কর্তৃত্ব বেশী। তাতে পরিস্ফুট নয় শ্রীপতির প্রতি করুণা মমতার চিহ্ন। উপরন্তু সে মনের সুতোকে দিয়েছে জট পাকিয়ে। একমাত্র ভূপতির আন্ডাবাচ্চাগুলির কাছে আলো মূর্তিমতী করুণামতী করুণাময়ী ধাত্রী। মায়ের চেয়ে কাকী তাদের আপন। কারণ বুঝি শিশুরা রূপের চেয়ে আদর বোঝে ভালো। এই কালো হাতের স্নেহটুকু বড় মিঠে। এই আলোকে আদুরি অভিশাপ দেবে না তো, দেবে কাকে। একে ছাড়া আর কাকে বলবে সে ভাসুর দেওর মজানী অসতী। শকুনে খাবলে খাক্ এ কথা আর কাকে বলবে সে।

তবু, শুধু আদুরি বলে নয়, সকলেই যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত এ সংসারে। আলো ব্যস্ত শুধু এ সংসার নিয়ে। আলো বিনা এ আঁধার। তবে এও সত্যি আলো ছাড়া এ ঘরের মরা মেজো ছেলে নৃপতির আর কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই। জানি না এ ঘরে সে স্মৃতির দাম কতটুকু। সে স্মৃতির আদর ও দুঃখ শ্রীপতিরই আছে একমাত্র বিশেষ করে। তার পোড়া গায়ে বুঝি এখনো নৃপতির রক্ত লেগে রয়েছে। তার মৃত্যু আর্তনাদ এখনো লেগে রয়েছে তার কানে। দাদার চিৎকারে সাড়া দিতে গিয়ে ভাই পুড়েছে। এখনো তার স্পষ্ট মনে আছে, নৃপতির মরতে মরতে সেই চিৎকার 'ছিপে পালা, পালা।' কিন্তু ছিপে, অর্থাৎ শ্রীপতি পালাতে পারেনি। রামচাঁদ কাপুর দু-ভাইকে মাড়িয়ে পালিয়ে ছিল গোরাসৈন্যদের সংগে। সেই একই রেজিমেণ্টের সংগে সংগে সে আজও ঘুরছে জঞ্জালের মত। সেদিনের সেপাই রামচাঁদ আজ ডিপোর ডিফেন্সের মেজর। পূবের শূন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বুঝি আজও নৃপতির অতৃপ্ত আত্মা হাহাকার করছে।

যুদ্ধের পরে, তবু এরই মাঝে এ সংসারটি গুছিয়ে গাছিয়ে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সামরিক বাঙালী পরিবারটির নীলাকাশের ঈশান কোণে বিরাট কালো মেঘের মত ভূপতি নতুনভাবে আবির্ভূত। দ্রুত ও সর্বনেশে তার ব্যাপ্তি। সে মেঘ ওখানে কোথাও মাথা হেলিয়ে বা উঁচিয়ে আছে ক্রেইনের মাথা। ডিফেন্সের মাঝ দরিয়ার যাত্রীবাহী নৌকার দিকে দেখে না, উপরন্তু যেন কুটিল ভ্রূকুটি করে মাঠের কুঁড়ের দিকে চেয়ে। ভূপতির মধ্যে যেন কিসের এক নেশা জেগেছে। আরও জাগছে ধীরে ধীরে। সে নেশার মাতলামি সব ভেঙে কেবলি তছনছ্ করতে চায়।

কুয়াশা সরে যাচ্ছে, বদল হচ্ছে ডিউটি। ডিপো জাগছে। সারি সারি ব্যারাক, গোলপাতার ছাউনির উপর ধূসর ত্রেপলের আস্তরণ। এ্যাজবেস্টারের ছাউনি দেওয়া ফ্যামিলি কোয়ার্টার, দেয়ালের রং সবুজে খাকী। পূব-উত্তর জুড়ে কারখানা। ভেহিকল্‌স্‌ আমর্স এ্যামুনিশান, বিরাট বিরাট স্টোর শেড্‌। এখানে ওখানে কোথাও মাথা হেলিয়ে বা উঁচিয়ে আছে ক্রেইনের মাথা। ডিফেন্সের আপিসবাড়ি, প্যারেডের ঘাস-পোড়া মাঠ। সব জাগছে আস্তে আস্তে কুয়াশা ভেদ করে।

ভূপতি গায়ের থেকে ঢাকনাটা খুলে ফেলল। লোমশ শরীরে তার শীতের কোঁকড়ানি নেই, আরামের আমেজ আছে। মুখের হাসি ছড়িয়ে পড়ছে বলিষ্ঠ শরীরের রেখায় রেখায়। ছোট ছোট জ্বলজ্বলে চোখ দুটোতে তার সে খুশির চকচকানি।

আধা উলঙ্গ ঘুমন্ত আদুরির দিকে চোখ পড়ল তার। হাড়সার ফর্সা আদুরি। ভূপতি দেখলে ন্যাংটো ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলোকে। তারপর খুশির দমকে লাফ দিয়ে উঠতে গিয়ে মাড়িয়ে ফেলল আদুরির একটা হাত। চকিত আঘাতের ব্যথায় ও বিস্ময়ে আচমকা জেগে আদুরি উঃ করে উঠল। ভূপতির মুখ অপ্রতিভ ও বোকাটে হাসিতে হাঁ হয়ে গেল।—'এ হে হে মাইরি দেখতে পাইনি।' বলেও সে হে হে করে হাসতে থাকে।

আদুরি বোধ করি স্বভাব দোষে হয়ে গেছে আদরকাড়ানি। তাই না থেমে কেবলি উঁ উঁ করতেই থাকে। ছেলেমেয়েগুলো সে শব্দে সদ্য-ঘুম-ভাঙা ভুতুড়ে চোখে চেয়ে থাকে। সামনে ভূপতিকে দেখে তারা সিঁটিয়ে যায়। ভাবে মনে হয় যেন সামনে তাদের যম দেখেছে।

ভূপতির হাঁ-টা ছোট হয়ে জিভ্‌টা একটুখানি বেরিয়ে পড়ে, একটা তীক্ষ্ন রেখা বেঁকে উঠে ভ্রূর পাশ দিয়ে। চকিতে হাসি মিলিয়ে একটা ক্রুদ্ধ মোষের মত সে ফোঁস করে ওঠে, 'আরে, আদরে আর বাঁচে না যে।'

অমনি আদুরির গলার স্বর একটু নেমে যায়, কিন্তু একেবারে থামে না। হাতের ব্যথা সারলেও আসল ব্যথা যে সারে না। আবার হাসে ভূপতি। এই হাসে, এই ক্ষ্যাপে। একটা অদ্ভুত জান্তব বোকাটে ভাব। হ্যা হ্যা করে হাসতে হাসতে সে বেরিয়ে গেল। তার পদভারে কেঁপে কেঁপে উঠল ফ্যামিলি কোয়ার্টারের পাঁচ

ইঞ্চি দেয়াল।...দরজা খুলে বেরুবার মুখে বুঝি খুশির তাল সামলাতে না পেরেই একটা হোঁচট লাগল কাঁথা ঢাকা শ্রীপতির শরীরে। এমন সুদিনে ঘর থেকে বেরুতেই হোঁচট। দাঁতে দাঁত চেপে এক হ্যাঁচকায় শ্রীপতির গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল সে।

শ্রীপতির ভাবলেশহীন পোড়া মুখটা বেরিয়ে পড়ল। চোখে তার ঠাণ্ডা নির্নিমেষ চাউনি, অপলক।

যে চাউনি দেখলে ভূপতি ক্ষেপে ওঠে আরও বেশী। কিন্তু ভূপতি হাঁ করে হাসে। বলে, 'ওঠ না জেনারেল সাহেব।'

পরমুহূর্তেই খ্যাঁক করে ওঠে, 'কাজ করবে নুলো এক হাতে, আবার ঘুম মারে দুকুর অবধি।' বলে শ্রীপতির কাটা হাতটা ধরে টান দিল। আশ্চর্য, শ্রীপতির ভালো হাতটা ধরে না সে।

ভূপতি ভাইকে শালা বলে। শুধু শালা নয়, সবই বলে। কিন্তু চিরকালই বলত না। বলে, যবে থেকে সে হয়েছে দুর্ধর্ষ মিলিটারি, মনে প্রাণে পেয়েছে পুরোপুরি সৈনিকের মেজাজ।

তার শক্ত মুঠি থেকে শ্রীপতি ডানাটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। ভূপতি আরও জোরে সাঁড়াশীর চাপ দিতে দিতে বলে, 'উ, নুলোর তেজ খুব।'

এ হাত ছাড়াবার দৃশ্যটি যেমন হাস্যকর তেমনি মর্মস্পর্শী। শ্রীপতির শরীরটাই খালি দুলতে থাকে এপাশে ওপাশে আর অদ্ভুত অভ্যাসবশতঃ নাকের ভেতর থেকে শব্দ বেরোয় ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে। খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে ভূপতি। যেন বোবা জানোয়ার......হাসলে মুখটা হাঁ হয়ে চোখ দুটো কুঁচকে যায় তার। রাগলে হয় চোখ গোল আর জিভ্‌টা সামনে বেরিয়ে যেন লক্‌লক্‌ করে সাপের মত।

আর একটা টান দিয়ে শ্রীপতিকে সে প্রায় দাঁড় করিয়ে দিল। চট্‌ করে হাসিটা থেমে গিয়ে ভ্রূর পাশে রেখাটা বেঁকে উঠল তার।—'থাম্‌ থাম্‌ বলছি। জোর করলে মারব ঘুষো!'

শ্রীপতির চোখ দুটো নীরবে ধুক ধুক করে জ্বলতে থাকে। জ্বলুনিটা অসহায়।

'কাঁচা কয়লা পুড়িয়েছিলি?'

'না।'

'না তো, তোকে ধুয়ে আমি জল খাব? ফের ওরকম চেয়ে থাকবি তো দেব চোখ গেলে। ওসব আর চলবে না বুঝেছ চাঁদ?' বলতে বলতেই তার বিস্ফারিত হাঁ মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলে, 'আজকে তো' হেঁ হেঁ, দেখিস্ কি হয়। খুব তো কেতাব পড়িস, মিলিটারিম্যান হতে পারিস্? যা যা, আজ একটু বাসন টাসন মাজগে, আবার বাজারে যাবি।' বলতে বলতেই তার নজর পড়ে আলোর দিকে। অমনি তার মুখটা আরও বোকাটে ও বিগলিত হয়ে ওঠে। তার রাগ আহ্লাদ শোক কোন কিছুই চাপতে শেখেনি সে। যখন যা তখন তা। শ্রীপতিকে ছেড়ে দিয়ে সে প্রায় ভাদ্রবৌ আলোর গায়ে গিয়ে পড়ে।

আলো রোজকার মতই উঠোন ঘর পরিষ্কার করে, বাসন মেজে ধুয়ে স্নান সেরে ফিটফাট। তেমনি ঘোমটা টানা, নির্বাক, নাম-না-জানা হাসি ঠোঁটে। যে হাসিটা দুরন্ত বাতাসের মত আয়ত্তের বাইরে। আপনি আসে। চলেছে উনুন ধরাতে, ভাসুরের খাবার তৈরি করতে।

'হেঁ হেঁ......বৌ যে! এর মধ্যেই নেয়ে টেয়ে নিয়েছ?' বুঝি আলোর হাত মনে করেই নিজের একটা হাত অন্য হাতে চাপতে থাকে। যেন ছোঁয় ছোঁয় তবু পারে না। 'হেঁ হেঁ, তা বেশ করেছ। একটু সাবান টাবান মাখলে পারতে। ওবেলা একটু সাফ টাফ হয়ো। তুমিই তো দেবে থোবে। কত লোক আসবে। মেজর, ক্যাপটেন, সুবেদার মেজর, টেক্‌নিকাল জমাদার, কর্নেল সাহেব মিলার।......' লেঃ কর্নেল মিলার মানে ভূপতিদের গাঁয়ের মদন কৈবর্তের ছেলে কালীচরণ। কালীচরণ এক গোরার পোষা ছেলে ছিল। তারপরে কালে কালে কৈবর্ত থেকে কারেস্তান হয়ে মিলিটারিতে ঢোকে। এখন হয়েছে লেফটেনেণ্ট কর্নেল। আজকের ভূপতির মতই সেদিন ধাপে ধাপে কালীচরণ উঠেছিল, কালীচরণ কখনো কালীচরণ, কখনো কে, সি, মিলার। কলিসন্ বলেও কেউ কেউ ডাকত মোটা জিভ্‌ওলা গোরারা। এই কালীচরণই ভূপতিদের তিন ভাইকে মিলিটারিতে ঢোকবার সুযোগ করে দিয়েছিল।

কর্নেলের নামটা শুনে আলোর হাসি ঠোঁট একটু বেঁকল, একটু কুঁচকে উঠল বাঁ চোখের কোল। তারপর ভ্রূ তুলে তাকাল শ্রীপতির দিকে। শ্রীপতি

অপলক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকেই। মুখের তার যত ভাব সব বোধহয় এই পোড়া জায়গাটাতেই ফোটে তাই কিছু বোঝা যায় না।

আলো আবার তেমনি হাসে। একটু বা সরস কিম্বা একটু যেন চকিত বিষাদের আভাস তার ভ্রূভঙ্গিতে। সে আবার বাঁক ফেরে রান্নাঘরের দিকে।

ভূপতি আবার তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার লোমশ হাত পা নিশপিশ করে যেন কিছু একটু টিপে ধরে দুমড়ে ফেলার জন্য।—'আজ কিন্তু মাইরি তোমাকে...না, তোমার লজ্জা আর কাটে না। হ্যাঁ, দোপেঁয়াজী পাকাবার কেরামতি আজ তোমাকে দেখাতে হবে। শালা খেয়ে যেন কেউ ভুলতে না পারে।' কথা শেষের আগেই ভূপতির প্রাণ ভুলিয়ে আলো রান্নাঘরে চলে যায়। ভূপতি তবু গোল গোল চোখে হ্যা হ্যা করে হাসে। মাথা দুলিয়ে ফিরতে গিয়ে নজরে পড়ে শ্রীপতি তেমনি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। আদুরির উঁ উঁ ঘ্যানঘেনানি তখনো বন্ধ হয়নি। কিন্তু কান পাতলে শোনা যায়, আসলে সে বাছা বাছা গালি ও শাপমন্যিতে শেষ করে ফেলছে আলোকে। শুধু আলো নয়, তার মধ্যে নামহীন ভূপতি শ্রীপতিও আছে। এবং এ চলবে সারাদিনই।

হঠাৎ বাজপড়ার মত চিৎকার করে উঠে ভূপতি শ্রীপতির প্রতি, 'যৌ শালা এখান থেকে...যৌ।...' যেন কোন বিদ্রোহী সিপাইকে সে হুকুম করছে।

পোঁ পোঁ করে প্রথম ভেরী বেজে উঠল আপিস ব্যারাক থেকে। সময় ঘনিয়ে এল প্যারেডের। দুপদাপ করে ভূপতি কলঘরের দিকে চলে গেল। শ্রীপতি চলে যায় না, উবু হয়ে বিছানাটা গুটোয় এক হাতে। মনের ধন্দের ভারে সে যেন কুঁজো। ধন্দ তার জীবনের, ধন্দ আলোর। আলোর প্রতিবাদহীন দুর্বোধ্য হাসির।

আলো রুটি বেলে আর ফিরে ফিরে দেখে দরজার দিকে। এখন তার হাসি নেই, চোখে যেন একটা গাঢ় চিন্তার ছায়া। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মত যেন কি ফোটে আর উঁকি মারে দরজার দিকে।

ভূপতি স্নান করতে গেছে। ছেলেমেয়েগুলো সুযোগ বুঝে এক ঝাঁক চামচিকের মত সড়্‌সড়্‌ করে ছুটে এসে আলোকে ঘিরে বসল। মুখে তাদের কথা নেই। হাজার ভাষা চোখে।

আলো বলল, 'তোরা এখন কাকার কাছে পড়তে বোস্‌ তো আমার ঘরে গিয়ে।' নির্বাক পুতুলের মত তাকিয়ে রইল ছেলেমেয়েগুলো। একজন ভরসা করে ফিস-

ফিসিয়ে বলল, 'কিন্তু বাবা যে আজকে......'

তা বটে। একে তো লেখাপড়া কাউকে করতে দেখলেই ভূপতি রুষ্ট হয়ে ওঠে, ঠাট্টা করে। তার উপরে আজকে ভাসুরের তার বড় সুদিন। তারই উদ্দাম ঝড়ে আজ আর সব যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তবু আলো বলল, 'তোদের বাবা বেরিয়ে গেলে খাস্, এখন চলে যা।'

কথা নয়, মিষ্টি গান। ছেলেমেয়েগুলো যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে অসীমে মিশে গেল আলোর দৃষ্টি। কী যেন ভাবছে সে।... কী ভাবছে!...তাদের সেই গাঁয়ের ছায়াচ্ছন্ন কুঁড়ের কথা নাকি? তার শ্বশুরের ভিটা। দুরন্ত অভাবে পড় পড় ঘড় ঘড় ভাব রাতদিন। শ্বাশুড়ি ছিল না। শ্বশুর অথর্ব। তিন ভাই, দুই বৌ। আদুরি তখন কত সুন্দর, কী শান্ত! আলো ছিল নৃপতির খেলার পুতুল। সেই অভাবেও। উদার কিশোর শ্রীপতি, পিঁপড়ে মারতে পারত না, কেষ্টযাত্রার গান গেয়ে বেড়াত সারাদিন।...এল গাঁয়ে মদন কৈবর্তের ছেলে কালীচরণ। মস্ত সাহেব একেবারে। এসে একজন দুজন নয়, একেবারে তিন ভাইকে নিয়ে গেল। লক্ষ্মীর ভাঁড়ারের কুলুপকাটি ছিল তার হাতে। কিন্তু সেদিন বালিকা হলেও সুন্দরী আদুরির উপর কালীচরণের লুব্ধদৃষ্টির কথা ভোলেনি সে। তারপর...আবার রুটি বেলতে থাকে আলো।

তারপর বঙ্গীয় উনপঞ্চাশ রেজিমেন্ট! চাপা উল্লাসে থ্যাবড়া মুখে চাপা হাসি নিয়ে ভাবে ভূপতি। ইউনিফর্ম পরে ধোপদুরস্ত। ভারতীয় খাকী রং যেন পচা পোনামাছের পিত্তির মত। রেজিমেন্টও নামেই বঙ্গীয়, আসলে খিচুড়ি। পৃথিবীর সব জাতের লোকই বোধহয় তাতে ছিল। ফরটিনাইন বললেই বোঝা যেত।...কালীচরণ তখন সুবেদার মেজর। ভূপতির তিন ভাই সেপাই।...কালীচরণ সম্মানে বড় হলে কি হবে, ভূপতিকে বন্ধুর মত দেখত। বলত, 'বৌটি তোমার খাসা।' ভূপতি তখন শুধু হাসতে জানত, রাগতে জানত না। সেটাও শিখিয়েছে তাকে কালীচরণ। ওদিকে লড়াই-এর ঝোঁকে আদুরির যৌবনের পাল্লাটায় বয়সের মাদকতা পড়ে গিয়েছিল। সে কথাটা কালীচরণ আর মনে আনেনি।

ভূপতি ভাবছে নৃপতির কথা। আশ্চর্য মন তার। নৃপতির কথা মনে হতে

বিশাল বুকটা মুচড়ে উঠে কান্না পেল তার। বিকৃত হয়ে উঠল তার মস্ত মুখটা।... কিন্তু বাঁ হাতের মণিবন্ধে তাজটা বাঁধতে গিয়ে সে ভাবটা কেটে উঠল। হাবিলদার মেজরের চিহ্ন ওই তাজ, আর ওই তাজ বাঁধা আজই শেষ।

সে কথা মনে হতেই তার মুখের ভাব গেল পাল্টে। চোখ দুটো কুঁচকে মোটা মোটা দুটো ফাঁক হয়ে হাঁ করে ফেলল সে। তার নীরব হাসি। কিন্তু খুসির দমক চেপে রাখতে না পেরে একটা অদ্ভুত হেঁ হেঁ শব্দের একটানা গোঙানি বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

কান্না বন্ধ করে আদুরি ভয়ে ভয়ে সামনেই বসেছিল শরীরটা সিঁটিয়ে। কেননা ভূপতির আচমকা রাগকে কেউই বিশ্বাস করতে পারে না। হাসি শুনে সে ফিরে তাকাল।

ভূপতি তার দিকে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে খুশিতে চাপা হুংকার দিয়ে বলে উঠল, 'আজকেই এটা শেষ। কালকেই একটা তারা খসে পড়বে কাঁধে, আসমানের সোনার তারা দেখিস্।' গরিলার মত বুক চাপড়ে সে হ্যা হ্যা করে উঠল।—'আমি আর হাবিলদার মেজর নই, জমাদার......আজ থেকে জমাদার।' হঠাৎ গলাটা চেপে ফিস-ফিসিয়ে উঠল, 'তারপর সুবেদার, সুবেদার মেজর, ক্যাপটেন, মেজর......লেঃ কর্নেল। ......পরমুহূর্তেই নাটকীয়ভাবে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে আদুরিকেই একটা সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল বুটের খট্ খট্ শব্দ তুলে।

আদুরি আবার উঁ উঁ করে উঠল, বোধ হয় ব্যথাটা আবার চাগাড় দিল।

রান্নাঘরের দিকে যেতে হঠাৎ ভূপতি আলোর ঘরে ঢুকল।

বাচ্চাগুলো নিশ্চল হয়ে গেল কলবন্ধ পুতুলের মত। পড়তে বসেছে সকলে, পড়াচ্ছে শ্রীপতি। কিন্তু সবাই নির্বাক। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল ভূপতির দিকে। সে বলে, লেখাপড়া শিখে কি হবে, শরীরে শক্তি চাই, সবাইকে মিলিটারিম্যান হতে হবে। কিন্তু ভূপতি এখন রাগেনি, সে বিভোর আপনাতে। মুখ তার হাসিতে বিস্ফারিত। শ্রীপতির কাছে গিয়ে তার কাটা ডানাটাকে একটু সুড়সুড়ি দিয়ে বলল, 'আচ্ছা বল্, তোর ঐ অমল কেলার্ক কি পাশ?'

শ্রীপতি প্রশ্নটার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে একটু গর্বভরেই বলল, 'এম, এ, পাশ।'

'কত টাকা মাইনে পায়?'

'—এক শো'

ভূপতি তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখিয়ে বলল, 'এর টিপ সই দিয়ে আমি কত পাই?'

শ্রীপতি নির্বাক। ভূপতি হা হা করে হেসে উঠে বলল, 'তোর এম-এ পাশ কেলার্কের ডবল, বুঝলি।......'

ভূপতির ব্যাটারা হবে এক একটা মেজর, ক্যাপটেন, ওসব কেরানী টেরানী নয়।'

বলে সে ছেলেমেয়েগুলোকে বলল, 'চল্ সব, আমার সঙ্গে রুটি খাবি।'

হয়তো আ[illegible]র আহ্বান এবং তাদের জীবনে হয়তো এই প্রথম। কিন্তু এ যেন যমের ডাক। তারা সবাই চলল রান্নাঘরের দিকে। শ্রীপতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তার পোড়া মুখটা নিয়ে।

ভূপতি হাসতে হাসতে বক্‌বক্ করতে করতে খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় আলোকে বলল, 'হে' হে' দেখো বৌ, আজকে আমার মানটা রেখ।'

শ্রীপতিকে বলল, 'চল্‌রে জগন্নাথ, বাজারে যাবি প্যারেডের পরে।'

আদুরির গলা বেড়ে উঠল, এবার আর অস্পষ্ট নয় তার গালাগালি, উহ্য নয় কারো নাম। বিশেষ করে আলোর প্রতি সে ক্ষমাহীনা।

শ্রীপতি তার কাটা ডানাটা বাঁ হাতে চেপে তখনো তেমনি বসেছিল ঘরের কোণে আঁধারে। তার অপলক চোখের দৃষ্টি রান্নাঘরে আলোর উপর। চোখে আবার তার সেই সংশয়, সেই ধন্দ।......এসব কাটিয়ে সে বারবার পালিয়ে যেতে চেয়েছে এই মিলিটারি ডিপো থেকে। চলে যেতে চেয়েছে এই আওতা থেকে অঙ্গহীন শরীরটাকে নিয়ে তার ইনভ্যালিড জঞ্জালের লজ্জা নিয়ে।

কিন্তু পারেনি। তার ইনভ্যালিড জীবনে আর একটি বেদনা লুকিয়ে আছে মনের অন্ধ কোটরে। সে কখনো কাঁটার মত ফোটে। কখনো দুলিয়ে দেয় অশান্ত দোলায়। ইস্! পোড়া মুখে তার একি গোপন স্বপ্নের ছায়া।......ন-টাকা যার সরকারী পেন্সন, ঝাড়ুদারের ডেজিগ্‌নেশনে মেজরের আপিস বয়ের কাজ করে যে পায় কুড়ি টাকা মাইনে, সেই বিকলাঙ্গের মনে কেন মানুষের আকাঙ্ক্ষা!

মনটা বুঝি মানে না বাইরের অঙ্গটাকে। সেটা যেন কারো খনি গর্ভের সোনা, কারো কয়লা।

বার বার সে ফিরে ফিরে তাকায় আলোর দিকে। আলো নয়, আলেয়া। আলেয়ার মায়ার কি কোন শেষ নেই? আলো এসে ঢুকল ঘরে বাটিতে রুটি নিয়ে। ঘোমটা খানিক টেনে খসিয়ে ভ্রূ তুলে বলল, 'মাছ যে টোপ গিলে ফেলল।'

গলার স্বরে চমকে যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল শ্রীপতি। বলল 'অ্যাঁ?'

চাপা হাসি দুর্বার হয়ে উঠল আলোর মুখে। ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'অ্যাঁ নয়, আমি কি তোমার মাছ ধরা ছিপের ফাতনা যে অমন করে তাকিয়ে আছ?'

এমনি থেকে থেকে একটা কথা বলে আলো। গলায় ঝাঁজ আছে, কিন্তু সে ঝাঁজ যেন কিসের।

লজ্জায় যেন কুঁকড়ে যায় শ্রীপতি, একটা ঝাপসা রেখা ফোটে তার পোড়া গালে, অহেতুক নড়তে থাকে তার কাটা ডানাটা।

'কেবলি কী দেখ অমন করে?' আরও চেপে আসে আলোর গলা।

কী দেখে শ্রীপতি।......ছি সে কথা কি বলা যায়! সে যে বড় লজ্জার। ইনভ্যালিড সোলজারের সবদিকেরই লজ্জা। অবস্থায়, ব্যবস্থায়, সম্পর্কে, নিরন্তর অপলক চোখে সে শুধু চেয়ে থাকে।

কিন্তু আলোর যে হাসি আপনি আসে, সে হাসি আপনি যেন কোথায় উধাও হয়ে যেতে চায়। চেষ্টা করেও ধরে রাখা যায় না। কালো মুখে দেখা দেয় আষাঢ়ের আভাস।......সে তাড়াতাড়ি রুটির বাটিটা রেখে চলে যেতে গিয়ে আবার দাঁড়ায়। কিন্তু শ্রীপতির দিকে ফেরে না। বলে 'আজ সন্ধে বেলা যেন কোথাও যেও না।'

'কেন?'

'লোকজন খাবে যে।'

'তুমিই তো আছ?'

'আমি একলাই বুঝি অত লোককে খাওয়াব?' অভিমান ফোটে আলোর গলায়।

'বেশ, যা খুশি তাই করো। তোমাদের তো কিছু বলার নেই।' বলে সে বেরিয়ে গেল।

শ্রীপতির মুখে এসে পড়েছিল, 'তোমার ভাসুরকে নালিশ করে দিও। কিন্তু এত বড় কথা বলতে পারে না সে। তাছাড়া আলোর ওই গলার স্বরই তো যত ধন্দ লাগায়। ওই মুখই এক বিচিত্র হাসি নিয়ে তার দুর্দান্ত ভাসুরকে কি করে প্রশ্রয়

দেয়। নাকি আলো প্রকৃতপক্ষে কোন সর্বনাশের তল কেটে চলেছে?

প্যারেড শুরু হয়ে গিয়েছে। আজ প্যারেড করাচ্ছে ভূপতি একলা। কোন নায়েক বা হাবিলদার নেই। দীর্ঘ বাহিনীকে ভূপতি পরিচালনা করছে। অন্যান্য অফিসারেরা দেখছে। লেঃ কঃ কালীচরণ মিলার পাইপ্ কামড়ে ধরে দেখছে ভূপতিকে। তার কড়া গালের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি। তার হাতে গড়া ভূপতি, একটুও হিমসিম খাওয়ার নাম নেই। ঘাস পোড়া মাঠে ধুলোর ঝড় ওঠে প্যারেডের ঢেউয়ে। কারখানা এলাকায় ভিড় করছে শ্রমিকরা। এখনো কাজের ঘণ্টা পড়েনি। তাই কেউ কেউ দূর থেকে দেখছে প্যারেড্।

টেকনিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের মিলিটারি অফিসারেরা এখনো কেউ বেরোয়নি কোয়ার্টার ছেড়ে। তাদের নেই প্যারেডের দায়। ডিফেন্সের অফিসারদেরই শুধু হাজির থাকতে হয়।

আকাশ নীল। কুয়াশা নেই। কাঁচা রোদে তবু ঝলমল করে না ডিপো। সবখানে ছড়িয়ে আছে খাকী রংএর ধূসরতা। ক্রেইন্ থেকে শুরু করে সারিবন্ধ ট্রাক পর্যন্ত।

শ্রীপতি চলেছে ভূপতির পুরনো প্যাণ্ট আর সার্ট গায়ে দিয়ে, ডান দিকে একটু ঝুঁকে। সে দূর থেকে উঁকি দিয়ে দেখল, প্যারেডের ওখানে মেজর রামচাঁদ কাপুর রয়েছে। ওদিকে সে কখনোই পারত পক্ষে দেখে না। কোন মিলিটারি অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না বেশীক্ষণ। কিসের নাকি গন্ধ লাগে তার নাকে। এই ব্যারাকের গন্ধও তার সয় না। তাই প্রায়ই তাকে ফ্যাস ফ্যাস করতে দেখা যায়। ভূপতি তাকে মেরেও পারেনি রিবন্ পরাতে। শ্রীপতি ঢুকে পড়ল আপিস সংলগ্ন বাগানে। বাগানের মালী গোপালের সংগে তার অদ্ভুত বন্ধুত্ব। বলে, 'গোপালদা সব কাজ সবাই পারে, তোমার মত ফুল ফোটাতে পারে না কেউ।' গোপাল তাকে কিঞ্চিৎ পাগল ভাবলেও সে খুশি।

গোপাল নরম রোদে পিঠ দিয়ে গোলাপ চারার সেবা করছে। শ্রীপতি তার কাছে এসে বসে পড়ল। কিসের যেন একটা উত্তেজনা রয়েছে তার মনে। একটা অদ্ভুত বৈরাগ্য ও আনন্দে ভরপুর। ঠোঁটে মিটমিট করছে হাসি। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা গোপালদা।'

'বল।' কাজ করতে করতেই গোপাল জবাব দেয়।

'সেই বারান্দার কাটা গোলাপ গাছটা তুমি জাঁইয়ে তুললে তো?'

'তা তো তুললামই।'

'ফুল ফুটেছিল?'

গোপাল একগাল হেসে বলল, 'বাঃ, সেদিনে বড় সাহেবের টেবিলে দেখনি? এত বড় ফুল ফুটেছিল।'

বড় সাহেব মানে কালীচরণ। শ্রীপতির আর কোন জবাব না পেয়ে গোপাল ফিরল। দেখল শ্রীপতি আপন মনে মাটির দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

মুখ তুলতে দেখা গেল শ্রীপতির এক হাসি ও ব্যথার বিচিত্র ভাব। বলল, 'কিছু না।'

'কিছু না আবার কি? বল না।'

শ্রীপতি কাটা হাতটা বাঁ হাত দিয়ে খানিকক্ষণ ডলে ডলে হঠাৎ মুখ নামিয়ে বলল, 'আচ্ছা কাটা গাছে তো ফুল হয়। আমার...মানে, ধর যদি কখনো ছেলেপুলে হয় তবে পুরো হাত-পাওলা হবে তো?'

প্রশ্ন করেই তার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে জবাবের প্রত্যাশায়।

গোপাল হো হো করে হেসে ওঠে।—'কেন হবে না? অন্ধের ছেলে কি অন্ধ হয়, না বোবার ছেলে কথা বলে না। মানুষ তো গাছ; একটা আধটা ডাল কাটলে কি তার ফল ধরে না? নাকি খুঁতো ফল ধরে?' বলে তারপর রহস্য করে বলে, 'কেন, বে করছ বুঝি?'

বিয়ে? যেন পোড়া গালে থাবড়া খেল শ্রীপতি। তাড়াতাড়ি উঠে সে নুলো হাত নাড়তে নাড়তে আপিসের দিকে ছুটে গেল।—'না না ছি ছি......'।

মেজরের চেম্বারের বাইরে টুলটায় সে দম আটকে বসে রইল।......ওইখানে সঙ্গীন নিয়ে সেপাইরা প্যারেড করছে, ওখানে সারি সারি ট্যাঙ্ক, এদিকে কাতার দেওয়া ট্রাক। কাছেই ওই বিরাট শেডটার মধ্যে কামান বন্দুক ঠাসা। ওই তার দাদা, বোকা ও নিষ্ঠুর ভূপতি উন্নতির উন্মাদনায় পাগল, আর সে একটা হাতকাটা ইনভ্যালিড সেপাই। এখানে বসে সে ভাববে বিয়ের কথা! তার আবার বিয়ে!...

তবু হায়রে মন, আলেয়ার কথা ভাবতে বুঝি তোর ভালো লাগে।

প্যারেড শেষ। ওদিকে কারখানার হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠে।

মেজর রামচাঁদ কাপুর আসছে। শ্রীপতি উঠে তাড়াতাড়ি চেম্বারের দরজাটা বাঁ হাতে খুলে ধরে। মেজর ঢুকতেই আবার দরজা বন্ধ করে দেয়। লেঃ কঃ কালীচরণের পাশে পাশে নীরব হাসিতে হাঁ করে আসছে ভূপতি। যেন শিকারীর পাশে পোষা গরিলা। কালীচরণকে এগিয়ে দিয়ে ভূপতি এসে ঢোকে মেজরের ঘরে। দেখে মনে হয় শ্রীপতিকে সে চেনেই না। একটু পরে আবার বেরিয়ে আসে। এসে শ্রীপতির সামনে দাঁড়াতেই তার মুখের হাসিটা চকিতে মিলিয়ে চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল। ভ্রূর রেখাটা বেঁকে গিয়ে লক্‌লক্‌ করে উঠল জিভ্‌টা। বলল, 'চল্‌ বাজারে।'

শ্রীপতি ডানদিকে ঝুঁকে ঝুঁকে চলল পিছে পিছে। আপিস বাড়ির পিছনে নির্জনে এসেই ভূপতি আচমকা খপ্‌ করে শ্রীপতির সার্টের কলার চেপে ধরল। 'তুই সব অফিসারকে দাঁড়িয়ে সেলাম করিস, আমাকে করিস না কেন?' শ্রীপতি অবাক্‌। সে হাসবে কিনা বুঝতে পারল না। ঘৃণায় কুঁচকে উঠল তার ঠোঁট দুটো। 'ওসব ভাই টাইয়ের খাতির নেই, বলে দিলাম। অফিসার তো অফিসার। আবার যদি কোনদিন দেখি' একটা ঠেলা দিয়ে ছেড়ে দিল ভূপতি শ্রীপতিকে। যেন ফাঁসির আসামীকে মুক্তি দিয়ে আবার চলতে শুরু করল সে।

শ্রীপতির চোখে আগুন জ্বলে উঠল। যেন পারলে এখুনি ভূপতির মাথাটা সে ধুলোয় লুটিয়ে দেয়।

কিন্তু ভূপতির মুখে আবার হাসি, গলায় সেই গোঙানি। বলে, 'তুই ভালো মাংস চিনিস্‌? কচি পাঁঠা কিনতে হবে।...আর দ্যাখ ছিপে, তুই সন্ধেবেলা টুপিটা মাথায় দিয়ে গেটে দাঁড়াস্‌, একটা খুব এস্টাইল হবে, হেঁ হেঁ।...' শ্রীপতি তার পোড়া মুখে এবার সত্যিই হেসে ফেলে।

এল সেই বহু প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা। কিন্তু ভূপতির মাতন লেগে গেছে বিকাল থেকেই। সে কখনো দোপেঁয়াজী চাখছে, অতিথি সংকারের পানীয়ের বোতলে চুমুক দিচ্ছে থেকে থেকে। হ্যা হ্যা করে হাসছে, সব বালাই কাটিয়ে ঢলে ঢলে পড়ছে আলোর গায়ে। আজ আর কোন মানামানির নিষেধ মানতে রাজী নয় সে। বুঝি হাওয়া লেগেছে ঈশান কোণের কালো মেঘটায়। ঝড় আসছে। কখনো ভূপতি

আদুরিরও গাল টিপে দিচ্ছে আর আলোর কাছে এসে বলছে, 'মানটা রেখ বৌ, মাইরি। আমি তো আছি তোমার জন্যে হে' হে'!'—এ মান রাখবার কথার মধ্যে এক সাংঘাতিক মতলব যেন পরিস্ফুট। তবু সংশয় কাটে না আলোর। সে সংশয় এতদিন ঘর করার গৃহস্থ মেয়ের সংশয়। সংশয় ভাসুরের বোকামি ও নিষ্ঠুরতার শেষ তলটুকু না জানার। সংশয় ভূপতির চোখে। আলো এখনো নির্বাক, তবু ঠোঁটে হাসি। সর্বনাশী আলেয়া! বুঝি মিথ্যা এ সংশয়ের বোঝাটানা।

ভূপতির মাতনের সুযোগে আদুরি প্রাণ খুলে দেয়ালের দিকে ফিরে গালাগাল দিচ্ছে আলোকে। হে ভগবান, এত যন্ত্রণায় আদুরি যদিও বে'চে থাকে, কুলটা আলোর মাথায় এখুনি বজ্রাঘাত করে তুমি ওকে মেরে ফেল! আলো ফর্সা কাপড় পরেছে। ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে একটা ঘরে বন্ধ করে দিয়েছে। সব গুছিয়ে গাছিয়ে সে প্রস্তুত। অতিথির প্রতীক্ষার আড়ে রইল সে চেয়ে শ্রীপতির ব্যথিত সন্ত্রস্ত মুখের দিকে।

অতিথিরা এল ঘোর সন্ধ্যায়। জমাদার, সুবেদার, ক্যাপটেন, মেজর, লেঃ কর্নেল। জুতোর মস্ মস্ খট্ খট্ শব্দে ভরে গেল কোয়ার্টারের ছোট আঙিনা। বড় কম কথা নয়, লেঃ কর্নেল এসেছে।

কালীচরণের জন্যই তো এ ভোজসভা, সে-ই প্রধান অতিথি। অতিথি দেবতা। তার ভোগে অদেয় কিছুই নেই। পরিবেশনে লেগে যায় আলো, এগিয়ে দেয় শ্রীপতি। খাওয়ার শব্দ থেকে আস্তে আস্তে কথার খই ফোটে। তারপরে হাসির বন্যা। পেটে সকলের পানীয় পড়তেই কথা-হাসির রংও পালটে যায়।...... জিন্দাবাদ জমাদার ভূপতি। এখন আর কারো পদমর্যাদার বালাই নেই, তারা সবাই সমান। যাকে বলে, ডেমোক্রেসি।

আলো অবাক হয়ে দেখল, কালীচরণও ভূপতির মতই হ্যা হ্যা করে হাসে। হাসতে হাসতে কালীচরণ বলল, 'জিন্দাবাদ দোপে'য়াজী।' সে চোখের ইসারা করল আলোকে। অমনি ভূপতি আলোকে ঠেলে দিল কালীচরণের দিকে।

কালীচরণ চোখ টিপল জমাদার ভূপতিকে। বলল, 'নাইস্ রান্না করেছ মাংসটি। হাত দাও, তোমার সঙ্গে সেক-হ্যাণ্ড করি।' আলো তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। অমনি সবাই হা হা করে হেসে উঠল।

ভূপতিও বাইরে বেরিয়ে এল। মদে সে চুরচুর। বলল ফিসফিস করে, 'এবার সব চলে যাবে, খালি কর্নেল থাকবে মাইরি বৌ, দেখ আমি দু দিনে ক্যাপটেন হয়ে যাব। হেঁ হেঁ......'

বলে সে খাবার ঘরে গেল।

আলো দেখল কেউ নেই অন্ধকার উঠোনে। ছেলেমেয়েগুলো জানলা দিয়ে উঁকি মারছে ভীত চোখে, কিছুটা বা মজা দেখবার আশায়। আদুরি সেই ঘরের দরজার কাছে রয়েছে দাঁড়িয়ে। শ্রীপতি আশ্চর্যরকম নির্বিকারভাবে হাঁটুতে মাথা দিয়ে বসে আছে।

কিন্তু আলো আর সে আলো নেই। কোথায় হাসি, রক্তও নেই তার ঠোঁটে। মিথ্যা আশা, রেহাই নেই ভূপতির মতলব থেকে। এখুনি কালীচরণ তাকে দু-হাতে সাপটে গ্রাস করবে।

চকিতে সে শ্রীপতির কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত কি ভেবে তার বাঁ হাত ধরে টান দিল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'শুনছ, চল পালাই।'

যেন ঘুমের ঘোর ভেঙে বলল শ্রীপতি, 'কেন?'

'কেন আবার কি! মরতে বলছ?' গলায় তার ত্রাস ও কান্না।

এক মুহূর্ত থমকে থেকে কি বুঝল শ্রীপতি কে জানে। হঠাৎ ঝাড়াপাড়া দিয়ে উঠে বলল, 'চল।'

চকিতে দুটো তারার মত তারা উঠোন পেরিয়ে বেরিয়ে গেল। ডিপোর সীমা অনেকখানি। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে।

সিপাইদের ক্লাবে চলেছে হট্টগোল। অফিসারদের ক্লাবটা কিছু নীরব, আলো জ্বলছে নীল। কারখানা এলাকা এখন নিস্তব্ধ। চিমনির মাথায় মাথায় জ্বলছে লাল আলো, প্রহরীর রক্তচক্ষু।

ডানদিকে ঝুঁকে ঝুঁকে চলেছে শ্রীপতি, তার গা ঘেঁষে রুদ্ধশ্বাস আলো। চলছে না, পালাচ্ছে।

ডিপোর গেট পেরিয়ে শ্রীপতি জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব?'

পেছন দিকে একবার দেখে আলো শ্রীপতির হাতটা ধরে বলল, 'তোমার যেখানে খুশি।' শ্রীপতির জ্বালাধরা চোখ ফেটে হঠাৎ গলগল করে জল বেরিয়ে পড়ল। নৃপতির কথা মনে পড়েছে তার। তার দাদা নৃপতি, যার বিধবা বৌ আলো। নাঃ

জীবনের কোন ধন্দই বুঝি কাটবার নয়। মিলিটারি ডিপোটাকে পিছনে রেখে সে আলোকে নিয়ে পশ্চিমদিকে শহরের পথ ধরল।

অবাক মানল আদুরি। ভাবল হারামজাদী যায় কোথায়? সে ছুটে এসে দরজায় উঁকি মারল। দেখল শ্রীপতির সঙ্গে আলো হন্ হন্ করে চলছে। জলন্ত চোখে সেদিকে দেখে ক্রুর হাসিতে ভরে উঠল আদুরির মুখ। পালাচ্ছে, আদুরির ঘর ছেড়ে সর্বনাশী পালাচ্ছে।

এদিকে কালীচরণ ব্যতীত অন্যান্য অতিথিরা বেরিয়ে এল টলতে টলতে আদুরি তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়াল দরজা ছেড়ে। এলোমেলো খট্ খট্ শব্দে অতিথিরা কেউ ভূপতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কেউ নাটকীয়ভাবে চুম্বন করে বেরিয়ে গেল। তাদের পেছনে দরজাটায় খিল আটকে দিয়ে মত্ত ভূপতি দুহাতে জড়িয়ে ধরল আদুরিকে। বুকের কাছে চেপে ধরে আচ্ছন্ন করে দিল চুমোয় চুমোয়। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'তোমাকে আমি আর ছাড়ব না। মাইরি বলছি বৌ......'

এক মুহূর্ত সিঁটিয়ে থেকে আদুরি হু হু ক'রে কেঁদে উঠল নিঃশব্দে। বুঝল আলোর আদর অন্ধকারে চুরি করছে সে স্বামীর কাছ থেকে। তা হোক্, মিথ্যে করেও যে সে স্বামীর এমন আদর আর পায় না। মনে মনে বলল, আমার জীবনে যে কিছুই নেই। তুমি মিথ্যে করেই আমাকে প্রাণভরে ভালবাসো, এই আঁধারে যে ভাবে তোমার ইচ্ছা। ভূপতি বলল, 'যাও এবার ঘরে, কর্নেল মাইরি বসে আছে।'

এবার আদুরি বেঁকে বসল। মাথা নাড়ল, কেঁদে ভাসাল ভূপতির বুক।

ভূপতি তাকে জোর করেই টেনে নিয়ে চলল, জড়ানো গলায় বিড়বিড় করতে করতে, 'এখন আর তা হয় না। তোমাকে সব দেব বৌ, কিন্তু যেতেই হবে তোমাকে।'

আলোর আদর চুরি করেছে, কিন্তু সর্বনাশকে সে পারবে না বরণ করতে।

এবার ভূপতির মাতলামির মধ্যে ক্ষিপ্ততা এসে মিশল। চকিতে আদুরিকে পাঁজাকোলা করে সে এনে বসিয়ে দিল কালীচরণের সামনে।

আদুরি ঘোমটা টেনে মাটিতে মুখ চেপে রইল। কালীচরণ হেসে উঠল হ্যা হ্যা করে।

কিন্তু আলোর মাঝে এসে ধ্বক করে উঠল ভূপতির বুকের মধ্যে। মরিয়া হয়ে সে আদুরির ঘোমটাটা টেনে খুলে ফেলেই একটা বিকট চিৎকার করে ঘর কাঁপিয়ে

উঠোনে ছুটে এল। হাঁকল—'বৌ!' কোন উত্তর নেই। বুক চাপড়ে মাটিতে পদাঘাত করে উন্মত্ত গলায় হাঁকল, 'ছিপে!......'

রাত্রি আটটার বিউগল্ বেজে উঠল পোঁ পোঁ করে।

নিঃশব্দ ছায়ার মত লেঃ কঃ কালীচরণ সরে পড়ছে। ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে সে।

আদুরি হা হা করে কেঁদে উঠল গলা ছেড়ে।

আর অন্ধকার উঠোনে একটা ক্ষিপ্ত গরিলার মত হাতের মুঠি পাকিয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠল ভূপতি—'খুন করব......ওদের খুন করব। গুলি করব......'

তবু বোধ হয় অসহ্য ক্রোধে কিম্বা যন্ত্রণাতেই তার জ্বলন্ত চোখে দেখা দিল নোনা গরম জলের ফোঁটা।

জোয়ার ভাটা

'ক'টা লাও আসবে বাবু?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কৈলাস।

'দশটা।' জবাব এল আড়তের চালা ঘর থেকে।

সবুজ শাড়ী পরা কামিনটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি কি?'

আবার জবাব এল বিরক্তি ভরে, 'বললাম তো, সাত নৌকো বালি আর তিন নৌকো টালি।'

অমনি সবুজ আর লাল শাড়ী পরা দুটি কামিন একসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে সরু গলায় গেয়ে উঠল,

> ওই আসে গো ওই আসে লা'য়ে ভরা টালি
> ঘরে আমার ছাঁ ঘুমায়
> মিন্‌সে পড়ে শুঁড়িখানায়
> বেলা না যেতে আমি লাও করব খালি॥

মেয়ে ছিল জনা পাঁচেক, পুরুষ ছিল পনর জন। পুরুষদের ভেতর থেকে কয়েকজন হাত তালি দিয়ে উঠল বাহবা বাহবা বলে। মেয়েরা হেসে উঠল সব খিল্‌ খিল্‌ ক'রে।

হঠাৎ প্রৌঢ় ভোলা দাঁড়িয়ে উঠে, এক হাত কোমরে আর এক হাত কানে দিয়ে জোর গলায় উঠল গেয়ে,

> মিছে কথা ক'স্‌নি লো বউ, মিছে কথা ক'সনি।
> কাল সন্‌ঝেয় এ পোড়া চোখে শুঁড়িখানা দেখিনি॥
> দিনে খেটে, ছাঁ' লিয়ে তুই' মোর পাশে রাত কাটালি!
> কুড়ে বউ ও কুড়ে বউ, কাজ দেখে তুই মিছে দোষে দুষলি॥

মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার একটা হাসি ও হুল্লোড়ের ঢেউ বয়ে যায়। মুহূর্তে যেন জমকে ওঠে সকালবেলার গঙ্গার ধার।

সূর্য উঠেছে খানিকক্ষণ আগে। ভাটা পড়া গঙ্গার লাল জলে লেগেছে বৈশাখী রোদের ধার। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথা চক্‌চক্‌ করে রোদে। ভাটায় জল নেমে পলি পড়ছে ধারেধারে। কাঁকড়ার বাচ্চা কুড়োচ্ছে খাবার জন্য কতকগুলো হা-ভাতে

ছেলে।

ওপারে চটকল দেখা যায় একটা। এপারেও চটকল উত্তরে দক্ষিণে। মাঝখানে আড়ত অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। বালি ও টালির ভাঙ্গা টুকরো ছড়ানো উঁচু পাড়। দু তিনটে ছোট বড় ন্যাড়া ন্যাড়া গাছ। গাছের গায় ও অবশিষ্ট পাতাগুলো ধুলোয় ভরা। জায়গাটা উঁচু নীচু, তাই লরী দুটো খানিকটা দূরে পেছনের মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে। লরী দুটো এসেছে মাল তুলে নিয়ে যেতে।

আর নৌকা থেকে মাল খালাস করার জন্য এসেছে এই মানুষগুলো। এরা দিনমজুর কিন্তু অনিশ্চিত এদের দিনের দিন মজুরি পাওয়া। কেন না, এসব আড়তে কখনো একসঙ্গে দু'তিন দিনের কাজ থাকে না। মাল আনা আর দেওয়ার একটি কেন্দ্র মাত্র। তাই এরা ফেরে রোজ কাজের সন্ধানে, আড়তে ইঁট পোড়ানো কলে, বাড়ীঘর তৈরী কণ্ট্রাকটরের ফার্মে কাঠ সুরকির গোলায়। কাছে কখনো, কখনো দূরে! ওদের রোজ মজুরের নির্দিষ্ট মহল্লায় কোন কোন সময় আপনা থেকে ডাক আসে।

কিন্তু যেদিনটা ওরা কাজ পায় না, সেদিনটা ওদের অভিশপ্ত। এ ছন্নছাড়া আয়ের মত জীবনও ছন্নছাড়া। কম হোক, বেশী হোক, কোন বাঁধা আয় নেই অথচ বাঁধা আছে পেট। তবে এ জীবনে পেটটাকেও গোঁজামিল দিতে শিখেছে ওরা। ঘরও নেই, বারও নেই, জীবনের রঙ্গ অঙ্গ সবটাই এখানে। এখানটায় ফাঁক গেলে সব আঁধার। আঁধারের সব ক্রুরূপ না ওৎ পেতে আছে ওদের চারধারে। তাই হাতে যেদিন কাজ থাকে, সেদিনে ওরা মূর্তিমান আনন্দ। বন্ধনহীন মন, তোলপাড় হৃদয়। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ নয়, যতক্ষণ কাজ, ততক্ষণ আশ।

হৈ হৈ হৈ, ঐ আসে গো ঐ।
কি কি কি? গোরা সায়েবের ঝি।

আগের গানের প্রসঙ্গ পাল্টে জোয়ান মদন গেয়ে উঠল চেঁচিয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে,

গোরার বেটির মেজাজ চড়া, কাজের হদিস বড় কড়া
বউলো বউ, কাজে হাত লাগা—

সুরের শেষ টান দিয়ে সে একটু বিরক্তি ভরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল মেয়েদের দিকে। এর পরে মেয়েদের সুর ধরার কথা।

কিন্তু দেখা গেল মেয়েরা নারাজ। টিপে টিপে হেসে তারা মাথা নাড়ল। মুখ ফিরিয়ে বসল কেউ নিরুৎসাহে গা এলিয়ে। পথে আসতে কুড়িয়ে পাওয়া, খোঁপায় গোঁজা কৃষ্ণচূড়া ঢেকে দিল ঘোমটা তুলে। যেন গানের তালে ফাঁক দিতে গিয়ে সুর থেমে গেছে। সেই ফাঁকে ভাটা ঠেলে জোয়ার এসে পড়ল গঙ্গার বুকে। এল নিঃশব্দে চোরাবানের তলে তলে। শুধু হাওয়া আসে যেন কোঁথেকে ধেয়ে। আসে চটকলের জেটির গায়ে ধাক্কা খেয়ে, ক্রেইনের মাথায় লাল ন্যাকড়ার ফালি উড়িয়ে, এপারে ওপারে আগুনের মত কৃষ্ণচূড়ার মাথা দুলিয়ে।

হা-ভাতে ছেলেগুলো মহা উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ল জোয়ারের জলে। স্টীম লঞ্চ্ একটা ট্রেনে নিয়ে চলেছে বিরাট গাধমবোট দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

লরীর ড্রাইভার কানাই এসে দাঁড়াল দলটার সামনে। সে এদের পরিচিত গুণী বন্ধু। অতবড় একটা গাড়ীকে যে খুটনাট মেশিন নেড়ে বোঁ বোঁ ক'রে চালিয়ে নিয়ে যায়, গায়ে পরে সাহেবী কুর্তা, ফোঁকে সিগারেট, তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে তারা গৌরবান্বিত।

বুড়ো গোবর তার ঝুলে পড়া গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল, 'বোসে পড় ওস্তাদ।'

মেয়েদের দিকে একবার চোরাচোখে কটাক্ষ করে কানাই বলল, 'গানই থেমে গেল তো, আর বসব কি সর্দার!'

গোবর সর্দার নয়, কিন্তু সম্মানে প্রায় তাই। অনেক বয়স ও বহু ঝড়ে ঝাপটায় তার ভাঙগাচোরা মুখটায় মোটা গোঁফের মধ্যে লুকনো তিক্ত অথচ উদার হাসির ধারে একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে আছে। বয়সের চেয়েও শক্ত মোটা গলায় বলল সে, 'ওস্তাদ, দুনিয়াতে কিছুর থেমে থাকবার যো নেই।'

'যো নেই তো থামলে কেন?' কানাই আবার কটাক্ষ করল মেয়েদের দিকে।

'মুখে থেমেছে, মনে থামেনি। শুধোও ওদের।' বলে সে নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কিরে শ্যামা, গান থেমে গেছে?'

সবুজ শাড়ী পরা শ্যামা তেমনি মুখ টিপে ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ, না।

কিন্তু মদন তা মানবে কেন। সে নিজের পাছায় চাপড় মেরে বলল, 'আমি বল্‌ছি থেমে গেছে। নইলে গলা কেন দিচ্ছে না।'

'আরে জানলে তো।' ভোলা বলল মুখ বাঁকিয়ে, 'মাগীরা আবার গাইতে জানে কবে?'

আর একজন বলল, 'আয় শালা আমরাই গাই, ওদের বাদ দে।'

গাইয়ে মরদের দলটা বসল একজোট হয়ে।

অমনি কামিনী বুড়ি দাঁড়িয়ে উঠে খেঁকিয়ে উঠল, 'মাগীরা গাইতে জানে না, জানিস্ তোরা মরদরা। য্যাতো মদ গ্যাঁজাখেকো হেঁড়ে গলায়, আহা কি বাহার।' বলে কোমরে হাত দিয়ে মাজা দুলিয়ে ভেংচে উঠল,

হৈ হৈ হৈ তোদের মরণ আসে ঐ।

একটা রোল পড়ে গেল দমফাটা হাসির। মেয়েদের ঢলে পড়া হাসি যেন বুক জ্বালিয়ে দিল গাইয়েদের। মনে হয়, আধা ল্যাংটো খালি গা মানুষগুলো যেন এক মহাখুসীর মজলিশ্ বসিয়েছে গঙ্গার ধারে।

আড়তের বাবু গঙ্গামুখো হ'য়ে গদীতে বসে হরিনামের মালা জপছিলেন। জপের মাঝে গণ্ডগোল হওয়ায়, দাঁতহীন মাড়ি খিঁচিয়ে উঠলেন, 'জানোয়ারের দল।'—

আড়তের বাঁধা কুলিটা বসেছিল দরজার কাছে, বেগড়ানো মুখে। সে কুলি বটে, কিন্তু বাঁধা কাজের মানুষ। সেই আভিজাত্য বোধেই দিনমজুরগুলোর কাছ থেকে গা বাঁচিয়ে বসেছে। বাবুর গালাগালটা শুনে সেও ঠোঁট উল্টে বলল, শালা লুচ্চা লাফাঙ্গার দল।

কামিনী তখনো বসেনি। সে গাইয়ের দিকে ঝুঁকে বলল, 'এত জানিস্ তো. আগের গীতটা ছেড়ে কেন দিল্লিরে?'

ও! তাও তো বটে। আগের গানটা যে থেমে গেছে মেয়েদের জবাবের মুখে এসে! আসলে ভোলা বা মদন আগের গানটার সব জানে না।

গোবর চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে সেইটেই সুরু করে দেও, আসর নেতিয়ে গেল।'

মুহূর্তে শ্যামার গলার সঙ্গে লালশাড়ীর গলা মিশে সুরের ঢেউ তুলল.

মিছে কথা ক'য়োনি, কাজের ভয় করিনি,
তেমন বাপের ঝি আমি লই হে
চোখে বালি, মাথায় টালি, সারাদিনে হাড় কালি
তুমি যে নেশায় ভোম্, গাছতলায় শুয়ে হে।

হঠাৎ একমুহূর্তের বিরতিতে সবাই স্থির হয়ে গেল, থেমে গেল তালে তালে মাথা ঝাঁকানো ও হাততালি।

শ্যামা একটা বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে বলতে লাগল, হায়!... হায়!...আর লালশাড়ী সরু গলায় টেনে টেনে যেন বহু দূর থেকে গেয়ে উঠল,

খেটে খুটে শরীল অবশ, তবু তোমায় তুলি ঘাড়ে,

বলগো সব জনে জনে, একলা মেয়ে, কেমনে যাই ঘরে।

বিবাদ ভুলে গেছে গাইয়ে দল। মনে হয় এখানে সকলের বুকই বুঝি দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠেছে অভাগী কামিন বউয়ের বিলাপে।

কার গোঙগানো গলার স্বর ভেসে এল, 'আমরা বেইমান !'

এবার উঠল সেরা গাইয়ে কৈলাস। তাকে সবাই বলে সাধু। আসলে সে বাউল-বৈরাগী। তার নেই ঘরে বউ ছেলে, তার ডেরা ঘরে ঘরে। দিন-মজুরের জীবনের আড়ালে তার মনের অনেকখানিই গেরুয়া রংএ ছোপানো।

আর এ গেরুয়া রংএরই ছোপ খানিক খানিক দাগ ধরিয়ে দিয়েছে ওই চোখ ধাঁধানো লাল শাড়ীতে ঢাকা মনের মধ্যে। লাল শাড়ীর ঘর খালি, ভরা বয়সে এ জীবনের ভারের ভয়ে পলাতক তার সোয়ামী। আছে শুধু শ্বাশুড়ি ওই কামিনী বুড়ি। কিন্তু তার শ্বাশুড়ি, 'সবার বেলায় সড়ো গড়ো, বউয়ের বেলায় বড় দড়ো।' তাই বজ্র আঁটুনির ফস্‌কা গেরোর মত গেরুয়ার ছোপ তার মনের অতলে। কি যেন খোঁজে তার বিবাগী মন।...কৈলাসকে দাঁড়াতে দেখে হাসির ঝিলিক ফোটে তার কাজল চোখে, হাজার কথা ঠোঁটের কোণে। এটুকুই কামিনী বুড়ি টের পেলে আর রক্ষে নেই। তবু কৈলাস এক অপূর্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখিয়ে গেয়ে উঠল,

মোরে ধিক ধিক ধিক, মন যে আমার বশ মানে না,

আমার ভাঙ্গা ঘর, খালি পেট, তবু যে যাই শুঁড়িখানা।

আমার ছাঁয়ের শুকনো মুখ, বউয়ের আমার শুকনো বুক,

আমি দেশ হ'তে দেশান্তরে, আড়ত গোলায় খুঁজি সুখ,

আর যাবনি আর যাবনি, মোরে দে বাঁধা কাজের ঠিকেনা।

কৈলাসের গানের রেশ শেষ হবার আগেই, ফুঁপিয়ে কান্নার ভঙ্গিতে দ্রুত তালে আবার গেয়ে উঠল, শ্যামা ও লাল শাড়ী,

বাবু সাহেব, সাহেব গো, পেট ভরেনি,

কাজ করিয়ে প'সা দেও, ক্ষুধা মরেনি।

দেখ আমার শুকনো বুক, ছাঁয়ের তেষ মেটেনি,
বয়স কালের শরীলে মোর রং লাগেনি।

বৈশাখের খর হাওয়ার সে গানের সুর ভেসে যায় মাঠ ভেঙে সহরে গাঁয়ে, গঙ্গার ছল্ ছল্ তালে ঢেউয়ে ঢেউয়ে এপারে ওপারে। এ গানেরই সুরে তালে দোলে আড়তের ন্যাড়া আর দূরের কৃষ্ণচূড়া গাছ, দোলে মাথা আকাশের।

গাইয়ে দলের আর আফশোষ্ নেই। নেংটি পরা খালি গা রং বেরংএর মানুষগুলো শূন্যদৃষ্টিতে বসে থাকে চুপচাপ। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন স্তূপাকার করা রয়েছে কতকগুলো বেঢপ মাল। গানের গুঞ্জন এখন তাদের হৃদয়ের ধিকি ধিকি তালে। এ তো শুধু গান নয়, ঘরে বাইরে তাদের মাথা কোটার কাহিনী।

কামিনী বুড়ি কি যেন বিড় বিড় করে গঙ্গার দূর বুকে তাকিয়ে। বুঝি দীর্ঘদিনের ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি তোলপাড় করে মনে। তার সদা সতর্ক চোখ দেখতে ভুলে যায়, কেমন করে তার বউ ঘাম মোছার আড়ে এক নজরে তাকিয়ে থাকে কৈলাসের দিকে।

কৈলাসও তাকিয়ে থাকে, কিন্তু সে চোখে নেই প্রেমের বিহ্বলতা, আছে কিসের অনুসন্ধিৎসা। কেন না, সে যে বলে, ভিত্ নেই তার ঘর, নোনা ইঁটে আবার পলেস্তারা। ধু—র শালা! অমন ঘর চায় না কৈলেস, যত ছ্যাঁচড়া জীবনের পাপ। ওটা ভেঙে ফেল্। বুঝি সেই ভেঙে ফেলারই হদিস খোঁজে সে লাল শাড়ীর চোখে। খেদ কেমন করে কাটবে শরীলে রং না লাগার।

গোবরের ভাঙাচোরা মুখটা কালো, মাটির ড্যালার মত থস্থসে হ'য়ে ওঠে। বলে কানাই ড্রাইভারকে, 'ওস্তাদ, এখন যেন জীবনটা হয়েছে পোকা খেগো ছিটে বেড়া। জীবনভর পরের হাতের চাকার মত আমরা গড়িয়ে চলি, যেন তোমার হাতের মেশিন। চালালে চলি, তেল না দিলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করি।'

কানাই তার নিজের অভিজ্ঞতায় চ্যাপ্টা মুখে হেসে বলে, 'বিগড়ে যাও।'

'বিগড়ে যাব?'

'হ্যাঁ। দেখ না, মেসিন বেগড়ালে তার পায়ের তলায় শু'য়ে তেল মাখি। তেমনি বিগড়ে যাও।'

এক মুহূর্ত কানাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ফিস্ ফিস্ করে ওঠে

গোবর. 'ঠিক, শালা, বিগড়ে যাব, আমরা বিগড়ে যাব।...'

আড়তের বাবু জপের মালাটি কপালে ছুঁইয়ে ভরে রাখেন ক্যাশ বাক্সে। বলেন. 'হারামজাদাদের চেঁচানিতে একটু ঠাকুরের নাম করার জো নেই।'

বাঁধা কুলিটা বলে আত্মসন্তুষ্ট গলায়, 'শালারা ঈশ্বরের জঞ্জাল।'

ইতিমধ্যে আবার কে গান সুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু করল না। তাসে যেন ভাঙ্গন ধরে গেছে। এর মধ্যেই সূর্য কখন লাটিমের মত পাক খেয়ে উঠে এসেছে মাথার উপর। তেতে উঠেছে ছড়ানো বালি আর টালি ভাঙ্গা টুকরো।

সকলেই তারা ভ্রূ কুঁচকে তাকায় গঙ্গার উত্তর বাঁকে। না, এখনো দেখা দেয়নি দশ মাল্লাই নৌকোর চ্যাটালো গলুই, কানে আসেনি দশ বৈঠার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ, দেহাতি মাঝির দাঁড় টানার গান।

সকলেই তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। কখন আসবে, কখন? এখানে তারা কেউই একক নয়। সকলের একই ভাবনা, একই দুশ্চিন্তা, একই কথা।

সে যেন তাদের মন পবনের নাও। না এলে যে সব ফাঁকি। পেট ফাঁকি, গান ফাঁকি. ফাঁকি এ দিনটাই তাদের জীবনের গুর্তিতে।

কখন বেজে গেছে চটকলগুলোর দুপুরের ভোঁ। এখন আর কোথাও পাওয়া যাবে না রোজের সন্ধান। আর আড়তের নোকো না এলে, মাল খালাস না করলে কেউ তাদের হাতে তুলে দেবে না একটি পয়সা।

কৈলাস হাঁকে, 'হেই বাবু, মাল আসবে কখন?'

জবাব আসে খিঁচনো সুরে, 'আমি কি মালের সঙ্গে আছি?'

বাঁধা কুলিটা বলে গম্ভীর গলায়, 'যখন আসবে, তখন দেখতেই পাবে।'

শ্যামা বলে তিক্ত হেসে, 'মাইরী?'

কুলিটা খ্যাঁক ক'রে উঠতে গিয়ে চুপ মেরে যায়। আর সবাই হেসে ওঠে, কিন্তু খাপছাড়া হাসি। আর হাসি আসে না। কাজ নেই, হাত খালি, শুধু মাথা গুঁজে বসে থাকা। এ জীবনেরই একটা মস্ত বিরোধ, যেন আগুনকে চাপা দিয়ে রাখা।

কিন্তু দিন মজুরির এই দস্তুর। কাজ নেই তো, নেই পয়সা। না মুখ চেয়ে বসে থাক তো, ভাগো। কোথায় যাবে? সবখানেই তো কেবলি ভাগো

ভাগো ভাগো!—

আড়তের বাবু মুড়ির বস্তা খুলে কিছু মুড়ি ঢেলে দেন বাঁধা কুলিটার কোঁচড়ে। এ সময়ে বসে থাকা মানুষগুলোরও মুড়ি খাওয়ার কথা, দেওয়ার কথা দু' আনা হিসেবে। পয়সাটা কাটান যাবে ওদের মজুরি থেকে। কিন্তু কাজ নেই, মজুরিও নেই, উশুল হবে কোথেকে?

মুড়ির বস্তা বন্ধ করে, চালা ঘরে তালা মেরে আড়তদার পথ ধরেন ঘরের।

কুলিটা আড়চোখে এদের দিকে দেখে আর মুড়ি চিবোয়।

এ মানুষগুলো চুপচাপ দেখে, আর ঢোক গেলে। সকলেই পরস্পরকে ফাঁকি দিয়ে ওই মুড়ি খাওয়ার দিকেই দেখতে চায়।

কৈলাসের চোখ পড়ে লাল শাড়ীর চোখে। চট্ করে মুখ ফিরিয়ে নেয় উভয়ে। কামিনী বক্ বক্ করে শ্যামার সঙ্গে, 'তিশ বছর আগে এট্টা বাঁধা কাজ পেয়েছেলম জান্‌লি। মিন্‌সে ত্যাখন বে'চে। সোহাগ ক'রে বললে, যাস্‌নি।.. পুরুষ মানষের সোহাগ।'

হারিয়ে যায় কামিনীর গলা জোয়ারের কল্‌কল্ শব্দে।

হঠাৎ দেখা যায়, তারা সকলেই এ জীবনটার উপর বিরাগে নিজেদের মধ্যে গুল্‌তানি সুরু করে দিয়েছে।

কেউ বলে, 'একবার আমি এট্টা কাজ পেয়েছেলম, একনাগাড়ি তিন মাসের।

কেউ বলে, 'আমার এক বছরও হয়েছে। কলকেতায় এট্টা বিড্‌লিন্ বানিয়েছেলম্।'

আর একজন বলে, 'আরে আমাকে তো শালা এখনো ওপরশেরবাবু এট্টা বাঁধা কাজের জন্য ডাকে।'

'আর তুই থালি যাস্ না।' অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলে কৈলাস।

কেউ কেউ নীরবে হাসে।

কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে সুর, কেটে যাচ্ছে তাল। কথাও আর ভাল লাগে না।

বুড়ো গোবর তার মোটা গলায় বলে আফ্‌শোষের সুরে, 'ওস্তাদ, তোমার মত্তো কাজ জানলে'...বলতে বলতে হঠাৎ তার গলা হারিয়ে যায়। গোঁফ ধরে টানে আর ভাবে! আবার বলে, 'অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু ফুরসৎ পেলম না, এখনো না।'

কানাই বলে, 'জানলেই বা কি হত? লাইসেনটা পকেটে ফেলে মোটরওয়ালাদের দোরে দোরে ঘ্রতে। কাজ কোথায়, কাজ নেই।'

'কাজ নেই!' যেন বাঘাকুত্তার মত গড়্গড়্ ক'রে ওঠে গোবর, অস্থির হয়ে ওঠে হঠাৎ। 'ওস্তাদ, এ পেটে উপোসের মেলা দাগ আছে, কিন্তু হাতে একদিনেরও একটা আরামের দাগ পাবে না। কাজ না থাকলেই মান্ষ পাগল হ'য়ে যায়।...'

কাজ নেই।...বাতাস তার পালে ঢিলে দেয়। বৈশাখী স্র্য জ্বলে গন্গন্ ক'রে মাথার উপর। আগ্ন গলে গলে পড়ে গায়ে, ম্খে। গা জ্বলে, ঘাম ঝরে ঝল্সে যাওয়া রসানির মত।

আশে পাশে ছায়া নেই কোথাও। মান্ষগ্লো গণ্ড্ষভরে পান করে জোয়ারের ঘোলা জল, ছিটা দেয় চোখে ম্খে। কিন্তু প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। কেউ কেউ মাথার গামছা ম্খে চাপা দিয়ে শ্য়ে পড়ে।

ন্যাড়া গাছগ্লো যেন মরাকাঠের খ্ঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে। দ্রের কৃষ্ণচ্ড়া গাছের দিকে চাওয়া যায় না। যেন ঝলসানো আগ্ন। ঘোমটা খসা খোঁপায় কৃষ্ণচ্ড়া শ্কিয়ে বিবর্ণ। যেন কামিনদের ম্খ।

টাব্টুব্ গঙ্গার তীব্র জোয়ারের স্রোত নিঃশব্দ ভরাট। উত্তরের বাঁকে যেন ঝিলিমিলি করে মরীচিকা। বাঁকের পাক খাওয়া জলে উজান ঠেলে আসে না কোন নৌকা।

লালসাড়ী রোদে জ্বলে দপ্দপ্, জ্বলে পেট। ব্ঝি প্রাণটাও।

মনে মনে বলে কৈলাস, চাস্নি...এদিকে চাস্নি।...তারপর হঠাৎ হেসে ওঠে ঠোঁট বেঁকিয়ে।—'ভিত্ নেই...ভিত্ নেই।...'

মদন বলে, 'কি বকছ?'

'বল্ছি, সারাদিন বসে গেলম, তো, প'সা কেন দেবে না?'

'তাই দস্তুর।'

'কেন দস্তুর?'

মদন আবার বলে, 'ওটা আইন।'

হঠাৎ কেমন খেপে উঠতে থাকে কৈলাস।—'শালার আইনের আমি ই'য়ে করি।'

'যতই কর, হবে না কিছু।'

'করালেই হয়।'

মদনও কেমন খচে যায়। বলে, 'আইনটা তোর বাপের কি না?'

'বাপ তুললি তো বলি, তবে বাপেরই আইন হবে। তোরাই তো'—

'ফের? মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবি তো'—প্রায় ঘুষি পাকায় মদন।

ঠিক এসময়েই আড়তদারের ছোট ভাই অর্থাৎ ছোটবাবু আসেন রিক্সা থেকে নেমে ছাতা মাথায় দিয়ে। এসে বলেন, 'তিন মাইল দূরে বাঁকাতলায় মালের নৌকো আটকে রয়েছে, জোয়ার কিনা, তাই আসতে পারছে না।'

যাক্, তা হলে আসছে!...সবাই অমনি আবার উঠে বসে।

কয়েকজন বলে, 'তবে আমরাই কেন না গুন্ টেনে লাও লিয়ে আসি।'

ছোটবাবু বলেন, 'সে তোদের ইচ্ছে।' অর্থাৎ বিনা মজুরিতে আপত্তি কি।

অমনি তারা সবাই ছোটে মেয়েরা বাদে।

মাইল খানেক গিয়ে দেখা গেল আড়তদারবাবু আসছেন রিক্সায় ক'রে। জিজ্ঞেস করেন, 'যাচ্ছিস্ কোথা সব?'

'বাঁকাতলায় নাকি মাল লিয়ে লাও ডেঁড়িয়ে আছে? বললে ছোটবাবু?'

বাবু মাড়ি বের করে ফোঁস করে হেসে উঠলেন্।—'আরে ধু-স্, ভায়া বুঝি তাই বলল? আমি ওকে বললুম যে, বাঁকাতলার আড়তে কোন খবর আসেনি।...সে কখন আসবে তার ঠিক কি...'

মুহূর্তে মুখগুলি যেন পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। আবার তারা রোদ মাথায় ক'রে ফিরে আসে গঙ্গার ধারে।

এসে ব'সে পড়ে তপ্ত বালুর উপর। হাঁপায়। এখন আর মানুষগুলো রং বেরং নয়, গঙ্গার পাড়ে যেন কতকগুলো কালো কালো শকুন বসে আছে।

কাজ নেই!...গরমজলের কেটলির ঢাকার মত যেন ফুটতে থাকে কথাটা সবার মাথার মধ্যে। কাজ নেই!...তাদের জীবনের দিন গুন্তিতে একটা বিরাট শূন্য, ফাঁকা।

সূর্য ঢলে গেছে, ছুটির ভোঁ বেজে গেছে চটকলগুলোতে। কলরব ক'রে ফিরে চলেছে খেয়া নৌকোয়, ছুটি পাওয়া মানুষেরা। ফিরে চলেছে স্টীম লঞ্চ গাধাবোটকে খালাস দিয়ে। লঞ্চের ছাদে, পশ্চিম মুখে বসে নামাজ পড়ে সারেঙগ্,

সাহেব।

ভাটা পড়েছে, জল নেমেছে, আবার পড়েছে পলি।

'হেই বাবু, লাও আসবেনি?' বারবার জিজ্ঞেস করে সবাই।

'জানিনে।' একই জবাব।

সন্ধ্যা নামে প্রায়।

হঠাৎ মদন খেঁকিয়ে ওঠে। 'এই কৈলেশ শালার জন্যেই তো এতখানি ছোটা?'

কৈলাশও চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার বাবার জন্যে।'

ওদিকে চেঁচিয়ে ওঠে কামিনী বুড়ি, হঠাৎ গালাগাল বাড়তে আরম্ভ করে বউকে। গলা শোনা যায় লাল শাড়ীরও। শ্যামার ঝগড়া লেগেছে তার মরদ গণেশের সঙ্গে।

আস্তে আস্তে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের মহল্লার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারকে কেন্দ্র ক'রেই তা বেড়ে উঠতে থাকে।

কোথায় তাদের সেই সকাল, সেই গান ও গল্প।

বুড়ো গোবর এ্যাসিডের গন্ধ পাওয়া সাপের মত সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠে। সে চীৎকার ক'রে ওঠে, 'এই গোঁয়ারগুলান্, চুপো চুপো তাড়াতাড়ি।'

কে চুপ করে। চকিতে দেখা গেল, মানুষগুলো পরস্পর মারামারি সুরু ক'রে দিয়েছে। কে কাকে মারছে, তার ঠিক নেই। সবগুলোতে মিলে একটা দলা পাকিয়ে গিয়েছে মানুষের। শোনা যাচ্ছে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন, চীৎকার কান্না।

একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন আচমকা মাটি ফুঁড়ে ধ্বসিয়ে ফেলছে দুনিয়াটাকে। মাটি কাঁপছে থর্‌থর্ করে। ক্রুদ্ধ হুঙ্কার যেন ফেঁড়ে ফেলবে আকাশটাকে। কেউ উলঙ্গ হয়ে গেছে, কয়েকজনের পায়ের তলায় পড়ে গেছে কেউ।...কেন এই মারামারি, তারা নিজেরাই যেন জানে না।

আড়তদার বাবুরা দুই ভাই কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি ক্যাশবাক্সে চাবি বন্ধ করে প্রায় কান্নাভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'রামদাস্, লাঠি পাক্‌ড়ো।'

রামদাস্ অর্থাৎ সেই বাঁধা কুলী। সে তখন ঘরের পেছন দিয়ে নেমে গেছে

গঙ্গার নাবিতে, কালো আঁধারে, আর মনে মনে বল্‌ছে, 'আরে বাপ্‌রে, শালারা আমার জান নিকেশ ক'রে দিতে পারে।'

হঠাৎ সমস্ত গোলমালকে ছাপিয়ে তীব্র মোটা গলায় গোবর হাঁক দিল, 'লাও আসছে, লাও। জোয়ান, তৈয়ার হো!...'

মুহূর্তে যেন যাদুমন্ত্রে থেমে গেল সমস্ত গোলমাল, মারামারি, হাতাহাতি। সকলে ফিরে তাকাল উত্তরের বাঁকের দিকে, নিঃশব্দে।

পুবে উঠেছে আধখানা চাঁদ, ভাঁটার জলে তার ঝিলিমিলিতে দেখা যায় অদূরেই কতকগুলো বিরাট বড় বড় নৌকো গঙ্গার বুকে ছায়া ফেলে এগিয়ে আসছে। মোটা মাস্তুল উঠেছে আকাশে।...

সেই নৌকো থেকে ভেসে এল একটা স্বর, হো-ই-ই...

এখান থেকে হাঁকল গোবর, হা-ই-ই!...

আসছে আসছে তাদের মন পবনের নাও। সাঁঝ বেলায় এসেছে সকাল। কারুর দাঁত ভাঙ্গা, ঠোঁট কাটা, চোখ ফোলা, নখের ক্ষত। কারুর হাতে কার ছিঁড়ে নেওয়া এক মুঠো চুল কিম্বা পরিধেয় কাপড়ের টুক্‌রো।

অকস্মাৎ ভাটার ছল্‌ ছল্‌ তালে তাল দিয়ে কে গেয়ে উঠল সরু গলায়,

ওই আসে গো, ওই আসে ল'য়ে ভরা টালি,
মাঝি এস তাড়াতাড়ি,
আর যে ভাই রইতে নারি
আঁধার নামে গাঁয়ে ঘরে, লাও করব খালি।

গান গাইছে লাল সাড়ী। সুর তুলেছে আবার, তাল লেগেছে আবার, শরীরের পেশীতে পেশীতে।

এগিয়ে আসে গোবর, 'কামিনী বুড়ি, তুই এখন চোখে দেখতে পাবিনে, ঘরে যা। শ্যামা তুই পালা, ঘরে তোর ছেলে রয়েছে। ভোলা তুইও যা, তোর চোট বেশী।'

তারা বলল, 'আমরা খাব কি?'

'তোদের মজুরিটা আমরা গায়ে খেটে তুলে দেব।'

সবাই বলে উঠল, 'রাজী আছি।'

যেন এ মানুষগুলো কিছুক্ষণ আগের সেই হিংস্রপ্রাণীগুলো নয়।

কামিনী বুড়ি ব'লে গেল, 'বউ, হুঁসিয়ার!...'

তারপর এক অদ্ভুত সাড়া পড়ে যায় কাজের। নৌকো লাগে পাড়ে। সুরু হয় মাল তোলা। গানে, কাজের উন্মাদনায়, হাঁকে ডাকে মুখরিত গঙ্গার ধার। পাঁচ নৌকো খালাস হলেই একদিনের রোজ পাবে কুড়িজন।

কোন্‌খান্‌ দিয়ে সময় কেটে যায়, কেউ টেরও পায় না। ঝুড়ি বেছে নিয়ে সব মাল তুলে দেয় লরীতে। একটা যায়, আর একটা আসে।

ঝুড়ি কোদাল জমা দিয়ে, রোজের পয়সা নেওয়া হলে লাল শাড়ী সকলের চোখের আড়ালে আড়ালে কৈলাসের হাত ধরে টেনে নেমে গেল গঙ্গার ঢালু পাড়ের নীচে। বলে রুদ্ধ গলায়, 'সারা মুখ রক্তারক্তি। এস, ধুয়ে দি।'

কৈলাস বলে অদ্ভুত হেসে, 'রক্ত তো তোর মুখেও, ধুয়ে আর তা কত তুল্‌বি।'...

'কিন্তু, কেন...কেন?' ফুঁপিয়ে উঠল লালশাড়ী।

আবার জোয়ার আসায় দক্ষিণ হাওয়ার ঝাপ্‌টায় ভেসে গেল তার গলা।

তখন অনেকেই নেমে এসেছে গঙ্গার কিনারে।

মরশুমের একদিন

"আর আমরাই বুঝি ক্ষমা করব বিদ্রোহিনী বিশ্বাসঘাতিনী নারীকে! নিজের অন্তঃপুরে মায়ের মত সম্মান দিয়ে রেখেছিলাম, তা তোমার ভাল লাগল না।"

আচমকা এই নাটকীয় ও পরিচিত গলা শুনে স্টেজ, ড্রেস ও সিনের দোকান 'স্টেজ এ্যান্ড ড্রেস প্যারাডাইসের' বিখ্যাত প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চমকে ফিরে দাঁড়ালেন। গলার স্বর শুনেই ভ্রূ কুঁচকে অভিনেতাকে আতিপাতি করে সারা ঘর খুঁজতে লাগলেন। টেবিলের তলা, আলমারির ফাঁকে, দরজার আড়ালে। নেই। কিন্তু ভোরবেলা গদীতে বসতে যাওয়ার মুহূর্তে লোকটা একি খেলা শুরু করল তার মনিবের সঙ্গে!...ভাবলেন, হয়ত উঠনের গাদা করা মঞ্চের কাঠের ফ্রেমগুলোর পিছন থেকেই লোকটার স্বর শোনা যাচ্ছে। আর তাঁর সেই ভাবার মুহূর্তেই আবার সেই স্বর ধ্বনিত হল।

"তুমি কি বুঝিবে নারী লুপ্ত গৌরবের শীর্ণ মহিমা, তুমি কি বুঝিবে উন্মুক্ত শিখার জ্বালা, তুমি কি বুঝিবে এই..."

চক্রবর্তী বিস্মিত ক্রোধে লক্ষ্য করলেন তাঁর এই মরশুমের জন্য নতুন তৈরি ভেল্‌ভেটের স্ক্রীনটা ঘরের এক কোণে লুটোপুটি খাচ্ছে এবং গলার স্বরটা তার ভিতর থেকেই যাচ্ছে শোনা। একটানে তিনি সেটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল তাঁর বিশিষ্ট কর্মচারী ড্রেসার ও পেণ্টার নবীন চিৎ হয়ে শুয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে মনিবকে নমস্কার করছে, পেন্নাম হই কর্তা।

রাগের চোটে চক্রবর্তী তাঁর সামনের নড়বড়ে দাঁতগুলো জিভ্ দিয়ে একদফা আন্দোলিত করে বললেন, কি বোঝাচ্ছ তুমি?

নবীন উঠে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে বলল, এই বুকের মর্মন্তুদ বেদনা। অর্থাৎ বলছে চাণক্য মূর্খ নারী মুরা, চন্দ্রগুপ্তের মাতাকে। আর আগের কথাটা হচ্ছে—

থাক্! চক্রবর্তী দারুণ রোষে গর্জন করে উঠলেন।

হ্যাঁ, থাক। নির্বিকারভাবে কথাটি বলে নবীন জিজ্ঞেস করল, মোর পুত্র-রত্ন কি গতকাল তার পিতার সন্ধানে এসেছিল হুজুর?

খবরদার! আমি তোমার মনিব, সেকথা ভুলে যেওনা বলে দিচ্ছি। চক্রবর্তী প্রায় হুমড়ি খেয়ে তার মান্ধাতার আমলের মেহ্গিনি কাঠের মস্ত নড়বড়ে চেয়ারটার উপর গিয়ে পড়লেন।

তাড়াতাড়ি মুসলমানী ঢঙে আদাব করে বলল নবীন, বান্দাকে মাফ করবেন জাঁহাপনা।

সাবধান নবীন! এবার সত্যই চক্রবর্তী চেঁচিয়ে উঠলেন।

নবীন চকিতে প্রায় সামরিক কায়দায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। লোকে বলে ব্রহ্মা নাকি নিজের হাতে গড়েছিলেন নবীনকে। পা' থেকে মাথা পর্যন্ত এমন নিখুঁত ও সুপুরুষ বুঝি খুব কমই দেখা যায়। গায়ের বর্ণ যাকে বলে দুধে-আলতায়। এক সময়ে ওই চেহারায় ছিল কি জেল্লা আর যেন পাথরে খোদা মূর্তির মত। লোকে বলে, হতচ্ছাড়া নষ্টামো করে চেহারাটা খেয়েছে। তার ওই কালো বিশাল চোখ দিয়ে বিশ্বজয় করতে পারার ইঙ্গিতও করেছে কেউ কেউ।

তার দিকে তাকিয়ে চক্রবর্তীর নিষ্ঠুর মুখের রেখাগুলো মিলিয়ে আসছিল। চেহারাটায় যাদু আছে ছোঁড়ার। কিন্তু স্ক্রীনটার দিকে চোখ পড়তেই টেবিলটার উপর দড়াম করে এক ঘুষি কষিয়ে বললেন, তুমি আমার ব্যবসা চালাতে দেবে কি না।

তা নইলে আমার চলবে কি করে?

তবে নতুন স্ক্রীনটা কোন্ আক্কেলে তুমি মাটিতে পেতেছ?

কাল রাতে নৈহাটীতে যাত্রা করিয়ে ভোররাতে মাল নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে এসেছি। ভীষণ ঘুমে কাতর অবস্থায় শুতে গিয়ে দেখলাম এ প্যারাডাইস হলের মশকেরা—

তাকে বাধা দিয়ে চক্রবর্তী বলে উঠলেন, সেইজন্য তুমি আলমারি থেকে ওই নতুন স্ক্রীনটা বার করে পাতবে?

পাতিনি কর্তা, গায়ে দিয়েছি।

আবার দুর্নিবার ক্রোধে চক্রবর্তীর সামনের দাঁতগুলো নড়েচড়ে উঠল; কোন কথা শুনতে চাইনে, গেট্ আউট্। তোমাকে আমি বরখাস্ত করলাম।

বলে বায়নাপত্রের বইটা খুলে পাতা উলটে যেতে লাগলেন। তার ছোঁড়া

কামিজের ফাঁক দিয়ে এখানে ওখানে শিথিল চামড়া উঁকি মারছে। গায়ের রঙটা এই ঘরের গত এক যুগের পুরনো হলদে রঙের মত, আর ওই চেয়ারটার মতই ঝড়বড়ে শরীর। ভ্রূ জোড়া প্রায় চুলশূন্য, গোঁফজোড়া সন্তর্পণে ছাঁটা। বোধ হয় কিঞ্চিৎ কালো রঙ মাখা। মাথায় বাবরি রাখবার অসম্ভব অপচেষ্টায়, ঘাড় অবধি নাগাল না পাওয়া চুলের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত। মনিবোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি নিশ্চুপ।

নবীন রাতজাগা ক্লান্ত চোখে যথেষ্ট গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল, এখনও তেরটি বায়না রয়েছে নানান জায়গায়। চুঁচড়ো, শ্রীরামপুর, তেলেনীপাড়া, শ্যামনগর, জগদ্দল—

থাক্ থাক্, সে আমাকে বলতে হবে না, শান্ত মোটা গলায় বললেন চক্রবর্তী।

নবীন তবু বলল, ন' জায়গায় যাত্রা, চার জায়গায় থিয়েটার।

জানি জানি; কাজ চালাবার লোক আছে আমার, বলেই চক্রবর্তী পাতা উলটানো বন্ধ করে একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

ক্ষণিক নীরব। নবীন নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, তবে বাকী পাওনাটা মিটিয়ে দেওয়া হোক।

চক্রবর্তী নীরব। বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে কড়ে আঙুলের নখ খুঁটছেন।

নবীনের ঠোঁট চকিতে একবার বেঁকে সোজা হয়ে গেল। বলল, আমার কাজ আছে।

তবে ত আমার মাথা কিনেছ। সামনের দাঁতের সারি একবার কেঁপে উঠল চক্রবর্তীর। বললেন, তার আগে স্ক্রীনটা ভাঁজ করে তোলা হোক!

স্ক্রীনে হাত দিয়েই বলল নবীব, একটু চা না হলে জমছে না।

চোখ ঘোঁচ করে বললেন চক্রবর্তী, তা জমবে কেন? কখন শুনব এক পাঁট মাল না হলে জমছে না। সকালবেলা বউনিবাটা নেই, কিছু নেই।

কেন? একটা বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল নবীনের চোখে। মনিবগিন্নি বাপের বাড়ী গেছেন?

অর্থাৎ চক্রবর্তীর দুরন্ত দামাল তৃতীয় পক্ষ, যার কপালের টিপের ঝিলিক দেখলেই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তার

খোঁজ কেন?

তাহলে বউনির আগে এক গেলাস চা—

বটে? খুবই বেয়াড়াপনা দেখছি যে? দাঁড়াও, বউটাকে—

কাজ যখন শেষ হল, তখন চাঁদ প্রায় মাঝ আকাশে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের পাশে সিঁড়িতে কার পদশব্দ শোনা [illegible]। চক্রবর্তী এক বিচিত্র হুঁসিয়ারী কটাক্ষ করল নবীনের দিকে। নবীনের চোখে ঝিলিক দিয়ে উঠল হাসি।

দরজার পরদাটা একবার দুলে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে একখানি মুখ উঁকি মারল পরদার ফাঁকে। চক্রবর্তীর তৃতীয় পক্ষ ভানুমতী। চল্‌তি কথায় যাকে বলা যায় দজ্জাল সুন্দরী। মুখখানি শরতের আকাশ, ক্ষণে ক্ষণে তাতে [illegible] আলোছায়ার খেলা। ভ্রূ কুঁচকে, কপালের টিপটা একটু কাঁপিয়ে বলল, [illegible] বেলাই কাকে কিসের এত তম্বি হচ্ছে শুনি?

হুজুরের সামনে মোসাহেবের মত অবস্থা হল চক্রবর্তীর। সামনের দাঁত নড়ল, মুখের সমস্ত রেখাগুলো মিলিয়ে গেল, চোখের পাতা করল পিট্‌পিট্‌। নড়বড়ে দাঁতে হাসি ফুটবে ফুটবে অবস্থা।

ইতিমধ্যে ভানুমতীর নজর পড়ে গেল নবীনের দিকে আর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীরটাই বেরিয়ে এল পরদার আড়াল থেকে। যেন মুখে তার আচমকা হাজার পাওয়ারের ফোকাস পড়েছে, ও মা! তুমি রয়েছ? তা সাত সকালে তোমাদের কি হল বাপু?

ততক্ষণে নবীনের স্ক্রীন ভাঁজ করা হয়ে গেছে। সেটা আলমারির মধ্যে পুরে দিয়ে বলল, কিছু হয়নি ত! একটু চায়ের জন্য এত কথা।

মরণ আর কি! ভানুমতীর চোখের মণি চকিতে চক্রবর্তীকে এক ঘাই মেরে ফিরে গেল নবীনের দিকে। একটা স্নেহ শাসনের ভাব ফুটে উঠল তার মুখে, তা তুমি আমাকে ডেকে বললেই ত পারতে। আমি না তোমার বউদি! দেওরের আবার এত লজ্জা কিসের?

নবীন চোরা চক্ষে মনিবকে একবার দেখে নিল। ইস্‌! কড়ে আঙুলটা বুড়ো আঙুলের ঘা খেয়ে খেয়ে এবার রক্তপাত না হয়!

বটে! ভারী ভদ্রলোক ত! কটাক্ষটা দুর্জয় হয়ে উঠল ভানুমতীর।

ভদ্রতা নিজের গিন্নির কাছে গিয়ে করো। আসছি, পালিও না যেন। তারপর ফিরল চক্রবর্তীর দিকে। বাজারে লোক পাঠাও, উনুনে আগুন পড়বে এখুনি, বুঝলে?

বলে টিপ কাঁপিয়ে অদৃশ্য হল ভানুমতী।

কিন্তু চক্রবর্তীর মুখ কঠিন হল না মোটেই। বরং ভারী মিষ্টি হয়ে এল। একটা কোপ-কটাক্ষ করে বলল, তোর চেহারাটার মত তোর কাজ নয় কেন বল্ ত?

চেহারাটা বোধহয় আমার নয়।

তাই না বটে! যাক্, নৈহাটী থেকে মাল সব খালাস হয়েছে?

না হয়ে আর উপায় কি? আমার ছেলেটা এসেছিল কাল?

চক্রবর্তী সে কথার ধার দিয়েও গেল না। চোখ বড় বড় করে বলল, পরথম্ পদটা কিসের থেকে বলছিলি? সেই যে, বলে চক্রবর্তী নিজেই নাটকীয় সুরে শুরু করল, 'আর আমরাই বুঝি ক্ষমা করব বিদ্রোহিনীকে? নিজের'......আঃ ভুলে গেলাম ছাই। কোন্ পালার কথা ওটা?

সিরাজদ্দৌলা বলছে ওর সেই খচ্চর মাসীটা ঘেসেটি বেগমকে, বলেই নবীন ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল, আমার ছেলেটা কাল টাকা নিয়ে গেছে?

চক্রবর্তীর ভ্রূ কুঁচকে গেল। সামনের দাঁতের সারিতে ঝড় বইল। সড়াৎ করে সামনের ড্রয়ারটা খুলে এক চিল্‌তে ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা একষট্টি টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিল নবীনের সামনে। এই নাও, শেষ সম্বল। শালার মরশুম না, আকাল। আজ বাদে কাল সপ্তমী পুজো, এখন পর্যন্ত টাকাই আদায় হল না। এখন ওই একষট্টি টাকা থেকে দু' জায়গায় মাল যাওয়ার কুলি খরচা, নৌকো ভাড়া, তোমার আর আমার ঘরের খরচ সামলাতে হবে। তাছাড়া দুটো আলাদা পেণ্টার, ড্রেসার না হলে কাজ বন্ধ। আবার এখুনি বলে গেল বাজারে পাঠাও। আমি কেটে পড়ছি বাবা।

কিন্তু সে কাটবার আগেই একটি নাদুস-নুদুস যম-কালো লোক ঢুকল দোকানে। বলল, নমস্কার!

নবীন লক্ষ্য করে দেখল নমস্কারটার ভঙ্গি পৌরাণিক পালার নায়কের মত। চক্রবর্তী বসাল তাঁকে, কি চাই বলুন?

নবীন হালদারকে চাই।

কারণ?

আর বলবেন না মশাই, বলতে বলতে লোকটা বার বার অচেনা নবীনের দিকে তাকাতে লাগল আর ঘাম ঝাড়তে লাগল কপাল থেকে। বলল, আমাদের আজ রাত্রেই 'পার্থ সারথি' পালা। অর্জুন যে করবে, সে ব্যাটা একটা পুরনো ঝগড়ার ফ্যাকড়া তুলে কেটে পড়েছে, এখন আমাদের মান যায়। শুনেছি আপনার বিশিষ্ট কর্মচারী নবীনবাবু অর্জুনের পাটে একেবারে ওস্তাদ।

চক্রবর্তী নিদারুণ গম্ভীর। বায়নাপত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, মিথ্যা শোনেন নি।

লোকটা বিভীষণ বপু নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল টেবিলের উপর। তাকে আমাদের চাই-ই চক্কোত্তি মশায়।

অতি উত্তম কথা। একটুও খিচ্ নেই চক্রবর্তীর গলায়। যাত্রা না থিয়েটার?

আজ্ঞে যাত্রা!

বেশ। তাহলে ড্রেস-পেণ্টের বায়নাটা দিয়ে যান।

কালোবপু চমকে গেল, সে ত মশাই আমরা অন্য জায়গায় বায়না দিয়ে ফেলেচি।

টকাটক্ চক্রবর্তীর সামনের দাঁত নড়ে উঠল, গভীরতর হল নাকের পাশের কোঁচ। তাহলে সেখান থেকেই অর্জুনের ব্যবস্থা করবেন, নবীন হালদারের অর্জুন হবে না।

লোকটির কালো রং বেগুনী হল। বায়না কি করে ফিরিয়ে নিই বলুন?

চক্রবর্তী মাথা নেড়ে বলল, মাফ্ করবেন।

কয়েক মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাস নিস্তব্ধতা।

লোকটা একেবারে অসহায়ের মত বলে উঠল, নবীনবাবু এটা শুনলেও কি এই জবাব পাব?

চক্রবর্তী নবীনকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, সামনেই রয়েছে, জিজ্ঞেস করুন।

চোখাচোখি হল নবীনে আর চক্রবর্তীতে। লোকটা নমস্কার করে খোশামোদের মত বলল, শুনলেন ত সবই।

শুনলাম। একষট্টি টাকার বাণ্ডিলটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চক্রবর্তীর দিকে ছুঁড়ে দিল নবীন। বলল, শ্যামনগরওয়ালারা টাকাটা আগাম দিয়ে গেছে। তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিও ত শুনলেন সব।

মহা ফাঁপরে পড়ার মত লোকটা বলল, তাহলে—

ব্যবস্থা একটা হতে পারে। চক্রবর্তী বললেন, কত টাকার কণ্ট্রাক্টে কত টাকা বায়না দিয়েছেন?

আজ্ঞে, আশী টাকায় পাঁচ টাকা বায়না।

ভাল কথা, পঁচাত্তর টাকায় আপনাদের প্লে করিয়ে দেব, তাছাড়া নবীনের টাকা ত আপনারা দেবেনই। ওই বায়নাটা বাতিল করে দিনগে।

লোকটার চোখে ঝল্‌সে উঠল আশা। তবু বলল, কিন্তু আগের ড্রেসওয়ালা-দের কাছে ভারী বদনাম হয়ে যাবে।

তাহলে মাফ করতে হল। চক্রবর্তী পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল।

বেশ, তাহলে আপনার কথাই রইল। লোকটা একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

ওদিকে পর্দার ওপাশ থেকে ডাক পড়ল চুড়ির ঝনাৎকারে। নবীন 'আসছি' বলে পর্দা সরিয়ে ভিতরে গেল।

ভানুমতী ঠোঁট টিপে চা আর খানচারেক রুটি, গুড় দু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নবীন আসতেই বলল, ধর তাড়াতাড়ি. হাত পুড়ে গেল।

নবীন চায়ের গেলাস নিজের হাতে নিল। বলল, রুটি খাব কেমন করে?

ধরে থাকব নাকি থালাটা? ঠিক বিদ্রুপ নয়, তবু বেঁকে উঠল ভানুমতীর ঠোঁট।

তার চেয়ে মাটিতে রেখে খাব। আর এক হাতে থালা নিল নবীন।

আচমকা মেঘে ছেয়ে গেল ভানুমতীর মুখ। বলল. এতই খারাপ এই হাত দুটো?

না, তা বলিনি।

কিন্তু নবীনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ভানুমতী সিঁড়ির অর্ধেক উঠে থেমে গিয়ে বলল, ইচ্ছে হয়ত ওপরে বসে খেতে পার।

উপর? যেন কত সমস্যা নবীনের এমনভাবে জিজ্ঞেস করল।

ভেবে দেখ, তাতে আবার জাত যাবে কিনা! প্রায় উড়ন তুবড়ির মত ভানুমতী

উঠে গেল।

ভেবেই দেখল নবীন। না, উপরে যাওয়া হবে না। কর্তা তাহলে মুস্কিলে পড়ে যাবে খানিকটা। উঠনটাও স্টেজের ফ্রেম আর পুরনো সিনের গাদায় বিশ্রী হয়ে আছে। বিপরীত দিকের গুদাম ঘরটায় মানুষের সাড়া পেয়ে পিছল উঠন সন্তর্পণে পেরিয়ে সেখানেই গেল সে। ঘরটা দিনের আলোতেও সাংঘাতিক। অন্ধকার উঠনের জমি থেকেও কয়েক ফুট নীচে তার মেঝে। সে দরজায় এসে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একটা ভাঙা মোটা গলা ভেসে এল, এস দাদা, এস !

কে রে, বিপ্নে নাকি? অন্ধকারে ঠাওর করতে পারল না নবীন।

আজ্ঞে, বিপিনবিহারী লয় খালি। ফ'নে আর সানাও আছে। বলে বিপিন অন্ধকার ফুঁড়ে দরজায় এসে হাজির হল।

এরা সকলেই চক্রবর্তীর রোজ মাইনের কুলি। মরশুমের সময় এদের হাতছাড়া করা যায় না। মাল বওয়াটা বড় কথা নয়, মঞ্চ বাঁধা ও সিন খাটানো এদের কাজ। আর তেমন দরকার হলে ড্রেসারের সাহায্যে কোন্ না কাটা সৈনিকের পোষাকও পরিয়ে দিতে হয়।

কি হচ্ছে বাবুদের? নবীন জিজ্ঞেস করল।

সে এক মজার ব্যাপার। বিপিন কেশো গলায় হেসে বলল, সানা শালার চিঁড়িয়া ফুরুৎ কেটেছে, বসে বসে এখন গজগজ করছে।

চিঁড়িয়া মানে, বউ?

বউ শালা পাবে কোথায় গো, রাঁড়। চল না, বসবে।

ততক্ষণে অন্ধকারটা একটু থিতিয়ে এসেছে। ঘরের দূর কোণে ওদের স্যাঁতানো মাদুরটায় গিয়ে বসল নবীন। বলল রুটি ক'টা হাতে তুলে, চলবে নাকি?

বিপিন হাত বাড়িয়ে দিল, লয় কেন?

তিনজনকে তিনটে রুটি দিয়ে নবীন একটা খেতে লাগল। সানা খাচ্ছে না দেখে জিজ্ঞেস করল, কি হল রে সানা?

ফ'নে বলল, দোস্তের আমার দুঃখু হয়েছে। সানার হাঁটুতে হাত রেখে বলল, ওরে শালা, খেতে না পেলে ঘরের বউ কেটে পড়ে তার আবার বাজারি বউ। লে লে খেয়ে লে।

সানার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল! ও শালীর জাতকে বিশ্বাস করতে নেই।

হ্যাঁ রে, ত' শালার জাতকে বিশ্বাস আছে। বিপিন বিদ্রূপ করে উঠল। নবীনকে বলল, এঠা বাজে কথা লয় দাদা?

নবীন বলল, তোর মনে কি হয়?

আমার কথা হচ্ছে, পেট হল সবার বড়। সব পীরিতই ফস্কা গেরো পেট যদি না ভরে। মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। রাঁড়ের পীরিত রাখ্, আমাদের মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করা এ দুনিয়ায় শালা চলবে না।

ঠিক বলেছিস্ বিপ্নে। ফ'নের কথার সুরে বোঝা গেল গত রাত্রের নেশার ঘোরটা তার পুরো কাটেনি এখনও। আরে তোর আছে কি? কথায় বলে ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। তুই শরীল খাটিয়ে খাস, সেও খায়। তাতে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস!

ধু—র! ওসব আমাদের লয় বাবা।

সানার তবু ক্ষোভ যায় না। নাঃ, ও জাতকে বিশ্বাস নেই।

চুপ কর্! ধমকে উঠল বিপিন।

অন্ধকারে এই তিনটে ভূতুড়ে মানুষের মধ্যে থেকে নবীনও এদের কথায় জমে গেল। সে দেখল কোথায় যেন একটা মস্ত সত্য রয়ে গেছে বিপিন আর ফ'নের কথায়। বলল, দ্যাখ্ সানা, একটা কথা বলি। তোর জন্মের ঠিক নিশ্চয় আছে?

সকলেই চমকে উঠল প্রশ্নটা শুনে। সানা বলল, যে শালা বে-ঠিক বলবে, তার জিভ্ ছিঁড়ে লোব না?

বেশ, আধিভৌতিক কিছু একটা বলার মত চোখ মুখ কুঁচকে বলল নবীন, মায়ের পেটে জন্মেছিস বাপের ব্যাটা, পানু মালাকারের ছেলে তুই, কেমন ত?

বাপের ব্যাটার মতই বলল সানা, লিশ্চয়!

বহুৎ আচ্ছা! এবার বল্, মা তোর মেয়েমানুষ ছিল কি না?

লইলে জম্মাবো কেমন করে ঠাকুর?

এবার নবীন বলল সবাইকে, তোমরা সব শুনেছ সানার কথা? তারপর বলল সানাকে, মেয়েমান্ষের জাতকে বলছিস্ বিশ্বাস নেই। তবে বল, যে তোকে পেটে ধরেছে, সে ছাড়া তোর বাপের নাম জানে কে?

এক মিনিট ঝিম ধরে রইল সানা। পরেই তাড়াতাড়ি নবীনের পায়ে হাত

দুলিয়ে বলল, ঠিক বলেছ ঠাকুর। মায়ের কথাটা মনেই ছিল না।

সাবাস্ দাদাঠাকুর। বিপিন ত চাপড় মেরেই বসল নবীনের পিঠে। গো মুখ্যু আমরা। আসল কথাটা ভুলে যাই। আসলে দুনিয়াটাই বিগড়ে গেছে।

হ্যাঁ বাবা। ফ'নে তার নেশার গলায় বলল, ইস্টেজ বেঁকে থাকলে ওতে কেষ্ট ঠাকুরকেও বাঁকা দেখা যায়। এ দুনিয়া ঢেলে না বাঁধলে চললে না, হ্যাঁ!

ঠিক! নবীনের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল। শূন্যে নিবন্ধ সুন্দর চোখ দুটো তার যেন হাজার রুদ্ধ কথা বলে চলেছে। সব শালা ঢেলে সাজতে হবে।

বাইরে থেকে চক্রবর্তীর চীৎকার শোনা গেল, নবীন, নবা কোথায় রে?

অন্ধকার গুদামের কোণে আর এই পরিবেশটাতে চক্রবর্তীর ডাকটা ভারী বেসুরো মনে হল।

বিপিন বলল, লাও, ডাক পড়েছে। দ্যাখ বোধ হয় নতুন বায়না এল।

নবীন উঠে পড়ল। সে ত এসেইছে সকালে, তৈরি হয়ে যা।

সানা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কিন্তু যাই বল, বড় দাগা দিয়েছে।

ফ'নে বলল, চেঁছে ফেল। মাটি নরম হলেই দাগ পড়বে।

তাই না বটে। বিপিনের গলার স্বরে সকলে চমকে উঠল। বাবা! লোকটা এমন গোখরোর ফণা তুলে গজরাচ্ছে কেন? কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল গলাটা যেন ভিজে উঠেছে। বলল সে, দাগ আবার কিসের, পাথর করে ফেলব বুক।

একটা অতিকায় গরিলার মত এঁটো থালা গেলাস নিয়ে থপ থপ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বিড় বিড় করতে করতে, ঘর...মেয়েমানুষ..., চুপ, চুপ মেরে যা সব।

নবীনের মনে হল অন্ধকারটা যেন ঘন হয়ে উঠেছে। অন্ধকারের ভিতর থেকে সানার গলা শোনা গেল, শালা, ভালবাসাটা পাপ।

জবাবে ফ'নে দরাজ গলায় বলে উঠল, যাই বল বাবা, আমি কিন্তু প্রাণভরে কেবল ভালবাসব।

নবীন তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে গেল। এ অন্ধকার গুদাম ঘরটায় নিজেকে অচেনা লাগে।

দোকান ঘরে সেই কালো লোকটা সবে উঠতে যাচ্ছিল। নবীনকে দেখে দাঁড়াল আবার। এই যে নবীনবাবু, চললাম দাদা। আপনার এক রাত্রে পাঁচ টাকা

ঠিক হয়ে গেল। কথা রইল, সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে যাবেন। তারপর হঠাৎ কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, মালটাল চলে ত।

নবীন ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, চলে বৈ কি! তবে, ফরাসী সাম্রাজ্যে বাস করি, খাঁটি ফরাসী মদ না হলে আমার জমে না।

লোকটা চোখ মেরে বলল, আমরা এখন ইংরেজ ছেড়ে খাদি রাজ্যে বাস করলেও খাশ আমেরিকান মাল দিয়ে আপনাকে একেবারে জমিয়ে দোব।

কালো বপু কেঁপে উঠল হাসিতে। নবীন হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বলল, দাদা বোধ হয় পার্থসারথীর কেষ্ট সাজবেন?

জবাবের পরিবর্তে লোকটা বিগলিত হয়ে গেল হাসিতে।

দেখেই বুঝেছি। নবীন বলল, দু' কাপ চায়ের বন্দোবস্ত রাখবেন, তা হলেই হবে। জায়গাটা কোথায়?

—মুলাজোড়। গিয়ে আমার নাম করবেন তাহলেই—

—নমস্কার, আসুন তাহলে। নবীন সরে গেল।

লোকটা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতের হাসি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চক্রবর্তী বলে উঠল, তোর চেহারার মত যদি তোর কাজগুলো হত। লোকটা হয়ত চটেই গেল।

কোন জবাব দিল না নবীন সে কথার।

চক্রবর্তী ভ্রূতে একটু বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, এস, বস, সামনের কণ্ট্রাক্টগুলোর হিসেব নিকেশ করে রাখা যাক।

নবীন এগিয়ে বসল মনিবের পাশে, লোহার চেয়ারে। চক্রবর্তী বায়নাপত্র খুলে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, তুই ত অনেক বই পড়েছিস—কেমন?

হঠাৎ এই প্রসঙ্গে নবীনের চোখে বিস্ময়।—কেন?

মনিবগিন্নীকে কেউ বৌদি বলে, শুনেছিস? টাল খেয়ে উঠল চক্রবর্তীর সামনের দাঁত।

তা আমি বলেছি নাকি? নবীনের মুখে চোরা হাসি চোখে পড়লে চক্রবর্তী বোধ হয় মারামারি শুরু করত।

বলল, তবে যে সে কি একটা বলল তখন?

বললই বা! আমি তো কিছু বলিনি।

হ্যাঁ, খাপ আর তলোয়ার সব শুদ্ধ ক'খানা আছে? পর মুহূর্তেই চক্রবর্তী একেবারে কাজের কথায় ফিরে এল।

কিন্তু নবীনের চোখ দুটো কেবলই বাইরের দিকে ছুটে ছুটে যেতে লাগল। ছেলেটা আসে না কেন এখনও? গত দু'দিন থেকে এখন পর্যন্ত তার বাড়ী যাওয়া সম্ভব হয়নি। এ লাইনের কাজই এরকম। অথচ দু' মাইল দূরেই তার বাড়ী, এই জি. টি. রোডের প্রায় ধারেই। কাল ফিরে গেছে ছেলেটা পুজোর নতুন জামা কাপড়ের আশায় এসে।

হিসেব নিকেশ করতে বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেল। নবীন পুজোর ক'দিন কোথায় কোথায় যাবে সব ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ার পর চক্রবর্তী বলল, ভদ্রেশ্বরে ওদের সাজাহান পালায় তোকে ত আবার অষ্টমীর দিন নাবতে হবে।

হ্যাঁ, করতে হবে ঔরঙ্গজেবের পার্টটা।

এখন ত তবে তোকে একবার সিরামপুর যেতে হয়। কাশী ভড়ের কাছ থেকে দুটো বর্ম, খান দশেক তলোয়ার খাপশুদ্ধ আর ফিমেল বেণীওয়ালা চুল খান চারেক।

হ্যাঁ, তা ত যেতেই হবে। কিন্তু ছেলেটা—

ওহো! ভ্রূ তুলল চক্রবর্তী, বাবুপাড়ায় একবার যেতে হবে সেই ছোঁড়া চারটের জন্যে। কুলির ত দরকার। আর একবার নয়ন দাশ পেন্টারের কাছেও যেতে হবে।

আড়চোখে একবার নবীনকে দেখে নিল সে। বলল, এতগুলো কাজ, লোক মাত্র দুটো। দোকানে ত একজনকে বসতেই হবে।

নবীনও একবার আড়চোখে চক্রবর্তীকে দেখে নিস্পৃহ গলায় বলল, তা ত হবেই।

তোকে আবার আজ একটা পেলেও করতে হবে। বোঝা গেল সমস্যায় পড়েছে চক্রবর্তী।

তা ত করতেই হবে, নবীন বলল।

আবার একবার চক্রবর্তী দেখে নিল নবীন হাসছে কিনা। বলল, তা হলে—

যা আজ্ঞা হয়, বলল নবীন।

তোর একবার বাড়ীতে যাওয়াও দরকার বোধ হয়?

দরকারই ত।

অসহায় ভাবে বলল চক্রবর্তী, তাহলে আমিই যাব সিরামপুর।

আর দোকানে বসবে কে? নবীনের চোখ কুঁচকে উঠল।

—তুই।

—তাহলে বাড়ীতে যাব কি করে। আর খদ্দেরও ত পটবে না আমার কথায়! চাপা হাসির ছলনা নবীনের চোখে।

এতক্ষণে চক্রবর্তী খেঁকিয়ে উঠল। তা হলে যা খুশি তাই করগে যা।

নবীন সটান্ দাঁড়িয়ে সেলাম করে বলল, সেই আজ্ঞাই করুন জাঁহাপনা।

এই সময় গুইরাম ঢুকেই হিহি করে হেসে উঠল। মেয়েমানুষের মত সরু গলায় বলল হাত তালি দিয়ে, এই দ্যাকো তবল্‌চি ঠাকুরের কান্ড। এখানেও কি পেলে বলছ নাকি গো?

চক্রবর্তীর হাড় জ্বলে উঠল গুইরামকে দেখে। তা তুমি সক্কালবেলায় মরতে এয়েছ কেন?

ও মা গো, সক্কাল কোথা দেখলে, বেলা যে দুক্কুর গড়ায়, ন্যাকা মেয়ে মানুষের মত বলল গুইরাম। নবীনকে বলল, তোমাকে একবার সুলতাদিদি যেতে বলেছে তবল্‌চি ঠাকুর।

মরণ নেই তোমার সুলতা দিদির? কঠিন ভাবে বলতে গিয়েও কোথায় যেন একটা কোমলতার আভাষ পাওয়া যায় নবীনের গলায়। চোরা চোখে তাকিয়ে দেখলে, চক্রবর্তী তার দিকেই চোখ ঘোঁচ করে তাকিয়ে আছে।

হ্যাঁ বাপু, ঠোঁট ফুলিয়ে গুইরাম বলল, না গেলে বলেছে মাথা কুটে মরবে।

মরেই ত গেছে, মরবে আর ক'বার। চল একবার ঘুরে আসি, বলে আবার সে দেখল চক্রবর্তীকে। বলল, তাহলে ঘুরে আসি কর্তা। টাকা পয়সার ব্যবস্থা ঠিক রাখুন। আর ছেলেটা এলে—

কথার মাঝ পথেই চক্রবর্তী চেঁচিয়ে উঠল, কই রে বিপনে, বাজারটা করে নিয়ে আয়।

গুইরামের সঙ্গে পথে বেরিয়ে এল নবীন।

নরম হাওয়ায় দিনটা যেন দুলছে। রোদটা ভারী আরাম দিল নবীনকে।

কোথায় যেন ঢাক বাজছে। ঢাকের শব্দেই আরও যেন গভীর ভাবে মনে পড়ে গেল নবীনের, শুরু হয়েছে শারদোৎসব। ছেলে মেয়েগুলো হতাশায় বেদনায় না জানি কতখানি দুমড়ে পড়েছে। আর মীনু—তার বউ, ছোট বউ, ছোট বউ ডাকবার আর কেউ নেই নবীন ছাড়া। না, সে মেয়েটার ত কিছুই চাইবার নেই এক তার স্বামীকে ছাড়া। আশ্চর্য। একটি বাহারি শাড়ী, এক চিমটি সোনা, বাইরের আনন্দ একটু, কিছুই না। তার চোখে নবীনের শরীর থেকে ক্রমাগত মাংস ঝরে যাওয়া, পরম ক্লান্তি, জীবনের একমাত্র সংকট। সন্তানের রক্তহীনতা তার একমাত্র আতঙ্ক। না, এত ভালবাসা ঠিক নয়। সেই নতুন আবেগে থরো থরো ভাবটাই আজ পর্যন্ত পুরনো হল না। সাপের মত আঁকড়ায় না অথচ নিরন্তর টান দেয়।—হ্যাঁ পুজোর সময় ওকে একটা কিছু দেওয়া দরকার। কিন্তু, তিক্ত নয়, বিষাদে বেঁকে উঠল নবীনের ঠোঁট। সঙ্গে সঙ্গে মীনুর বকুনিভরা চোখ দুটিও মনে পড়ে গেল। একটা নিঃশ্বাস ফেলে এগুলো নবীন।

পথটার দুই ধারে সবই প্রায় পুরনো দোতলা বাড়ী, জায়গাটা নাম করা বেশ্যাপল্লী। দোতলা বাড়ীর সারির শেষেই টালি ছাওয়া দরমার ঘর। ওগুলো একটু নীচু শ্রেণীর বেশ্যাদের ঘর। দিনের বেলাটা এখানে নীরব। গাড়ী ঘোড়া অন্যান্য ব্যবসায়ে ব্যস্ত কিছুটা, নয় ত ঝিমিয়ে থাকে। সন্ধ্যায় এ পথের জেল্লা বাড়ে, দেশী বিদেশী সরাবের দোকানে আলো জ্বলে আলেয়ার মত।

একটা দোতলা বাড়ীতে নবীন ঢুকে উপরে উঠতেই এক গাদা মেয়ে তাকে ঘিরে ধরল। এসেছে গো, আমাদের তবলচিদার এসেছে।

অভ্যর্থনার বহর দেখে বোঝা গেল নবীন এখানে বিশেষভাবে পরিচিত এবং সেটা তবলচি হিসাবেই।

সুন্দরী সুলতা বসবার জায়গা দিয়ে বলল, দাদা ত আমাদের ভুলেই গেছে।

ভোলাভুলি নয়, এখন মরশুমের সময়, দম ফেলারই সময় নেই। নবীন বসল।

বাড়ীর কর্ত্রী এসে বসল জাঁকিয়ে কাছে। তা বলি ছেলে, মরশুম একলা তোমাদের? পরবের সময়, মেয়েগুলোর বুঝি আর একটু গান বাজনা করার সাধ যায় না?

যাবে না কেন? নবীন হাসল। তবলচির অভাব কি?

একটি মেয়ে অভিমান ভরে মুখ ফেরাল, দাদার খালি ওই এক কথা।

সুলতা বলে উঠল, এ তল্লাটের তবলচি দেখতে আমাদের বাকী নেই তবলচিদা, বলছ কাকে? মড়ারা একে ত হ্যাংলাপনা করবে, তার মধ্যে সব ঢোলক গোঁসাই।

একটি মোটা মত মেয়ে, গতরাত্রের রেশ থাকায় কিঞ্চিত অপ্রকৃতিস্থ। এসে বলল, যাই বল, বাজাতে তোমাকে হবেই দাদা। সেদিন এক মুখপোড়া গুপো এসেছিল। তার কি ঢং গো। ডুগিটাতে যখনই ঘা মারে, মুখটাকে এমন করে, আর এমন হাসবে, বলে সে সেই তবলচির ভঙ্গিটা দেখাল। আর অমনি একটা হাসির রোল পড়ে গেল মেয়েদের মধ্যে।

কে একজন বলে উঠল, ইচ্ছে হয় শালাকে খেংরে দূর করে দিই।

কেউ কেউ নবীনের গুণগান শুরু করল। মাইরি, দাদার হাত পড়লেই মনে হয় তবলা বেজে উঠেছে।

কর্ত্রী সবাইকে থামিয়ে বলল, না বাজালে চলবে না ছেলে, সে তুমি বেবুশ্যে বলে যতই তফাৎ রাখ।

বাঃ! নবীন ভ্রূ তুলে হাসল। তফাৎ আবার কিসের? পয়সা নিই, তবলা বাজাই।

সেই ত কথা বাবা। কর্ত্রী বলল, টাকা দিয়েও তোমাকে কিনতে পারলাম না। আর—বলে সে সুলতার দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকাল।

সুলতা মুখ নীচু করে বলল, সে চেষ্টা কি কম করেছি মাসী। একটু ঢলা দূরের কথা, তোমার তবলচি ছেলে আমার সে মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে। সুলতার নিঃশ্বাসে শুধু আপশোষ নয়, বেদনার আভাষ পেয়ে কারুর কারুর ঠোঁট বেঁকে উঠল।

একটি চঞ্চল মেয়ে বলে উঠল টেপা হাসি হেসে, যাই বল দাদা, ভগবান তোমার চেহারাখানিও দিয়েছিল বটে। লোভ হয় কিন্তু, বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

নবীন কপট গাম্ভীর্যে বলল, তবে তোরা বকতে থাক্। আমি উঠি।

কর্ত্রী সবাইকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল। তা হলে ছেলে—

বেশ! নবীন উঠে দাঁড়াল। সপ্তমী দশমী দুদিন বাজাব। তবে সন্ধ্যারাত্রে 'দু' ঘণ্টা, তাছাড়া পারব না।

বেশ বেশ। কর্ত্রী খুশি হয়ে উঠল, তাই হবে। একটু মিষ্টিমুখ করে

টাকাটা তুমি আগাম নিয়ে যাও।

না, কোনটাই হবে না। তাড়া আছে। তাছাড়া আমি বাজিয়ে টাকা নিয়ে যাব। একটু হেসে বলল, ভয় নেই। বলেছি যখন আসব।

বেরিয়ে এল নবীন। আসবার সময় টালির চালাগুলোর অধিবাসীরা সকলেই তবলচি দাদাকে ডেকে কুশল জিজ্ঞেস করে নিল। এরা হল নিম্নস্তরের।

একটি মেয়েকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থম্‌কে দাঁড়াল নবীন। কিরে বিন্দু, তোর কি হল?

বিন্দু মাথা তুলল না।

কি, গান শোনার খদ্দের আছে বুঝি? নবীন জিজ্ঞেস করল।

বিন্দু মাথা নাড়াল। নবীন বলল, আমাকে তবলচি নিবি?

বিন্দু মাথা তুলল। ঠাণ্ডা গলায় বিষাদে বলল, তোমাকে নেওয়ার সামর্থ কোথায় তবলচিদা? আমরা যে আটচালাওয়ালী!

বটে? নবীন হাসল। কবে তোর গান?

নবমীর দিন।

কত টাকা দিবি?

বিন্দু মাথা নীচু করে রইল নিশ্চুপে।

আরে বাপু দুটো মিষ্টি ত খাওয়াবি?

বিন্দুর মুখে হাসি ঝলকে উঠল। পেট ভরে খাওয়াব তোমাকে তবলচিদা।

বেশ। তবে সন্ধ্যারাত্রে, বুঝলি? হন্‌ হন্‌ করে বেরিয়ে এল নবীন সেখান থেকে।

দোকানে এসে দেখল বিপিন ড্রেস গোছাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, কর্তা কোথায়?

কর্তা ওপরে, বিপিন বলল, তোমার ছেলে এসেছে, মনিব গিন্নি ডেকে নিয়ে গেছে ওপরে।

এসেছে? ডেকে নিয়ে আয় ত বিপনে। নবীনের চোখে সংশয় ঘনিয়ে এল। কর্তা আবার টাকা দিলে হয়। নইলে আজও যদি ছেলেটাকে ঘুরে যেতে হয়, তাহলে বেচারার মুখের দিকে আর তাকানো যাবে না।

বিপিন এসে বলল, ঠাকরুন তোমার ছেলে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, যাও

তুমি।

ও! হাসি পেল নবীনের। ভিতরে এসে দেখল ছেলের হাত ধরে ভানুমতী গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সে আসতেই বলল, তোমরা এমন পাষণ্ড কেন বল ত। তিনটে বাচ্চা নিয়ে বউটা একলা রয়েছে, আর আজকে ষষ্টি পুজো। শুকনো মুখে ছেলে এসেছে বাপের খোঁজে।

জানা কথা শুনে হাসল নবীন। দুঃখের হাসি। জানি। কিন্তু এ ত আমার সখ নয়?

বাউণ্ডেলে কাজ তুমি ছেড়ে দাও বাপু। বিনা দ্বিধায় কথাটা বলল ভানুমতী, তোমার মনিবের মত লোকের চলে এ কাজ, তোমার পোষায় না।

নবীন বলল, এ জগতে কোন্ কাজে ক'জনার পোষায়?

ভানুমতী ছেলেটার মুখটা তুলে ধরে বলল, ওর যখন খিদে পাবে কষ্ট হবে, তখন কি ও জগতের দিকে তাকাবে, না বাপের দিকে?

সত্য কথাটা শুনে নীরব রইল নবীন। তবু মূল সত্য তার কথাটাই।

ভানুমতী বলল, যাই বল বাপু, তোমার আছে বলেই বোধ হয় এ শুকনো মুখ দেখে তোমাদের বুক ফাটে না। আর যাদের নেই...

বলতে বলতে গলাটা বুজে এল তার, চোখের কোণে জল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, এ পোড়া সংসারের ধাত বুঝিনে, কাকেই বা বলব।

ছেলের হাত ধরে ঘরে ঢুকল নবীন। তার একটুও মায়া হল না ভানুমতীর চোখের জলে। তার নিজের পুত্রস্নেহ কি কম তার চেয়েও ভানুমতীর বেশী? কখনো নয়। তার আসল কথা হল, এ পোড়া সংসারের ধাত বোঝে না সে। এ শুকনো মুখ দেখে নবীনের বুক ফাটে না, কে বলেছে একথা ভানুমতীকে। কিন্তু—

চক্রবর্তী ঢুকে টাকা দিল নবীনকে। বলল, তোর টাকা আর সারাদিন চলবার খাবার।

টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নবীন। পথে বেরিয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, কিছু খেয়েছিস সকালে?

ছেলে ঘাড় নাড়ল, কাল রাতে ভাত ছিল, তাই খেয়েছি।

তোর মা? ছেলের মুখের দিকে তাকাল নবীন। মিনুর অবিকল মুখ ছেলেটার। কি করছে তোর মা?

মা? সংশয় দেখা দিল ছেলের মুখে। একটু পরে বলল, মা কাজ করছে।

আর তোর ছোট বোন দুটো?

খেলা করছে।

তোর পেট ভরেনি ভাত খেয়ে, না? নবীন তাকাল ছেলের দিকে।

ভরেছে ত, অন্যদিকে তাকিয়ে বলল ছেলে।

আশ্চর্য! নবীন দেখল দায়ে পড়ে ছেলেটা কেমন মিছে কথা বলছে। কাছে টেনে নিয়ে বলল ছেলেকে, চল্ না, কিছু খেয়ে নিবি।

মিনুর মত তাকাল ছেলেটা বাপের দিকে। তারপর বাবার জামার আস্তিনে মুখ ঢেকে বলল, কিনে দিও খাবার, বাড়ী নিয়ে যাব।

কি ছেলে! একলা খাবার খেতে তার সংকোচ। কিন্তু বুকটার মধ্যে এমন মোচড় দিয়ে ওঠে কেন?

একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে ছেলের একটা ইজের ও সার্ট আর মেয়েদের দুটো ফ্রক কিনল। কিনে টাকা হিসেব করে জিজ্ঞেস করল দোকানদারকে, টাকা চার পাঁচের মধ্যে শাড়ী পাওয়া যাবে একটা?

পাওয়া যাবে না কেন? মোটা আটপৌরে শাড়ী পাওয়া যাবে পাঁচ টাকায়। ছেলে তাড়াতাড়ি বাপকে বলল, মা শাড়ী কিনতে বারন করেছে।

থাক্। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বেরিয়ে এল নবীন জামা ফ্রকের দাম দিয়ে। আটপৌরে কেন, শত টাকার চুমকি বাহারও মিনুর বুকে একটুও শান্তি দিতে পারবে না। তার জীবনের চুমকিই যে আজ মরচে ধরে যাচ্ছে! না, ভানুমতী এ পোড়া সংসারের ধাত বোঝে না।

সামান্য কিছু খাবার কিনে দিল সে ছেলেকে। পাঁচটা টাকা নতুন সার্টের পকেটে ভরে দিয়ে বলল, তোর মাকে দিস্, কেমন? আর ঘরে চাল বাড়ন্ত নেই ত?

দু' দিনের চাল আছে, ছেলে বলল। তারপর একটু হেসে বাবার হাত ধরে বলল, খাবারটা মাকে দিয়ে দোব রাতে খেতে?

কেন?

মায়ের আজ ষষ্ঠীর উপোস যে!

বটে? নিজের দাড়িওয়ালা খস্‌খসে গালটা নবীন ঘষে দিল ছেলের গালে।

তোমরাও একটু একটু খেয়ো, কেমন? মাকে বলো, আমি অনেক রাত্রে একবার ঘুরে আসব বাড়ী থেকে।

ছেলেকে বাসে তুলে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে বাবুপাড়ার দিকে। সেখান থেকে শ্রীরামপুর।

কিন্তু মনটা বড় খারাপ করে দিয়েছে ভানুমতী। তোমাদের আছে বলে বুক ফাটে না। কি কথা! এ বুকের সমস্ত কথা কি তুমি জানো মনিবগিন্নি? নবীন বেশ্যার বাড়ীতে তবলা বাজায়, কিন্তু রেডিও, রেকর্ড কোম্পানীর দরজায় দরজায় দিনের পর দিন মাথা ঠোকেনি সে! বড় আশায় বুক বেঁধে রাজধানীর ছোট বড় থিয়েটারের মালিকদের দোরে ধন্না দেয়নি সে! কি মঞ্চে, কি পর্দায় একবার পরখ হওয়ার সুযোগ চায়নি সে পায়ে ধরে?

কিন্তু বন্ধ দরজা ও নিরেট মুখ দেখে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। আসতে হয়েছে চক্রবর্তীর স্টেজ অ্যান্ড ড্রেস প্যারাডাইসের পেন্টার আর ড্রেসার হয়ে। মরশুমের দিনে সখের দল ডাকাডাকি করে, দেয় দু' চারটে টাকা আর অজস্র প্রশংসার প্রীতিমূল্য।

হায়! অথচ দেশে সমঝদারের ত অভাব নেই। তবু সেই সবই পুরনো থিয়েটার, পুরনো অভিনেতা, পুরনো নাটক, এমন কি গলার স্বরও পুরনো। কেন এ বিকৃতি?

সত্যি, এ পোড়া সংসারের ধাত বোঝে না ভানুমতী। চোখের জলে তা নিভবে! মোটেই নয়। একেবারে পুড়িয়ে দাও এ পোড়া ভিতের সংসার।

সন্ধ্যোবেলা শ্রীরামপুর থেকে মুলাজোড়। নাটক শুরু হতে দেরী হল না।

পার্থের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভানুমতীর কথাটা। ওহো, সত্যিই ভানুমতী যে সন্তানহীনা! তাই তার চোখে এত অবুঝ চোখের জল, নিজের না থাকার মস্ত বেদনাতে তাই এত অবুঝ কান্না।

রাত্রি আড়াইটার সময় নবীন গঙ্গা পেরিয়ে মুলাজোড় থেকে এপারে চলে এল। পথে ফরাসী পুলিশের টহল, সন্ধানী দৃষ্টি, কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা।

পেণ্টিংয়ের স্যুটকেশটা দোকানে রেখে দেওয়ার জন্য পেছনের দরজা দিয়ে অন্ধকার উঠনে ঢুকল নবীন। দোকানের দরজাটা খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপল। স্যুটকেশটা রাখতেই ঠুন ঠুন শব্দে চমকে ফিরল নবীন। ভানুমতী।

কি হল? চমকানি কাটাবার চেষ্টা করল নবীন। বলল, ঘুম নেই চোখে?

বিচিত্র গলায় বলল ভানুমতী, কোনদিনই ছিল না।

দু পা এগিয়ে এসে বলল, ছেলেমেয়েদের জন্য ক'টা জামা কিনেছি, নিয়ে যেও। তারপর আরও এক পা এগিয়ে বলল, কিছু খাবে?

আশ্চর্য! আশ্চর্য দৃষ্টি ভানুমতীর চোখে। কি চায়, কি চায় মেয়েটা নবীনের কাছে। এক মুহূর্ত চোখে চোখ রাখল নবীন। পরমুহূর্তে মাথা নীচু করে বলল, আমাকে মাপ কর ভানু, মাপ কর। আমার ছেলেকে আমি তোমাকে চিরদিনের জন্য দিয়ে দেব, তোমাকে মা ডাকবে সে। তবু...

সে বেরিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করল। ভানুমতী ডাকল, দাঁড়াও।

ফিরল নবীন। হ্যাঁ, স্বচ্ছ হয়ে আসছে ভানুমতীর চোখ। চকিতে অদৃশ্য হয়ে নতুন জামাগুলো এনে নবীনের হাতে দিল সে। বলল, ওদের পরতে দিও কাল।

দোব, বলে আর ভানুমতীর জলভরা চোখের দিকে না তাকিয়ে নবীন বেরিয়ে পড়ল। চোখের জলে এ পোড়া সংসার নিভবে না জেনেও এ কান্না বুঝি।

সামনে দীর্ঘ দু' মাইল পথ। মিটমিটে আলো, নিস্তব্ধ, নিঃসাড়। এদেশের ফরাসী প্রহরীর সন্ধানী দৃষ্টি। পথটা হেঁটে ঘেমে উঠল নবীন।

আম আর পিপুল গাছের বেষ্টনীর মধ্যে অন্ধকারে মান্ধাতার আমলের বাড়ীটা। নিঃশব্দ। নোনা ইঁটের গন্ধ লাগে। নবীন ডাকল দরজায় আস্তে শব্দ করে, মিনু, ছোট বউ, ছোট বউ দোর খোল্।

সাড়া দিয়ে মিনু দরজা খুলে দিল। বলল, এই বুঝি অনেক রাত? রাত ত শেষ।

হোক। নবীন দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, আবার যে সময় হয়ে এল ছোট বউ।

ওদের জাগিও না যেন। অন্ধকারে বিছানার দিকে এগুলো সে। এস, ততক্ষণ আমার জায়গাটিতে একটু ঘুমিয়ে নাও।

মিছে ঝঞ্ঝাট। ঘুম আমার হবে না। নবীন এগিয়ে এল। নে—এ জামাগুলো মনিবগিন্নি ছেলেমেয়েদের দিয়েছে।

জামাগুলো হাতে দিতেই নবীন চমকে উঠে মিনুকে গায়ে টেনে নিল। একি, গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

মিনু অন্ধকারেও ঘোমটা টেনে দিল মাথায়। বলল, কিছু নয় ও।

কিছু নয়? উপোস আর গঙ্গাস্নানও এর উপর হয়েছে বোধ হয়?

মিনু নীরব।

ছোট বউ!

নবীনের বুকের কাছ থেকে জবাব এল, ছেলেপুলের মা, আমাকে ষষ্ঠী করতে হবে না?

তা বলে প্রাণ দিবি তুই এভাবে? তুই গেলে তোর ছেলেমেয়ে সামলাবে কে?

না গো না, মিনু বলল একটু হেসে। আর যাই যদি, ছোট বউ বুঝি একটা মিলবে না?

তাই ভাবিস্ বুঝি তুই? একটু নীরব থেকে হঠাৎ নবীন বলল, তবে সকলের বাঁচার জন্য আমি সারাদিন খেটে বেড়াই তোর ওই কথা শুনব বলে?

মিনুর দুই হাতের বন্ধন আর একটু শক্ত হয়ে উঠল। বলল, মাপ কর, মাপ কর, সেই ভেবে বলিনি।

মিনুকে টেনে নিয়ে বসল নবীন। কাছেই কোথায় বোধনের বাজনা বেজে উঠেছে। রাত বুঝি শেষ হয়।

নবীন বলল, কিছুতেই আর ঠেকোজোড়া দেওয়া যাচ্ছে না সংসারটায়, নারে?

তবু দিতে হবে, মিনু বলল।

তবু দিতে হবে, কথাটা বলতে বলতে নবীন উঠল। যাই, ভোরবেলায় নৌকো ছাড়বে, চুঁচড়ো যেতে হবে।

এটুকু সময়ের জন্যে এলে? মিনুও উঠল।

না এসে যে পারিনে। তবু...

কথা আটকায় গলায়। বলল, তবু তোদের যে ধরে রাখতে পারছিনে।

মিনু পায়ের ধুলো নিল নবীনের। বলল, ষষ্ঠী গেল, আজ সপ্তমী, আশীর্বাদ কর।

আশীর্বাদ! বলল নবীন, বেঁচে থাক বলতে আমার লজ্জা করে ছোট বউ, তবু বলছি তুই বেঁচে থাক। না হলে, বলতে বলতে সে দরজায় এল। পানু কবরেজের কাছে একটু ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিস্, ওষুধ নিয়ে আসবে।

বেরিয়ে পড়ল সে।

অন্ধকার হাল্কা হয়ে আসছে। ছেঁড়া মেঘের ভিড় আকাশে।

চোখের জল মুছে দাঁতে দাঁত ঘষল নবীন। শা—লা।

আবার দোকান। বন্ধ ঘর। ভোর হয়েছে। নবীন গেল গুদাম ঘরটার দিকে বিপিন, সানাদের ডাকতে। ওদের নিয়েই নৌকায় উঠতে হবে।

বিপনে! ডাকল সে।

ভেতর থেকে সাড়া এল, চলে এস ডান কোণা বরাবর।

নবীন কাছে যেতে যেতে বলল, আসার সময় নেই, বেরুতে হবে।

সে কাছে আসতেই বিপিন একটা দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে বলল, ওই দ্যাখ ঠাকুর।

নবীন দেখল, গুদামের খুঁটিতে গলায় দড়ি ঝোলানো একটা মূর্তি।

কে?

বিপিন বলল, সানা।

ফ'নে বলল, শালা আমার পীরিতে পোড় খেয়েছে। হতভাগা, পীরিতের রীতই বোঝে না। পেটে ভাত নেই...

অন্ধকারে ডুবে গেল তার কথা।

বিপিন বলল, দ্যাখ ঠাকুর, কাণ্ড দ্যাখ। যে সব ছোঁড়া দুনিয়া চেনে না, তাদের এমন মরাই ভাল। হ্যাঁ, যাই কর্তাকে খবরটা দিইগে।

ফনে'র দরাজ গলা আবার শোনা গেল, যে যাই কর বাবা, আমি শুনছি না, আমি কেবল প্রাণভরে ভালবাসব, শা—লা।

তারপরে হঠাৎ নবীনের কাছে উঠে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, এ সেই বাঁকা ইস্টেজের ব্যাপার ঠাকুর, বুঝলে? ঢেলে বাঁধতে হবে। চল বাইরে যাই,

শালা থাকুক।

নবীন বেরিয়ে এল। এ পোড়া সংসারের ধাত কি বোঝে না ভানুমতী? সকলেই বোঝে। যারা বোঝেনি, তারা একটু বুঝুক।

দোকানের টেবিলে মাথাটা পেতে দিল নবীন। ইস্! শালা, মরশুমের একটা দিন।

আদাব

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই, দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ী। তারা গুলী ছুঁড়ছে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখতে।

*　　*　　*

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উল্টে এসে পড়েছে গলি দু'টোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মত পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না।—'আল্লাহু-আক্‌বর' কি 'বন্দেমাতরম্'।

হঠাৎ ডাস্টবিন্‌টা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।......নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা......ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটি মাথা। মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ

নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর......। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু, না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয় তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দু'জনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু না মুসলমান?

—আগে তুমি কও। —অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।......প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, আবার অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে,—বাড়ী কোনখানে?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইডায়। —তোমার?

—চাষাড়া—নারাইণগঞ্জের কাছে।...কি কাম কর?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি। —তুমি?

—নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে, অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে দু'জনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।......হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা সোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু'পক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দু'জনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

—ধারে কাছেই য্যান লাগছে। —সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। —মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা মজুর বাধা দিলঃ আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি? মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোন বদ্ অভিপ্রায়

নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল—বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান্?

—ক্যান্? সুতামজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল—ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভাল ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। —যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মতলবডা তো ভাল মনে হইতেছে না। কোন্ জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি? স্থান-কাল ভুলে রাগে দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভাল কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝ না?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কি ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

সোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মত। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দু'টি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা......তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে—......কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মত নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে উঠে কি করে? কি অভিশপ্ত জাত!......সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিঃশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? —সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমত দু'একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খস্ খস্ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া। —আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

—আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরে হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু'একবার খস্ খস্ করে সতি সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

—সোহান্ আল্লা! —নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।......ভূত দেখার মত চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি......?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু'জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল—হ আমি মোছলমান। —কি হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু......

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কি আছে?

—পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান্ শাড়ী। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

—আর কিছু নাই তো? —সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখ। —পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না ভাই, দেখুম আর কি। তবে দিনকালটা দেখছ ত'? বিশ্বাস করন যায়,—তুমিও কও?

—হেই ত' হক্ কথাই। দেইহ ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই ত?

—ভগবানের কিরা কাইরা কইতে পারি একটা স'ুইও নাই। পরাণটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। স্বতা-মজ্বর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দ্ব'জনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনযোগ-সহকারে দ্ব'জনে ধ্বমপান করল খানিকক্ষণ।

—আইচ্ছা......মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোন আত্মীয়-বন্ধ্বর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পারনি—এই মাইর-দ'ইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

স্বতা-মজ্বর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছ্ব। বেশ একট্ব উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ ত' তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই ত' লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একট্ব কট্বক্তি করে উঠল—হেই সব আমি ব্বঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি। তোমাগো দ্ব'গা লোক মরব, আমাগো দ্ব'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?

—আরে আমিও ত' হেই কথাই কই। হইব আর কি, হইব আমার এই কলাটা —হাতের ব্বড়ো আঙ্গ্বল দেখায় সে। —তুমি মরবা, আমি মর্বম, আর আমাগো পোলামাইয়াগ্বলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নি-পতিরে কাইটা চাইর ট্বকরা কইরা মারল। ফলে হইল বিধবা বইন আর তার পোলা-মাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপ্বর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপ্বর পায়ের উপ্বরে পা দিয়া হ্বকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মান্বষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এম্বন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেম্‌বায়? —নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দ্ব'হাত দিয়ে হাঁট্ব দ্ব'টোকে জড়িয়ে ধরে।

—হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জ্বটাইব কোন্ স্বম্বন্দি; নাওটারে কি আর ফিরা পাম্ব? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি? জমিদার র্বপবাব্বর বাড়ীর নায়েব মশয়

পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখশিস্ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

* * *

সুতা-মজুর কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখা-চোখি করে।

—কি করবো? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চল পলাই। কিন্তুক যামু কোনদিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভাল চিনি না।

মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিসের মাইর খামু না;—ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্ দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এই দিকে।—

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চল, কোন গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুট্‌ফুট্ করছে। দুইজনেই একবার থম্‌কে দাঁড়াল—ঘাপ্‌টি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরী করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড় ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে উঁকি

ঝ্ঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরল।

—কিনারে কিনারে চল। স্তা-মজ্র বলে।

রাস্তার ধার ঘে'ষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও।—মাঝি চাপা-গলায় বলে। স্তা-মজ্র চমকে থম্কে দাঁড়ায়।

—কি হইল?

—এদিকে আইয়ো—স্তা-মজ্রের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

—হেদিকে দেখ।

মাঝির সঙ্কেত মত সামনের দিকে তাকিয়ে স্তা-মজ্র দেখল প্রায় একশো গজ দ্রে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উ'চু বারান্দায় দশ বারোজন বন্দ্কধারী প্লিশ স্থান্র মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত ম্খ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি প্লিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠ্কছে মাটিতে।

মাঝি বলে—ওইটা ইস্লামপ্র ফাঁড়ি। আর একট্ আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

স্তা-মজ্রের সমস্ত ম্খ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে?

—তাই কইতেছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দ্গো আস্তনা আর ইস্লামপ্র হইল ম্সলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত্ যাইব গা।

—আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙ্গে পড়ে।—আমি পার্ম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কি হইল না হইল আল্লাই জানে। কোন রকম কইরা গলিতে ঢ্কতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হম্ ব্ড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া কর কি? উৎকণ্ঠায় স্তা-মজ্র মাঝির কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরোনা, ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ্, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ্ দেখ্ছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌বে, বাপ্‌জানের কোলে চড়্‌ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন কর্‌তাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টন্ টন্ করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমায় ধইরা ফেলায়?—ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখানে থাইকো য্যান্ উইঠো না। যাই... ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। —আদাব।

—আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বুকের ধুক্-ধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগমান্—মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে। অনেকক্ষণ ত' হল, মাঝি বোধ হয় এত-ক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করে পরবে। বেচারা 'বাপজানের' পরাণ তো। সুতা-মজুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?—সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কি করবে? মাঝি তখন—

—হুট...

ধ্বক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কি যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।

—ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম্, গুড়ুম্। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-

মজুর হাতের একটা আঙ্গুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার, তার বিবির জামা, শাড়ি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুষমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।